মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ

হুমায়ুন আজাদ

সূচিপত্র

ওই ঘটনার আমি অংশ হই 2
ডলির বাবা আমার পাশে 37
ডলি আমার অফিসে 82
অফিসে গিয়ে দেখি 114
কয়েক দিন পর একটি ঘটনা 173
তার বয়স বাড়ছে 214
মানবতাবাদী জনদশেক বন্ধু 237
এক দুপুরে অফিসে ফোন 255
হালিমা বেগম টেলিফোন করেছেন 293

ওই ঘটনার আমি অংশ হই

ওই ঘটনার আমি অংশ হই আকস্মিকভাবে, আমার তাতে থাকার কথা ছিলো না। আমি, সাধারণত, কোনো কিছুতে থাকতে চাই না; দূরে থাকতে চাই সব কিছু থেকে–দূরে থাকতে পারলে খুব নির্মল একটা শান্তি পাই; কিন্তু আমি কেমন করে যেনো জড়িয়ে পড়ি, জড়িয়ে পড়ার পর আমারও মনে হতে থাকে যেনো আমি সুপরিকল্পিতভাবেই ওই সবে থাকতে চেয়েছিলাম। দেলোয়ার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ;–অনেক বছর খুব কাছাকাছি ছিলাম আমরা, এতো কাছাকাছি যে দুজনকে সব সময় একই সাথে দেখা যেতো; কিন্তু ওই ঘটনার কয়েক বছর আগে থেকে আমরা বেশ দূরে সরে গিয়েছিলাম। দূরে সরে যাওয়াটা বিদ্বেষ বা বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য ঘটে নি–(আমরা সব সময়ই পরস্পরকে ভাবতাম, কোনো পরিচিতের সাথে দেখা হলেই আমি দেলোয়ারের আর দেলোয়ার আমার কথা বলতো); ঘটেছিলো আমরা ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছিলাম বলে। নিজের পেশায়, ব্যবসায়, অত্যন্ত সফল হয়েছিলো দেলোয়ার; তিরিশ বছর বয়সেই যা সে উপার্জন করেছিলো, আমি তা আজো করার স্বপ্নও দেখি না। ওই বছর দেলোয়ার বিয়ে করে। বিয়ের মঞ্চে দেলোয়ারের বউকে দেখে আমি একটু কেঁপে উঠি, সামান্য একটু কাঁপন;–আমার চোখ তার বউয়ের চিবুকের ওপর গিয়ে পড়েছিলো, একটি কাঁধের ওপর গিয়ে পড়েছিলো; তা আমাকে কম্পিত করে, কিছুটা ঈর্ষারও জন্ম দেয়; এবং আমি ভয় পাই। এটা অবশ্য নতুন নয়; অন্য কয়েকটি বিয়ের আসরেও আমার এমন হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে রূপসী বউ দেখে আর নিজের কথা ভেবে কে না কাঁপন আর ঈর্ষা বোধ করে; আর অসুন্দর বউ দেখে কে না সুখ পায়। আমার কাঁপন আর ঈর্ষা ছিলো অল্প সময়ের জন্যে;–তা অচিরেই কেটে যায়; দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি ভুলে যাই যে আমার বন্ধু দেলোয়ারের বউ অত্যন্ত রূপসী। কিন্তু ভয়টা আমার সঙ্গে থেকে যায়; আমি যে

দেলোয়ারের বউর চিবুক আর কাঁধের ওপর চোখ ফেলেছি; এতে আমার ভয় লাগতে থাকে, অপরাধ বোধ হ'তে থাকে;–অনেক বছর আমি কোনো নারীর শরীরের ওপর এমনভাবে চোখ ফেলি নি।

বিয়ের পর আরো দু-তিনটি অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হই; এবং আমি যাই নি এমন নয় যে ওই দিনগুলোতে আমার আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বা আরো আনন্দয়ক উৎসবে নিমন্ত্রণ ছিলো। আমি যাই নি;–কেনো যাই নি, আমি নিজেও বুঝি নি। আমার কি ভয় হচ্ছিলো যে গেলে আমার চোখ আবার দেলোয়ারের বউর চিবুক বা কাঁধের ওপর গিয়ে পড়বে? বা পড়বে আরো ভয়ঙ্কর কোনো জায়গায়;–নতুন বিয়ের পর বউদের ভয়ঙ্কর জায়গাগুলো থেকে মাঝেমাঝেই কাতান বেনারসি জর্জেট খসে পড়ে, খসে পড়লেই তাদের আরো সুন্দর দেখায়–এবং আমি আবার কাঁপন আর ঈর্ষা বোধ করবো? না কি বউ ব্যাপারটিই ভীত করতে আমাকে বউ ব্যাপারটি মনে হলেই আমার অন্যদের কথা মনে হতো; কখনো নিজেকে মনে পড়তো না; বউ এবং নিজেকে জড়িয়ে আমি কিছু ভাবতে পারতাম না। আমি দেলোয়ারের ওই অনুষ্ঠানগুলোতে যাই নি; না যাওয়ার জন্যে আমার মনে ক্ষীণ অপরাধবোধ জন্ম নেয়। দেলোয়ারের সাথে আমার তো দেখা হবেই, দু-এক দিনের মধ্যে না হোক দু-এক মাসের মধ্যে হবেই; তখন আমি কী জবাব দেবো? তখন থেকে দেলোয়ার আর তার বউ ডলির কথা আমার সব সময় মনে পড়তে থাকে; মনে হতে থাকে এই বুঝি দেলোয়ার আমার বাসায় বা মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ অফিসে আসছে; এই বুঝি টেলিফোন করছে; এবং আমি ভয় পাই। একরাতে আমি ডলিকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে আমি ডলির চিবুক বা কাঁধ দেখি না; পেছন দিক থেকে তার দীর্ঘ গ্রীবা আর প্রশস্ত পিঠ দেখি, এবং ঘুম থেকে জেগে উঠি। বন্ধুর নতুন বউকে স্বপ্নে দেখা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না; তারপর সারারাত আমি আর ঘুমোতে পারি না।

এক ছুটির দিন, ভোরবেলা, যখন আমি ঘুম থেকে জেগে গড়াচ্ছি, চা খাচ্ছি, গড়াচ্ছি, সিগারেট টানছি, আমার ভালো লাগছে, পুরোনো প্লেবয়ের পাতা উল্টোচ্ছি, চা খাচ্ছি, আমার ভালো লাগছে না কিন্তু ভালো লাগছে, বেলা দশটা বেজে যাচ্ছে, অনেক কিছু আমার মনে পড়ছে এবং অনেক কিছু আমার মনে পড়ছে না, তখন দেলোয়ার তার বউকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়। একরাশ সুগন্ধ ঝড়ের বেগে আমার দরোজা দিয়ে ঢুকছিলো; তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম দেলোয়ার তার বউকে নিয়ে এসেছে। দেলোয়ার যে একদিন আসবে, তাতে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কেনো নিশ্চিত ছিলাম? আমি কি কোনো অলৌকিক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলাম কোনোখানে, যা অনুসারে দেলোয়ারকে আমাদের ফ্ল্যাটে আসতেই হতো? ও-ধরনের কিছু আমি করি নি, করার শক্তি আমার নেই; কিন্তু আমি জানতাম দেলোয়ার তার বউকে নিয়ে একদিন আসবেই। সুন্দর দামি জিনিশ, আমার মনে হতো, কেউ কখনো একলা উপভোগ করে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় না; আর দেলোয়ার তো আমাকে ছাড়া কিছুই উপভোগ করে সুখ পেতো না। দেলোয়ার তার রূপসী বউকে নিশ্চয়ই উপভোগ করছে; কিন্তু আমার মনে হতো আমাকে বাদ দিয়ে তার উপভোগ কখনো সম্পূর্ণ হবে না; তার উপভোগকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যে একদিন বউকে নিয়ে আমার কাছে আসতেই হবে; এবং দেলোয়ার এসে উপস্থিত হয়। আমি তার বউর দিকে তাকাতে পারি না। বিয়ের পর বউদের মাংস আর চামড়ায় অদ্ভুত রঙ লাগে; তারা ঢলঢল করতে থাকে–এটা আমার ছেলেবেলায় দেখা, পরে আর আমি কোনো নতুন বউর দিকে ভালো করে তাকাতে পারি নি; দেলোয়ারের বউর চামড়ায়, আমি দেখতে পাই, সোনার হাল্কা প্রলেপ লেগেছে; তার কোমল আদুরে চর্বি চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। দেলোয়ারের বউর চামড়ার ভেতর দিয়ে একটি শ্রাবণের নদী বইছে। কারো পক্ষে ওই সৌন্দর্য একলা উপভোগ করা সম্ভব নয়। দেলোয়ার নিশ্চয়ই ওই সৌন্দর্য উপভোগের

সময় নীরবে চিৎকার করে ওঠে; নিজেকে মহাশূন্যে-খসে-পড়া পালক বলে মনে করে; ওই সৌন্দর্য উপভোগের সময় বারবার মরে যেতে যেতে বেঁচে ওঠে, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারে না।

দেলোয়ার তার বউকে নিয়ে সরাসরি আমার ঘরে ঢোকে। এই প্রথম কোনো নারী ঢোকে আমার ঘরে;–আমার ছোটো বোনটি আর মা সব সময়ই আমার ঘরে ঢোকে, একবার একটি সহপাঠিনীও এসেছিলো; কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রথম কোনো নারী আমার ঘরে ঢুকলো। আমার ঘরটি বদলে যায়, সিলিংয়ের এককোণে মাকড়সার জালটি সোনার তন্তুমালার মতো ঝলমল করে ওঠে। আমি লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করি, কিন্তু পেরে উঠি না; দেলোয়ারের বউ তাতে খিলখিল করে হেসে ওঠে। ওই হাসি শুনে আমার মনে হয় আমি অজস্র অপরাধ করে ফেলেছি, তবে সেগুলো ক্ষমার অযোগ্য নয়; অন্যরা না হলেও ডলি সেগুলো অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়ে সুখ পাচ্ছে। ডলি ক্ষমা করে দিলেও আমি অজস্র অপরাধের ভার বোধ করতে থাকি। আমার ভেতরে একটি পুরোনো অপবিত্রতার বোধও জেগে ওঠে। তারা দুজনেই আমাকে নির্দেশ দেয় তাড়াতাড়ি উঠতে, এবং তাদের সাথে যেতে। আমি কোনো প্রশ্ন করি না–প্রশ্ন করলেই আমার অপরাধ বাড়বে মনে হয়; উঠে আমি নিজেকে তৈরি করে নিই, এবং তাদের সাথে বেরিয়ে পড়ি। আমি গাড়ির পেছনের সিটে বসতে চাই, ডলি বসতে দেয় না; সে-ই উঠে পেছনের সিটে বসে; সম্ভবত একটি পুরুষকে পেছনের সিটে বসিয়ে নিজে একটি পুরুষের পাশে বসতে তার দ্বিধা হয়। আমি সামনের সিটে বসি; দেলোয়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে।

গাড়িতে উঠে আমি জানতে পারি তারা আমাকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের পর দেলোয়ার এই প্রথম যাচ্ছে ডলিদের গ্রামের বাড়ি; অন্যরা সবাই চলে গেছে, এর মাঝে দেলোয়ার

আর ডলিও হয়তো গিয়ে পৌঁছোতো; কিন্তু বাসা থেকে বেরিয়ে আমার কথা মনে পড়ে দেলোয়ারের। আমাকে চমকে দেয়ার জন্যে তারা ঠিক করে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে; আমি রাজি না হলেও তারা শুনবে না। আমি টের পাই গাড়িটা পুরোপুরি সুগন্ধে ভরে আছে। পেছনের সিট থেকে কোমল মাংসের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া সুগন্ধ এসে আমার নাকে লাগতে থাকে। বেশি সুগন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে; কিন্তু আমি খুব আনন্দে রয়েছি এমনভাবে বসে থাকি। এক সময় আমার মনে হয় গাড়ি সুগন্ধে নয়, মাংসের গন্ধে ভরে উঠছে, সোনালি মাংসের ভেতর থেকে গন্ধ উঠে আসছে; তখন গাড়ি থেকে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে আমার ইচ্ছে হয়। দেলোয়ার গাড়ি চালাচ্ছে, আর অনবরত কথা বলছে, আর ডলি অনবরত হেসে চলছে; ডলির হাসির শব্দও আমার কাছে মাংসে গঠিত বলে মনে হয়। ডলির দিকে পেছন ফিরে একবারও আমি তাকাই নি, কিন্তু তার হাসি শুনে আমি বুঝতে পারি সম্ভব হলে সে গাড়ি ভ'রে মাংস ছড়িয়ে দিতো; তাল তাল মাংসের গোলাপ ফুটিয়ে তুলতে গাড়ি জুড়ে। ডলি এখন পুরোপুরি মাংস। আমি ভয়ঙ্কর মাংসের গন্ধ পেতে থাকি; নারায়ণগঞ্জ নামের একটি শহরের কথা আমার মনে পড়ে; ইচ্ছে হয় দেলোয়ারকে গাড়ি থামাতে বলি, বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ নিশ্বাস নিই; কিন্তু দেলোয়ারকে আমি গাড়ি থামাতে বলতে পারি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফেরিঘাটে পৌঁছি। শহরের সব লোক সম্ভবত বাস ট্রাক বেবি জিপ গাড়ি করে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে; হয়তো শহরে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে, বা শহরে মড়ক লেগেছে, বা আজই শহর ভ'রে প্লেগ দেখা দেবে, এমন ভিড় ফেরিঘাটে; তবে দেলোয়ার চমৎকার গাড়ি চালাতে জানে-সে একটির পর একটি গাড়ি পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এক সময় তাকেও থামতে হয়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো, বারবার নেমে পড়ার প্রচণ্ড চাপ বোধ করছিলাম; কিন্তু নেমে পড়া ঠিক হবে

কি না আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। দুটি জিনিশ কঠোর পীড়া দিচ্ছিলো আমাকে;– মাংসমেশানো সুগন্ধে আমার দম আটকে আসছিলো, আর গাড়িতে বসে ফেরিতে ওঠার ভয় পেয়ে বসছিলো আমাকে। আমি তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। আমি কী করে প্রকাশ করি যে বন্ধুর নতুন বউর শরীর থেকে যে-সুগন্ধ বেরোচ্ছে, তাতে আমি কাঁচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছি; তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে? আর আমি কী করে বলি যে গাড়িতে বসে ফেরিতে উঠতে আমার ভয় হচ্ছে? আমাদের সামনের পেছনের বাসগুলোর লোকদের তো ভয় হচ্ছে না। দেলোয়ার আর তার বউর তো ভয় হচ্ছে না। আমার একা কেনো ভয় হবে? আমার একার ভয় হওয়া ন্যায়সঙ্গত নয় বলে আমার মনে হচ্ছিলো। তবে আমার ভয় করছিলো; তাতেই হয়তো আমি বেশি করে তীব্র মাংসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। গাড়িতে বসে পানি দেখলে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়; আমি দেখতে পাই বাক্সের ভেতরে বন্দী করে কারা যেনো আমাকে পানিতে ফেলে দিয়েছে; আমি বেরোতে পারছি না। আমার এই অনুভূতি হতে থাকে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

আমি হঠাৎ দরোজা খুলে বাইরে একটি পা রাখি।

তুমি বাইরে বেরোতে চাও? দেলোয়ার জিজ্ঞেস করে।

আমি কোনো উত্তর দিই না; তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

ডলি, তুমিও বেরোও, দেলোয়ার পেছনের দিকে তাকিয়ে বলে, ফেরিতে ওঠার সময় গাড়িতে থাকা ঠিক না।

আমি নিশ্চিত ছিলাম ডলি বেরোতে চাইবে না, দেলোয়ারের সাথেই থাকতে, চাইবে;–আমি তা-ই চাচ্ছিলাম। কিন্তু ডলি দরোজা খুলে বেরোনোর উদ্যোগ নিলে আমি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করি; আমি বন্দী হয়ে পড়ছি বলে আমার মনে হয়। ডলির সাথে এখনো আমার সরাসরি কোনো কথাই হয় নি; সে গাড়ি থেকে বেরোলে আমার কি তার সাথে কথা বলতে হবে না? আমি কি তাকে পেছনে রেখে পোন্টুনের দিকে একা হাঁটতে পারবো? একা হেঁটে যাওয়া কি ঠিক হবে? তার সাথে আমি কী কথা বলবো? আমি এগিয়ে গিয়ে কথা বললে সে কি কিছু মনে করবে না? দেলোয়ার কি গাড়ি থেকে তাকিয়ে লক্ষ্য করবে না আমি ডলির সাথে কীভাবে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি? তার কি তখন একটু কেমন লাগবে না? নিজেকে আমার অস্বাভাবিক মনে হতে থাকে; একবার সামনের দিকে বেশ বড়ো করে পা ফেলি, ঠিক কোথায় পা ফেলবো বুঝে উঠতে পারি না; একটু থেমে যাই, এবং পেছনের দিকে তাকাই। ওদিকে সামনে গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ফেরিতে ওঠা শুরু হয়ে গেছে, দেলোয়ার বেশ দ্রুত গাড়ি এগিয়ে নিচ্ছে। আমাদেরও–ডলির এবং আমার, তাড়াতাড়ি ফেরিতে গিয়ে উঠতে হবে। আমি একবার ডলির দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াই; ডলিও একবার আমার দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ায়।

গাড়িগুলো ফেরিতে উঠছে যেনো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে; অসংখ্য লেমিং ছুটছে কে কার আগে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; বা শিশুরা ছুটছে কোনো মজার পুরস্কার পাবে বলে। দেলোয়ার গাড়ি নিয়ে সবার আগে ফেরিতে উঠে গেছে; ডলি আর আমি পিছিয়ে পড়েছি; একটা ট্রাকের জন্যে তার গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দ্রুত ফেরির একপাশ দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকি; আমি একবার দেলোয়ারের গাড়িটা দেখি; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার গাড়িটা আর দেখতে পাই না। ফেরির সামনের দিকের লোকগুলো একবার

খুব জোরে চিৎকার করে ওঠে; এবং একটা ট্রাক ভয়ঙ্কর শব্দ করে ব্রেক কষে। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে শূন্য নদী দেখি; ডলি আমার দিকে অন্ধ হয়ে তাকায়।

আমি যে খুব জোরে চিৎকার করে উঠতে পারি না, তাতে আমার বিস্ময় লাগে না; কিন্তু ডলিও যে চিৎকার করে ওঠে না, তাতে আমি অপরাধ বোধ করতে থাকি। ডলির খুব জোরে চিৎকার করে ওঠা উচিত–আমার মনে হতে থাকে; তার নদীতে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত-আমার মনে হতে থাকে; কিন্তু সে তা কিছুই করে না। তাতে আমার ভেতরে বেশি করে অপরাধবোধ জমতে থাকে। কেউ কেউ দেলোয়ারের গাড়ির জন্যে, দেলোয়ারের জন্যে, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; তবে ওসব পণ্ডশ্রম;–দেলোয়ার যদি নিজে না উঠে আসে, তাহলে কেউ দেলোয়ারকে উঠিয়ে আনতে পারবে না; যখন পারবে তখন দেলোয়ার আর দেলোয়ার থাকবে না। লোকজন ঘিরে ধরেছে আমাদের, যে নদীতে পড়ে গেছে তার সাথে আমার কী সম্পর্ক, বিশেষ করে ডলির কী সম্পর্ক জানার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমরা কিছু বলছি না, বলতে পারছি না। কয়েকটি দারোগাপুলিশ এসে পড়েছে; বড়ো দারোগাটি আমাদের সম্পর্ক না জেনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না মনে হচ্ছে। সমস্ত সম্পর্ক জানার পরই সে ঠিক করতে পারবে দেলোয়ারের গাড়ি পানির ভেতর থেকে কীভাবে উদ্ধার করা হবে, বা উদ্ধার করা হবে কি না। আমি তাকে জানাই গাড়ি নিয়ে যে ডুবে গেছে, সে আমার বন্ধু; তার নাম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন; আর যে-মহিলাটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী; তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে। দারোগা আর চারপাশের লোকগুলো আমার আর ডলির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। তাদের অদ্ভুত চোখ দেখে আমার মনে হয় আমার গাড়ির ভেতরে থাকা উচিত ছিলো; গাড়ির সাথে তলিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো; এমন মনে হওয়ার সাথে সাথে আমার ভেতরে অপরাধবোধটি আরো ঘন হয়ে উঠতে থাকে। গাড়ির ভেতরে ওই মাংসমেশানো গন্ধ যদি

না পেতাম, আর পানি দেখে আমার যদি ভয় না লাগতো, অর্থাৎ আমি যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হতাম ওই বাসের ভেতরে বসে থাকা লোকগুলোর মতো, এবং সাহসী হতাম, তাহলে এখন এই বড়ো দারোগা আর পাঁচটি পুলিশ আর চারপাশের লোকগুলো আমাদের দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারতো না। আমি না হয় গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলাম, কিন্তু ডলি নামলো কেনো? তার তো থাকার কথা ছিলো দেলোয়ারের সাথে। মাংসল কোনো গন্ধ নিশ্চয়ই তার নিশ্বাস বন্ধ করে নি; তবে সেও কি আমার মতো কোনো ভয়ে পীড়িত বোধ করেছিলো? তাহলে সে কি দেলোয়ারকে সম্পূর্ণ ভালোবাসে না? সে কি পানি দেখে ভয় পেয়েছিলো?–কেনো ভয় পাবে? লোহার সিন্দুকে ভরে তাকে কেউ পানিতে ফেলে দিয়েছে, এমন শ্বাসরুদ্ধকর বোধ তার হয়েছিলো?–কেনো স্বাসরুদ্ধকর বোধ হবে? সে কি সিন্দুকে দেলোয়ারকে দেখতে পায় নি? দেলোয়ার যদি সে-সিন্দুকে থাকে, তার শ্বাস কেনো আটকে আসবে? সে কি দেলোয়ারকে সম্পূর্ণ ভালোবাসে না? স্ত্রী হওয়ার সাথে সাথেই কি ভেতর থেকে ভালোবাসা জন্ম নেয় না? তাদের শরীর যেমন মিলিত হয়েছে, আমি ধরে নিচ্ছি, এক শরীর থেকে মধু যেমন ঢুকেছে আরেক শরীরে, তেমনভাবে এক শরীর থেকে আরেক শরীরে কি তাদের আত্মা আর প্রেম ঢোকে নি? ডলির বাইরে বেরিয়ে পড়াটা আমি সমর্থন করতে পারি না; এবং চারপাশে তাকিয়ে দেখি চারপাশের চোখ আমাদের, ডলির এবং আমার, বাইরে বেরোনো সমর্থন করতে পারছে না।

বড়ো দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন কেনো?

প্রশ্ন শোনার সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারি আমি অপরাধ করেছি। দারোগারা শুধু প্রশ্ন করে না; তাদের প্রশ্নের ভেতরে অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত থাকে; আমি বড়ো দারোগার প্রশ্নের মধ্যে ওই নিশ্চিত সিদ্ধান্তটি শুনতে পাই। আমার মনে হয় আমি

অপরাধ করেছি কি না তা আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি না; বুঝতে পারছে বড়ো দারোগা; তার পোশাক, গোঁফ, হাতের লাঠি জানিয়ে দিচ্ছে অপরের ব্যাপার, বিশেষ করে অপরাধের ব্যাপার, বোঝার অধিকার তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আমি অপরাধ করেছি কি না তা বোঝার শক্তি বা অধিকার আমার নেই, তা বুঝতে পারে ওই বড়ো দারোগা; এবং তার কথা শুনে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি আমি অপরাধ করেছি।

আমি বলি, গাড়ির ভেতরে সুগন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো।

আমার কথা শুনে চারপাশ ডলির দিকে তাকায়, এবং ডলি তাকায় আমার দিকে।

দারোগা বলে, সুগন্ধে কারো দম বন্ধ হয়ে আসে না।

আমিও বড়ো দারোগাকে সমর্থন করি; আর কেউ যদি আমাকে বলতো সুগন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসে, তাহলে আমিও বলতাম সুগন্ধে কারো দম বন্ধ হয়ে আসে না। কিন্তু সত্যিই সুগন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো; বিশেষ করে মাংসমেশানো সুগন্ধে; এবং আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছিলো, তাতে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকে।

তবু আমি বলি, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

দারোগা আমার দিকে প্রভুর মতো তাকায়; আমার মনে হতে থাকে এখন সে যে-কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে; এবং সে যে-সিদ্ধান্তই দেবে, তা-ই ঠিক সিদ্ধান্ত। আমি তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবো, কেননা তাতে কোনো ভুল হতে পারে না।

দারোগা বলে, আপনি সুস্থ নন।

আমি চারপাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সবাই বড়ো দারোগার সাথে একমত; এমন কি ডলির মুখও বলছে আমি সুস্থ নই।

বড়ো দারোগা আমার সম্পর্কে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে; ডলির সম্পর্কে তার এখনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি। ডলির সম্পর্কেও তার সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

বড়ো দারোগা ডলিকেও জিজ্ঞেস করে, আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন কেনো?

ডলি বলে, গাড়িতে আমার ভয় করছিলো।

বড়ো দারোগা জিজ্ঞেস করে, কেনো ভয় করছিলো?

ডলি বলে, মরে যাওয়ার ভয় করছিলো।

বড়ো দারোগা জিজ্ঞেস করে, আপনাদের না নতুন বিবাহ হয়েছিলো?

ডলি বলে, হ্যাঁ।

বড়ো দারোগা বলে, তাহলে কেনো ভয় করলো?

ডলি কোনো উত্তর দেয় না; সে একবার নদীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করে। বড়ো দারোগা ডলি আর আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। তার চোখ দেখে মনে হয় নতুন বিয়ে হলে স্বামীর সাথে গাড়ি করে ফেরিতে উঠতে ভয় পাওয়া আইনসম্মত নয়, নীতিসম্মত নয়।

বড়ো দারোগা জিজ্ঞেস করে, আপনি কি জানতেন দুর্ঘটনা ঘটবে?

ডলি বলে, না।

বড়ো দারোগা বলে, তাহলে আপনি ভয় পাচ্ছিলেন কেনো?

ডলি বলে, জানি না; কিন্তু আমার ভয় করছিলো।

ডলির থেকে যা জানার বড়ো দারোগার জানা হয়ে গেছে; সে এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের মধ্যে কে আগে নেমেছিলেন?

আমি বলি, আমি।

বড়ো দারোগা জিজ্ঞেস করে, আপনাদের কি আগে থেকে পরিচয় ছিলো?

আমি কিছু বলার আগে ডলি উত্তর দেয়, না।

বড় দারোগা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেনো?

আমি বলি, দিতে দেরি হয়ে গেছে।

বড়ো দারোগা বলে, এতো দেরি স্বাভাবিক নয়।

দেলোয়ার ভেসে ওঠে নি; সবাই সম্ভবত অপেক্ষা করছিলো দেলোয়ার ভেসে উঠে সকলের কৌতূহল মেটাবে; বিশেষ করে দারোগা আর পুলিশরা সরকারি দায়িত্ব হিশেবেই দেলোয়ারের লাশটির ভেসে ওঠার প্রত্যাশা করছিলো। পারলে তারা লাশটিকে ভেসে ওঠার আদেশ দিতো। তাহলে সরকারের অপচয় বাঁচতো; কিন্তু দেলোয়ার তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে নি। দারোগার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি দেলোয়ারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম; মনে করতে পারছিলাম না আমি কেনো ফেরির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, আমার সামনে কেনো দারোগা আর পুলিশ, আর কেনোই বা একটি নারী আমার পাশে। দেলোয়ার ভেসে ওঠে নি; তাই ফেরিটি এখন ছাড়বে; বড়ো দারোগা আমাদের কাছে জানতে চায় কোথায় খবর দিতে হবে। কোথায় খবর দিতে হবে, আমি জানি না; ডলি জানে। আমি ডলির দিকে তাকাই; ডলি তাদের গ্রামের ঠিকানা বড়ো দারোগাকে লিখে দেয়। বড়ো দারোগার সাথে ডলি আর আমি পোন্টুনে ফিরে আসি; ফেরিটি ছেড়ে দেয়। ডলির দিকে তাকিয়ে আমি অপরাধ বোধ করতে থাকি। ডলিকে অদ্ভুত দেখাতে থাকে; মনে হয় ডলি এখন কাঁদতো, কিন্তু কাঁদতে পারছে না; বড়ো দারোগা বা এই নদী বা আমার সামনে সে নিজের বা দেলোয়ারের জন্যে কাঁদতে পারবে না।

দেলোয়ারের গাড়িটি উঠোনোর জন্যে একটি উদ্ধারকারী জাহাজকে খবর পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে? আমি জানি না; আমার মনে হয় খবর পাঠানোই নিয়ম, নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছে। কোনো জাহাজ এসে পৌঁছে নি। আমার কোনো তাড়া নেই; ডলিরও কোনো তাড়া নেই-সে পোন্টেনের এককোণে গিয়ে এমনভাবে বসেছে যে বোঝা যাচ্ছে তারও কোনো তাড়া নেই; খুব শিগগির সে কোনো তাড়া বোধ করবে না। কোনো জাহাজ আসে নি; তবে পুলিশরা খুবই দক্ষ-দলে দলে ডলিদের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পৌঁচোচ্ছে; আমি অবশ্য তাদের কাউকেই চিনি না। তারা আসার পরই আমি প্রথম শোকের চাপ বোধ করতে শুরু করি;–তারা চিৎকার আর অশ্রুতে চারপাশ মুখর ও ভারাক্রান্ত করে আসতে থাকে; আমি ওই চিৎকার শুনে হঠাৎ এক প্রচণ্ড অভাব বোধ করি। আমার মনে হতে থাকে দেলোয়ার নেই, দেলোয়ারকে আমি আর কখনো দেখবো না; পরিচিত কারো সাথে দেখা হলেই দেলোয়ার আর আমার কথা বলবে না, আমিও তার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাবো। ডলিদের বাড়ির লোকজন আমাকে চেনে না বলেই আমার কাছে কেউ আসছে না; সবাই ডলিকে ঘিরে ধরছে, ডলি কোনো কথা বলছে না। একবার আমার মনে হয় আমি খুব দূরে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু দূরে যেতে পারি না; বরং ভিড় ঠেলে একটু একটু করে ডলির বেশ কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই। মেয়েরা ডলিকে জড়িয়ে ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঁদার চেষ্টা করছে, বা ডলিকে কাঁদাতে চাচ্ছে; কিন্তু ডলি কাঁদছে না। আমি দেখতে পাই ডলি চোখ দিয়ে কী যেনো খুঁজছে; এক সময় তার চোখ এসে আমার চোখের ওপর পড়ে; ডলি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আমি অন্য দিকে তাকাই; আর তখনই দেখি দেলোয়ারের বাবা, মা, একটি বোন, আর একটি ভাই জড়াজড়ি করে কেঁদে কেঁদে ফেরি থেকে নামছে। আমি তাদের দিকে এগিয়ে যাই, দেলোয়ারের বাবাকে জড়িয়ে না হলেও ধরার চেষ্টা করি। তাকে আমি ঠিকমতো

ধরতে পারি না; আমার মনে হয় তিনিই আমাকে ধরতে দিচ্ছেন না; আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান; ডলির দিকে আর এগোন না। দেলোয়ারের মা একবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, কিন্তু পারেন না; তাঁকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে দেলোয়ারের ভাইটি ও বোনটি। দেলোয়ারের বাবা লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছেন না; সম্ভবত পুরুষ হওয়ার অসুবিধা এই যে সব কাজ তাদের মানায় না; শেষ সিদ্ধান্ত তারা সহজে নিতে পারে না। আমি সবার মুখের দিকে তাকাতে থাকি, সেখানে আমি কিছুই খুঁজি না; শুধুই তাকাই; অনেকের মুখেই আমি বেদনা দেখতে পাই; ডলির মুখের দিকে তাকাতেই আমি বেদনার বদলে অপরাধবোধ দেখতে পাই। ডলি কি কষ্টের বদলে অপরাধে ভুগছে? সে যে দেলোয়ারের সাথে গাড়িতে থাকে নি, এটা কি তার কাছে অপরাধ মনে হচ্ছে? সে কি মনে করছে দেলোয়ারের সাথে গাড়িতে থেকে পানিতে ডুবে গেলেই সে ঠিক কাজটি করতো; এবং ঠিক কাজটি করে নি বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছে? ডলির মুখে যদি আমি অপরাধের ছাপ দেখতে পাই, তাহলে সবাই আমার মুখে কী দেখছে? আমার মুখ নিশ্চয়ই বেদনায় নীল হয়ে যায় নি; আমি কোনো বেদনা বোধ করছি না, অভাব বোধ করছি দেলোয়ারের; ওই অভাবটা আমার বুকের ভেতরে, মুখে তার কোনো চিহ্ন নেই। আমি যে বেঁচে আছি, এটা অপরাধের মতো মনে হতে চাচ্ছে এখন; ডলির মুখ দেখার পরই এ-বোধটি আমার তীব্র হয়ে উঠছে। আমি কোনো অপরাধ করেছি। আমার তো এখানে থাকারই কথা নয়; এখনো আমি হয়তো পুরোনো প্লেবয়ের পাতা উল্টোতাম, চা খেতাম, সিগারেট টানতাম; দেলোয়ারই তো এখানে আমাকে নিয়ে এসেছে; এবং সে আমাকে অপরাধবোধের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে চিরনিরপরাধের মতো চলে গেছে। কিন্তু আমি কি কোনো অপরাধ করি নি?

দেলোয়ারের বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

আমি বলি, আমি দেলোয়ারের সাথে যাচ্ছিলাম।

তিনি বলেন, তুমি যাবে বলে তো জানতাম না।

আমি বলি, ওরা আমাকে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে।

তিনি এবার জানতে চান, তুমি গাড়ি থেকে নেমেছিলে কেনো?

আমি বুকে একটা আঘাত বোধ করি। আমি তাঁকে বলতে পারি না যে গাড়িতে মাংসমেশানো সুগন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো, তাই আমি গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তিনি দেলোয়ারের সাথে আমাকেও নদীর গর্ভে দেখতে চাচ্ছেন; আমি সেখানে নেই বলে কষ্ট পাচ্ছেন। তার চোখ দেখে আমি অপরাধ বোধ করি; ইচ্ছে হয় দেলোয়ারের সাথে ডুবে যাই, আর লাশ হয়ে দেলোয়ারকে জড়িয়ে ধরে ভেসে উঠি।

আমি তাকে বলি, গাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো।

তিনি বলেন, তাই তুমি বেঁচে আছে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, ডলি কি তোমার সাথেই গাড়ি থেকে নেমেছিলো?

আমি বলি, না।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, ডলি কখন নামে?

আমি বলি, আমি নামার একটু পরে।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ডলিকে আগে থেকেই চিনতে?

আমি প্রায় হ্যাঁ বলে ফেলেছিলাম; কিন্তু বলার একটু আগে আমার মনে পড়ে ডলিকে আমি আগে থেকে চিনতাম না, এখনো চিনি না।

আমি বলি, না।

তিনি বলেন, তাহলে তোমরা দুজন গাড়ি থেকে নেমেছিলে কেনো?

আমি কোনো উত্তর দিই না; দেলোয়ারের বাবা যেনো আমার উত্তর পেয়ে গেছেন এমনভাবে নিচ দিকে ও চারদিকে তাকান; আমার মুখের দিকে আর তাকান না; যেখানে লোকজন ডলিকে ঘিরে আছে, সেদিকে হাঁটতে থাকেন। আমি অন্য কোনো দিকে যেতে পারি না; মনে হয় দেলোয়ারের বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তাঁর হাত থেকে ছুটতে চেষ্ট করছি, কিন্তু ছুটতে পারছি না, এমনভাবে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকি। দূর থেকে আরেকবার আমি ডলির মুখ দেখি; তাতে আমি কষ্ট দেখতে পাই না; একধরনের গোপন শান্তি দেখতে পাই, ওই শান্তির ওপর একটা হাল্কা অপরাধের ছায়া দেখতে পাই।

আমার মুখেও কি অন্যরা অমন কোনো গোপন শান্তি দেখতে পাচ্ছে? তার ওপর দেখতে পাচ্ছে লঘু অপরাধের ছায়া? আমি মাংসমেশানো গন্ধটা আবার পেতে থাকি, তবে এবার আমার দম বন্ধ হয়ে আসে না; আমি গন্ধটা প্রাণপণে বুকের ভেতর নেয়ার জন্যে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস নিই; সুগন্ধে আমার বুক ভরে ওঠে। তারপরই দেলোয়ারের অভাব আবার বোধ করি। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া আমার ঠিক হয় নি, গাড়িতে থাকলেই ভালো হতো বলে মনে হয়। আমার মুখে, আমি নিজেই টের পাই, অপরাধের ছাপটি বেশ ঘন হয়েই লেগেছে; এখন সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে। আমিও আমার মুখটি চারদিকে দেখতে পাচ্ছি, অপরাধবোধের একটি কালো প্রলেপ লেগে আছে আমার মুখটিতে।

দেলোয়ারের মা ডলিকে জিজ্ঞেস করছেন, বউ, তুমি গাড়ি থেকে নেমেছিলে কেনো?

ডলি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; তিনি আবার ওই প্রশ্ন করেন। ডলি কোনো উত্তর দেয় না; দেলোয়ারের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ডলি কী যেনো পড়ার চেষ্টা করে।

ডলি অনেকক্ষণ ধরে পড়ে,–ডলি যেভাবে তাকায় তাতে পড়ার কথাই আমার মনে হয়; পড়া শেষ হলে চুপ করে থেকে শেষে ডলি বলে, আমার ভয় করছিলো।

তিনি বলেন, স্বামীর সাথে থাকতে মেয়েলোকের কী ভয়?

'স্বামী' শব্দটি শুনে আমার যেনো কেমন লাগে, ডলিকে আমার নোংরা মনে হয়।

ডলি বলে, মনে হচ্ছিলো আমি মরে যাবো।

তিনি বলেন, স্বামীর সাথে মরতে পারাও তো মেয়েলোকের ভাগ্য; তোমার সেই ভাগ্যও হলো না।

ডলি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, আনিসের সাথে তোমার আগে থেকে জানাশোনা ছিলো?

ডলি প্রথম আনিস নামটি মনে করতে পারে না বলে আমার মনে হয়; পরে আমার দিকে তাকিয়ে নামটি তার মনে পড়ে। সে অনেকক্ষণ দেলোয়ারের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ডলি বলে, হ্যাঁ; ছিলো।

ডলির কথা শুনে আমি চমকে উঠি।

দেলোয়ারের মা জিজ্ঞেস করেন, তাই তোমরা গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলে?

ডলি বলে, না।

তিনি বলেন, তাহলে নামলে কেনো?

দেলোয়ারের মা এবার আমার দিকে এগিয়ে আসেন; এবং জিজ্ঞেস করেন, বউর সাথে তোমার আগে থেকেই পরিচয় ছিলো?

আমি ডলির দিকে একবার তাকাই; তখন আমার দেলোয়ারের কথা আর মনে পড়ে; ডলি আমার দিকে তাকিয়ে নদীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

আমি বলি, হ্যাঁ; পরিচয় ছিলো।

তিনি বলেন, তাই তোমরা গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলো?

আমি বলি, হ্যাঁ।

তিনি বলেন, এজন্যেই দেলোয়ার খুব জোরে গাড়ি চালিয়েছিলো?

আমি বলি, ফেরিতে ওঠার সময় সবাই জোরে গাড়ি চালায়।

তিনি বলেন, দেলোয়ার অন্যদের মতো না; আমার দেলোয়াররে আমি চিনি।

আমি পোন্টুনের অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করি। দেলোয়ারের ভাই ও বোনটিকে দেখে আমি গোপনে ভয় পাই; ভাইটি আমার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে-বেশ চমৎকার পেশি ছেলেটির। লাফিয়ে পড়তে পারে ডলির ওপরও; এটা ডলির বাবা, ভাইবোন, আর ডলির অন্যরা টের পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে; তারা বেশ নিবিড়ভাবে ডলিকে ঘিরে আছে। তারা

ডলিকে কোনো প্রশ্ন করছে না। তাদের চোখেমুখে আমি একধরনের শান্তি আর উদ্বেগ দেখতে পাই। ডলির ছোটো বোনটি ডলিকে জড়িয়ে ধরে আছে;–কেউ ডলিকে ছিনিয়ে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, এমন একটা উদ্বেগ তার দু-বাহু দিয়ে বয়ে চলছে। তার মুখেও একটা শান্তির ছাপ লেগে আছে। একবার আমার মনে হয় শুধু আমারই কেউ নেই, আমাকে নিবিড়ভাবে ঘিরে রাখার মতো কেউ নেই। দেলোয়ারের গাড়ি খোঁজার জন্যে ডুবুরিরা পানিতে নেমেছে; তাদের ডুব দেখতে আমার ভালো লাগছে। আমি দেলোয়ারের মুখটি মনে করার চেষ্টা করি; কিন্তু তার মুখ মনে করতে পারি না; বারবার ডলির মুখটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেলোয়ার দেখতে কেমন ছিলো? তার কি গোঁফ ছিল? চুল চমৎকারভাবে কাটা ছিলো? কপালে একটা ছোট্ট দাগ ছিলো? আমি কেনো কিছুই মনে করতে পারছি না।

ডুবুরিরা দেলোয়ারের গাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না; স্রোতের টানে গাড়ি আর দেলোয়ার তাদের সমস্ত সীমার বাইরে চলে গেছে; আর পাওয়া যাবে না। শুনে আমার অদ্ভুত ধরনের ভালো লাগে। কিন্তু কেনো? দেলোয়ারের লাশ আমার দেখতে হবে না বলে? দেলোয়ারের লাশের কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না বলে? দেলোয়ারের লাশ যদি আমার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, আনিস, তুমি গাড়ি থেকে নেমেছিলে কেনো, আমি কী জবাব দেবো? আমি কি তাকে বলতে পারবো মাংসমেশানো গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো? আমার ভালো লাগছে তার লাশ আর পাওয়া যাবে না। আমি যেনো তার লাশ গুম করে ফেলতে চাই; যেনো আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে খুন করেছি, লাশটি গুম করে ফেলতে পারলে আমি বেঁচে যাই, এমন মনে হতে থাকে; আমি প্রার্থনা করতে থাকি যেনো কোনো ডুবুরি কোনো দিন দেলোয়ারের লাশ খুঁজে না পায়। পরমুহূর্তে মনে হয় আমি কখনো প্রার্থনা করি নি; প্রার্থনায় আমার বিশ্বাস নেই; প্রার্থনা আমার কাছে হাস্যকর। আমার করুণা হয় নিজের

জন্যে। অমনি আমি দেখতে পাই শুয়ে শুয়ে আমি পুরোনো প্লেবয় পড়ছি, চা খাচ্ছি, সিগারেট টানছি; আমি কোনো নদীতে নেই, গাড়িতে নেই, মাংসমেশানো সুগন্ধে নেই।

দেলোয়ার এখন একটি শূন্য, আমার মনে হতে থাকে, দেলোয়ার কখনো ছিলো না। মরে গেলে সবাই শূন্যে পরিণত হয়। যে মরে যায়, তার কাছে সে শূন্য হয়ে যায়; সে জানে না, সে ছিলো; অন্যরাই শুধু জানে সে ছিলো। আমি জানি দেলোয়ার ছিলো; দেলোয়ার জানে না সে ছিলো। ডলি জানে দেলোয়ার ছিলো; কিন্তু আজ আর দেলোয়ার জানে না ডলি ছিলো, আর সে ছিলো, আর সুগন্ধ ছিলো, আর মাংস ছিলো। শূন্য হয়ে যাওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার; তবে যে শূন্য হয়ে যায় তার কোনো কষ্ট থাকে না। কষ্ট অন্যদের। আমি কষ্ট পাচ্ছি, দেলোয়ারের জন্যে কষ্ট পাচ্ছি; এবং আমার ভেতর থেকে একটি ঘটনা জেগে উঠছে। ঘটনাটি জেগে উঠতেই আরো কষ্ট পাই, আমার শরীর ভেঙে আসে; আমি অন্ধকার দেখতে পাই। আমার সামনে নদী, অত্যন্ত সুন্দর নদী, যাতে আমার বারবার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমি লাফিয়ে পড়ছি না, যাতে দেলোয়ার ডুবে গেছে, আর উঠে আসবে না, ওই নদীই আমার ভেতরে ঘটনাটি জাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নদীর সাথে ঘটনাটির কোনো সম্পর্ক নেই। নদী ঘটনাটি জানে না; এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না; দেলোয়ার যেহেতু এখন শূন্য, তাই সেও জানে না। ঘটনাটি আমার ভেতর জেগে উঠছে; অনেক দিন ভেতরে তলিয়ে ছিলো, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি, জেগে উঠেছে মাঝেমাঝেই; এবং এখন চর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সলিমুল্লাহ হল, সন্ধ্যা, অন্ধকার জেগে উঠছে আমার ভেতরে। আমরা দুজনই তখন কষ্টে ছিলাম-সুন্দর মধুর বিষাক্ত কষ্টের সময় ছিলো সেটা আমাদের। নদী কেনো আমার ভেতরে ওই সন্ধ্যা জাগিয়ে তুলছে? দেলোয়ার শূন্য হয়ে গেছে, সে আর কখনো আমার জীবনে এতোটা জীবিত থাকবে না, তার সাথে আজই আমার শেষ সম্পর্ক, তাই কি ঘটনাটি শেষবারের মতো জেগে উঠছে আমার

ভেতরে? সন্ধ্যার অন্ধকারে দেলোয়ার আর আমি সলিমুল্লাহ হলের গাছের অন্ধকারে হাঁটছি, দেলোয়ার একটি প্রস্তাব দিচ্ছে;–আমার মনে হচ্ছে দেলোয়ার এখনই আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছে, আর আমি তাতে সাড়া দিচ্ছি।

চল্, দেলোয়ার বলে; তারপর ক্রিয়াটি সংশোধন করে বলে, চলো, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

তার 'চল' আর 'চলো' শুনে আমি একটু বিব্রত হই, যেনো আমি কোনো অপরাধ করেছি, এমন মনে হয়। এটা ঘটে আসছে অনেক বছর ধরেই। দেলোয়ার আমাকে মাঝেমাঝেই 'তুই' বলে ফেলে, বন্ধুদের 'তুই' বলাই দেলোয়ারের অভ্যাস; তার অন্য বন্ধুরাও তাকে 'তুই' বলে; কিন্তু আমি তাকে কখনো তুই বলি নি; তাই আমাকে 'তুই' বলতে গিয়ে সে আজো থেমে যায়, অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলে 'তুমি'। তার সাথে দেখা হলেই কথা শুরু করতে গিয়ে আমি অপরাধবোধে ভুগি; আমার মনে হয় দেলোয়ার মনে মনে 'তুই' বলতে চাচ্ছে, এবং চাচ্ছে আমিও তাকে 'তুই' বলি; কিন্তু আমি যেহেতু 'তুমি' বলবো, তাই সে তার কথার জগতটিকে আমার জন্যে পাল্টে নিচ্ছে। আমি দেলোয়ারকে তুই বলতে পারি নি, কাউকেই পারি নি, এতে সব সময়ই আমার মনে হয়েছে আমি অপরাধ করছি।

কোথায়? আমি জানতে চাই।

নারায়ণগঞ্জে।

কেনো?

তুমি কিছু না মনে করলে বলতে পারি।

বলো, কিছু মনে করবো না।

দেলোয়ার ব্রোথেলে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়; আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই। এতে তাড়াতাড়ি রাজি হই যে আমার মনে হয় দেলোয়ার প্রস্তাব না দিলে আমিই প্রস্তাবটি দিতাম। অনেক বছর ধরে রক্তে একটি বিরক্তিকর ক্ষুধা চেপে রেখে রেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; আমি আর ক্লান্তির মধ্যে থাকতে চাই না; মনে হয় দেলোয়ার আমাকে উদ্ধার করছে। আমার ভয় হতে থাকে দেলোয়ার যদি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমাকে একলাই নারায়ণগঞ্জে যেতে হবে। কিন্তু আমি চিনি না। আমি আর বিরক্তি সহ্য করতে পারছি না।

নারায়ণগঞ্জ কেনো, ঢাকায়ই তো আছে? তবু আমি জানতে চাই।

ঢাকার থেকে নারায়ণগঞ্জই ভালো, দেলোয়ার বলে, ঢাকায় আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে।

দেখে ফেললে কী হবে? আমি বলি।

মানসম্মান থাকবে না। দেলোয়ার বলে।

দেলোয়ারের কথা শুনে মানসম্মানের কথা আমার মনে পড়ে। মানসম্মানের কথা কি আমি কখনো ভাবি নি? সব সময়ই তো আমি মানসম্মানের কথা ভেবেছি, কিন্তু আজ আমার মনে পড়লো না কেনো? সত্যিই, যে-মেয়েটিকে দেখলে আমি কেঁপে উঠি,–কেনো যে কাঁপি আমি জানি না; যে-মেয়েটির সাথে তার দুলাভাই আর মামা মাঝেমাঝেই দেখা করতে আসে–আমি বুঝতে পারি না দুলাভাই আর মামারা কেনো এতো স্নেহ পোষণ করেন; মামার সাথে আর দুলাভাইয়ের সাথে মাঝেমাঝেই যে বেবিতে চেপে কোথায় চলে যায়–মামা আর দুলাভাইয়ের সাথে তার কেনো কোথায় যেতে হয়?–সে যদি জেনে ফেলে আমি ব্রোথেলে গিয়েছিলাম, তাহলে আমার মানসম্মান থাকবে না। ওই মেয়েটিকেই মনে পড়ে আমার; কেনো যে মানসম্মানের প্রসঙ্গে শুধু মেয়েটিকেই মনে পড়ে আমি বুঝতে পারি না।

দেলোয়ার বলে, সব কিছু গোপন করতে জানতে হয়।

আমি বলি, হ্যাঁ।

দেলোয়ার বলে, যারা গোপন করতে পারে তারাই সৎ মানুষ–চরিত্রবান।

আমি বলি, আমি মাঝেমাঝে কিছু কিছু গোপন করি।

দেলোয়ার জানতে চায়, যেমন?

আমি বলি, আমি একবার বাবার পকেট থেকে দশ টাকা চুরি করেছিলাম।

দেলোয়ার জানতে চায়, তারপর?

বাড়িতে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিলো, আমি বলি, তবে সবাই আমাকে ভালো জানতো, তাই আমাকে কেউ সন্দেহ করে নি; কিন্তু বাড়ির সবাইকে সন্দেহ করা হয়েছিলো।

দেলোয়ার বলে, তুমি কি সত্যটি এই প্রথম প্রকাশ করলে?

আমি বলি, হ্যাঁ।

দেলোয়ার বলে, সৎ মানুষ হিশেবে তুমি একদিন প্রসিদ্ধ হবে।

আমি বলি, কিন্তু চেপে রাখতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। তোমাকে বলতে পেরে কষ্টটা কমলো।

দেলোয়ার বলে, সৎ মানুষদের অনেক কষ্ট, অনেক সত্য তাদের চেপে রাখতে হয়।

সৎ মানুষদের কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার আর সৎ মানুষ হতে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে ব্রোথেল থেকে ফিরেই সবাইকে জানিয়ে দেবো আমি ব্রোথেলে গিয়েছিলাম। তারপরই আমার ভয় হয়; দেখতে পাই জানিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই আমি আর কোথাও নেই। চারপাশে সৎ মানুষেরা ভিড় করে আসছে; তারা আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান অসৎ, চরিত্রহীন; সে এখানে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাকে এখানে থাকতে হবে।

দেলোয়ার একটি বেবি ঠিক করে; আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠি। এখানে যে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, আসার সাথে সাথেই যে ড্রাইভাররা টানাটানি করে ট্যাক্সিতে তোলে, আমার জানা ছিলো না। আমার চমৎকার লাগতে থাকে, এবং ভয় করতে থাকে। নারায়ণগঞ্জে গিয়ে নামার সাথে সাথে দেলোয়ার একটি রিক্সা নেয়। দেলোয়ার যে রিক্সাটিকে কোথায় যেতে বলে আমি বুঝতে পারি না; আমার ভয় লাগতে থাকে এবং আমার চমৎকার লাগতে থাকে। কিছুক্ষণ পর আমদের রিক্সা একটি অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে; এবং আরো একটি অন্ধকার গলির মুখে এসে থামে। আমি দেলোয়ারের পাশে পাশে হেঁটে গলিতে ঢুকি, তার পেছনে হাঁটতে চাই না; পেছনে হাঁটতে আমার ভালো লাগে না। পেছনে হাঁটলে দেলোয়ার আমাকে কাপুরুষ মনে করতে পারে, বলতে পারে আমি ব্রোথেলে আসার উপযুক্ত হই নি; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। হেঁটে যেতে যেতে একটি মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এই প্রথম কোনো মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে; তার মুখটি আমার ভালো লাগে।

তুমি ওর ঘরে ঢোকো, দেলোয়ার বলে, আমি সামনে যাই।

আচ্ছা। আমি বলি।

মেয়েটি আমাকে টেনে তার ঘরে ঢুকোয়।

আমার বেশ ভালোই লাগছিলো, যদিও মেয়েটি আমার পকেটে হাত দিয়ে আরো পাঁচটি টাকা নিয়ে নিয়েছিলো; এবং কিছুতেই ব্লাউজ খোলে নি, যদিও আমি বারবার খুলতে

বলছিলাম; যদিও মেয়েটি আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলছিলো, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ির উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারছিলাম না; এবং যদিও আমি ভালোভাবে পারি নি, আমি বাইরে পড়ে গিয়েছিলাম; তবু ভালো লাগার অনুভূতিটি আমার অনেকক্ষণ ছিলো। আমি একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি বলে সুখ লাগছিলো; আমার শরীর থেকে বিরক্তি অনেকটা কেটে গিয়েছিলো। কথা ছিলো গলির মোড়ের দোকানটির সামনে আমরা আবার মিলিত হবো। আমি গলির মোড়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে সিগারেট টানতে থাকি, একটি পুলিশ এসে টাকা চাইলে তাকে আমি পাঁচটি টাকা দিই, কিন্তু সে দশ টাকা চায়; আমি বেশ ভয় পাই, এবং তিন চারটি সিগারেট টেনে শেষ করে ফেলি; এক সময় দেলোয়ারকে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠি।

হাঁটতে হাঁটতে দেলোয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কেমন লাগলো?

আমি বলি, খুব ভালো।

দেলোয়ার বলে, তুমি করেছো?

আমি বলি, হ্যাঁ।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার কেমন লাগলো?

দেলোয়ার বলে, আমি তো করি নি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

দেলোয়ার বলে, আমি দেখতে এসেছিলাম, করতে আসি নি।

আমি চুপ করে থাকি।

দেলোয়ার বলে, তুমি আর ভার্জিন নও, তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলো।

আমি ভেঙে প'ড়ে যেতে চাই।

আমি একবার দেলোয়ারকে জিজ্ঞেস করি, তুমি সত্যিই করো নি?

দেলোয়ার বলে, আমি তোমার মতো না।

পা ফেলতে আমার কষ্ট হতে থাকে; আমার মনে হতে থাকে দেলোয়ার সৎ, তার চরিত্র ভালো, সে ব্রোথেলে এলেও এখানকার মেয়েগুলোর সাথে কিছু করে না, তার কৌমার্য নষ্ট হয় নি; আমি সৎ মানুষ নই, আমার চরিত্র ভালো নয়, আমি একটি পতিতা মেয়ের সাথে করেছি; আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে; আমি আর আমার চরিত্র ফিরে পাবো না; আমি আর আমার কৌমার্য ফিরে পাবো না। কৌমার্য হচ্ছে পবিত্রতা, আমি কোথায় যেনো পড়েছিলাম; আমি আর পবিত্র নই। নিজেকে আমার ঘেন্না লাগতে থাকে; বমি বমি লাগতে থাকে; চারপাশের দিকে আমি তাকাতে পারি না; মনে হতে থাকে সবাই বুঝতে পারছে আমি চরিত্রহীন; আমি ব্রোথেলে এসেছি, একটি পতিতা মেয়ের সাথে করেছি। ইচ্ছে হয় হলে

ফিরে ব্লেড দিয়ে আমার অঙ্গটিকে কেটে ফেলতে। তাহলে আমি আবার পবিত্র হয়ে উঠতে পারবো। বসে পড়ে আমার গলগল করে বমি করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি বসি না; বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

মেয়েটি চমৎকার ছিলো, আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, আমার আবার যেতে ইচ্ছে করছে।

দেলোয়ার কোনো কথা বলে না।

তুমি খুব পবিত্র, আমি বলি। ভেঙে পড়তে পড়তে আমি হাঁটতে থাকি।

দেলোয়ার একটি রিক্সা ঠিক করে, আমরা একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকি। সে মোগলাই পারোটা আনতে বলে, দুটো করে মোগলাই পরোটা। আমি অর্ধেকও খেতে পারি না, দেলোয়ার তার দুটো শেষ করে; আমার থেকে একটি নিয়ে খেতে থাকে। আমি দেলোয়ারের মুখের দিকে বারবার তাকাই, তার মুখটিকে আমার পবিত্র মনে হয়; মনে মনে আমি আমার মুখ দেখার চেষ্টা করি। আমার মুখ দেখে আমার ঘেন্না লাগে; আমি দেখি আমার মুখটি বিকৃত হয়ে গেছে, চরিত্রহীনদের মুখ যেমন বিকৃত হয় আমার মুখ তেমন বিকৃত হয়ে গেছে। চরিত্রহীনদের মুখ কেমন? আমার মুখ যেমন? আমি আমার মুখ আর চরিত্রহীনদের মুখ দেখে দেখে ঘেন্নায় কুঁকড়ে উঠি। অনেক দিন পর আমার আত্মার কথা মনে পড়ে, মনে হয় আমার আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে।

দেলোয়ার বলে, তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলো।

আমি তার দিকে অপরাধীর মতো তাকাই।

আমি বলি, আমি অপরাধ করেছি।

দেলোয়ার বলে, তুমি ভার্জিন নও, বিয়ে করে তুমি সুখ পাবে না।

আমি বলি, আমার সুখী হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিলো।

দেলোয়ার হাসতে থাকে।

আমি বলি, আমি বিয়ে করবো না।

দেলোয়ার বলে, তুমি এতো খারাপ হবে আমি ভাবতে পারি নি।

নিজেকে আমার খুব খারাপ মনে হয়। আমার আর ভালোদের সাথে মেশা ঠিক হবে না। যে-মেয়েটিকে দেখে আমি কেঁপে উঠি, যাকে আমার খুব ভালো মনে হয়, তার দিকে আমি আর তাকাবো না। সে তার মামার সাথে বেবিতে যাক, তার দুলাভাইয়ের সাথে বেবিতে যাক, আমি আর কষ্ট পাবো না। দেলোয়ারের পাশে নিজেকে আমার অপবিত্র মনে হয়; আমি আর আমার পবিত্রতা ফিরে পাবো না বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। একটি জিনিশ আছে, কোথায় যেনো আমি পড়েছিলাম, হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। আমি তা হারিয়ে ফেলেছি; আর ফিরে পাবো না।

দেলোয়ারকে দেখলেই, তারপর, আমার মনে অপরাধবোধ জেগে উঠতো। আমি তার দিকে এমনভাবে তাকাতাম যেনো আমি পবিত্র কিছু দেখছি। পবিত্র কোনো কিছু আমি বেশি দেখি নি; পবিত্র জায়গায় আমি কখনো যাই নি; দেলোয়ারই ছিলো আমার কাছে পবিত্রতা। আমি অনেক কিছু ছোঁয়াই ছেড়ে দিয়েছিলাম;–ফুল, আমার কাছে পবিত্র মনে হতো; তাই আমি আর কোনো ফুল ছুঁই নি; আমার ভয় হতো ছুঁলেই পবিত্র ফুলটি অপবিত্র হয়ে যাবে। বই ছুঁতে আমার খুব কষ্ট হতো; কিন্তু বই আমার প্রিয়, বই ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে কষ্টকর; বই আমি না ছুঁয়ে পারি নি;–তবে বারবার বইয়ের কাছে আমি ক্ষমা চেয়েছি। দেলোয়ারের যে-বোনটি, বিলকিস, যশোরে থাকে, যার দুটি তিনটি বাচ্চা, সে আমাকে একদিন খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলো; খুব অপরাধের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, খুব বেদনার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। আমি যদি অপবিত্র না হতাম, তাহলে ওই বেদনা আমার হতো না; ওই অপরাধবোধ আমার হতো না। দেলোয়ারের খোঁজে এক বিকেলে আমি তাদের বাসায় যাই; গিয়ে দেখি কেউ নেই; শুধু বিলকিস রয়েছে। বিলকিস আমাকে দেখে চৈত্রের গোলাপের মতো ফুটে উঠতে আর ছড়িয়ে পড়তে থাকে; আর আমি অপরাধবোধে কাতর হয়ে পড়ি। বিলকিস দেখতে শ্যামলা, কিন্তু ওর মুখভরা সৌন্দর্য ও আমার মতো একটি অপবিত্র মানুষের জন্যে এমনভাবে ফুটছে দেখে আমার কষ্ট হয়।

বিলকিস আমাকে কিছুতেই ফিরে আসতে দেয় না; বাসায় আমাকে ঢুকতেই হয়, আমি বসার ঘরে বসি। বিলকিস চমৎকার চা বানাতে পারতো; তার বানানো চা খেয়েই সারাজীবন বেঁচে থাকা সম্ভব বলে কখনো কখনো আমার মনে হতো। বিলকিস আমার জন্যে চা বানিয়ে আনে, সোনালি চা দেখে আমার ভয় লাগতে থাকে; যদি ওই চা আমার ছোঁয়ায় নোংরা হয়ে যায়?

বিলকিস বলে, আনিসভাই, চা খান।

আমি বলি, এই খাচ্ছি।

বিলকিস বেরিয়ে যায়, আমি এক চুমুকে চা শেষ করে ফেলি; বারবার পেয়ালা ছুঁতে আমার সাহস হয় না। দেখি বিলকিস একটি লাল টকটকে গোলাপ হাতে ঢুকছে, দেখে আমি আবার ভয় পাই। বিলকিস আমার দিকে গোলাপটি বাড়িয়ে আমার মুখের দিকে গোলাপের মতো ফুটে থাকে। শ্যামলা গোলাপের মতো বিলকিসের মুখ, তার হাতে লালগোলাপ;– আমি আমার সামনে দুটি গোলাপ দেখতে পাই, দুটি গোলাপের কাছে অপরাধী বোধ করি।

বিলকিস অদ্ভুতভাবে ফুটতে ফুটতে বলে, নিন।

আমি বলি, না, বিলকিস।

বিলকিস বলে, কেনো?

আমি বলি, আমি ছুঁলে গোলাপটি অপবিত্র হয়ে যাবে।

বিলকিস আমার দিকে বিস্মিত হয়ে থাকায়।

আবার বলে, কেনো?

আমি বলি, আমি অপবিত্র।

বিলকিস বলে, তাতে কিছু যায় আসে না আনিস ভাই।

আমি আবার বলি, বিলকিস, আমি অপবিত্র।

বিলকিস কেঁদে ফেলে, তাতে কিছু যায় আসে না আনিস ভাই, আমার কাছে আপনি পবিত্র।

বিলকিস নিশ্চয়ই সত্য বলছে, আমার এমন বিশ্বাস হতে চায়; তবু আমি বিলকিসের হাত থেকে গোলাপ নিতে পারি না; আমার ভয় হতে থাকে আমি ছুঁলেই গোলাপের পাপড়ি থেকে পুঁজ ঝরতে থাকবে।

আমি বলি, বিলকিস, আমি ছুঁলে গোলাপটি পুঁজে ভরে উঠবে, পাপড়ি থেকে পুঁজ ঝরতে থাকবে।

বিলকিস কাঁপতে থাকে।

বিলকিস গোলাপটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পাশে বসে; তার শ্যামল মুখটি আমার মুখের কাছে তুলে ধরে, এবং বলে, তাহলে একবার আমাকে ছূঁন, আনিস ভাই; একবার আমাকে ছূঁন।

আমি বলি, তাহলে তোমার শরীর থেকে পুঁজ ঝরতে থাকবে, বিলকিস।

বিলকিস ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ডলির বাবা আমার পাশে

ডলির বাবা আমার পাশে এসে দাঁড়ান, এমনভাবে যেনো তিনি আমার বাবা; আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি সুখী বোধ করছেন; আমি যে নদীতে হারিয়ে যাই নি এটা তার জন্যে একটি গভীর সুখ। আমার মনে হয় এই প্রথম কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। দেলোয়ারের বাবা এমনভাবে দাঁড়ান নি, যদিও তিনি অনেক বছর ধরেই আমাকে স্নেহ করেন; আর ডলির বাবা হয়তো এর আগে আমাকে একবার দেখেছেন। তাঁর মুখে আমি প্রশান্তি দেখতে পাই।

তিনি বলেন, তুমি নেমেছিলে বলেই ডলি নেমেছিলো।

আমি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু নদীটাকে দেখতে পাই না।

তিনি বলেন, তোমার জন্যেই আমার মেয়েটি বেঁচে আছে।

আমি বলি, না।

তিনি বলেন, তুমি না নামলে ডলি নামতো না।

আমি বলি, আমার নামা ঠিক হয় নি।

তিনি বলেন, এ কী বলছো, বাবা?

আমি বলি, আমার বন্ধু মারা গেছে।

তিনি অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, বিব্রত বোধ করেন; এবং বলেন, না, না; দেলোয়ারের জন্যে দুঃখের আমার শেষ নেই, সে আমার ছেলেই ছিলো, তবু।

আমি দেলোয়ারের মায়ের দিকে এগিয়ে যাই; তিনি আমার মুখের ওপর তার দুটি চোখ স্থির করে রাখেন।

আমি বলি, গাড়ি থেকে নেমে আমি অপরাধ করেছি।

তিনি কোনো কথা বলেন না; অন্যরা আমার চারপাশে ঘিরে আসে।

আমি আবার বলি, আমি অপরাধ করেছি।

আমি হাঁটতে থাকি; কারো দিকে তাকাই না; আমার পেছনে একটি নদী আছে, সে-কথা আমি ভুলে যেতে চাই; আমার পেছনে ডলি আছে, ডলির বাবা, মা আছেন, দেলোয়ারের বাবা, মা আছেন, অন্যরা আছে, ডুবুরিরা আছে, সে-কথা আমি ভুলে যেতে চাই। পোন্টুন থেকে হেঁটে আমি সড়কে উঠি; সড়ক ধরে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে আমার ভালো লাগতে থাকে; আমার মনে হতে থাকে নদীর ভেতর থেকে, নদীর ভেতরে ডুবে-যাওয়া গাড়ি থেকে এইমাত্র আমি উঠে এসেছি; পরমুহূর্তে মনে হয় গাড়ি নিয়ে আমি ডুবে যাচ্ছি, গাড়ির কাঁচ ভাঙার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করছি, দেলোয়ার আমাকে জড়িয়ে ধরছে, তাকে ছাড়িয়ে কাঁচ

ভেঙে আমি ওপরে উঠে আসছি; আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না, আমার শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি সড়কের পাশে বসে পড়ি; আমার ঘুম পায়।

মাঝরাতে আমি বাসায় ফিরলে মা বেশ অবাক হয়। এতো রাতে আমি অনেক বছর বাসায় ফিরি নি।

মা জিজ্ঞেস করে, কেমন বেড়ালি?

আমি বলি, ভালো।

আমার ঘরে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি; বিস্ময়কর ঘুম হয় আমার। এমন গভীর ঘুম আমার অনেক দিন হয় নি। আমার ঘুম হয়তো ভাঙতো না, বছরের পর বছর হয়তো আমি ঘুমিয়ে চলতাম, কিন্তু আমি ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই আমার দরোজায় কারা যেনো ভিড় করেছে, দরোজায় ভীষণ শব্দ করছে, আমাকে ডাকছে; আর আমার মনে হতে থাকে আমি পানিতে ডুবে গেছি, একটি বাক্সের ভেতর আটকে গেছি আমি, বাক্সটি আমি খুলতে পারছি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম ভাঙলে আমি দরোজা খুলতেই সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আমি জানতে চাই, কী হয়েছে।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে; ছোটো বোনটি আমাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকে। বাবার হাতে আমি সকালের কাগজটি দেখতে পাই।

বাবা জিজ্ঞেস করেন, ফিরে এসে কিছু বললি না কেনো?

আমি বলি, গাড়ি থেকে নেমে আমি অপরাধ করেছি।

মা কেঁদে ওঠে, কী বলছিস তুই, তাহলে তোকে আমি কোথায় পেতাম?

আমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়ি; হাতের পাশে একটি পুরোনো প্লেবয় পাই। আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না, আমি প্লেবয়ের পাতা উল্টোতে থাকি; মাঝের পাতাগুলোতে এসে প্লেমেইটটির ছবি দেখতে থাকি, মেয়েটির এতো কিছু এতো অপরূপভাবে আছে, মেয়েটির সব কিছু আমার ভালো লাগতে থাকে, তার শরীর থেকে মাংসমেশানো একটি সুগন্ধ এসে আমার নাকে লাগতে থাকে; আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে না। আমি অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটির ছবির ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকি; মেয়েটি জীবিত হয়ে উঠবে বলে আমার মনে হয়, ডলিকে আমার মনে পড়ে। দেলোয়ার নিশ্চয়ই ডলির বুকে মাথা রেখে এভাবে ঘুমোতে; আমি কখনো ঘুমোবো না, কেননা আমি কখনো বিয়ে করবো না, কেননা আমি অপবিত্র। হঠাৎ আমার মনে হয় আমি আর অপবিত্র নই, কেউ জানে না আমি অপবিত্র; দেলোয়ার জানতো, সে আর নেই; বিলকিসকে আমি একবার বলেছিলাম, কিন্তু আমার অপবিত্রতা তার কাছে পবিত্রতার থেকেও পবিত্র; আজ আর কেউ জানে না আমি অপবিত্র। দেলোয়ার কাউকে বলে নি বলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। সে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলো, অন্য কারো কাছে সে আমার অপবিত্রতার কথা বলে নি। কেনো বলে নি? তাহলে আমি অন্যদেরও দেলোয়ারের মতো পবিত্র ভাবতাম বলে? অন্যদের সাথে দেখা হলে আমার কখনো অপবিত্রতার বোধ হতো না; হতো দেলোয়ারের সাথে দেখা হলে; দেলোয়ার আমার

কাছে অন্যদের সমান হতে চায় নি বলেই হয়তো বলে নি। নিজেকে আমার হাল্কা লাগতে থাকে; এখন আমি আর কারো কাছে অপবিত্র নই। কিন্তু যে-মেয়েটিকে আমার ভালো লাগতো, আট বছর আগে, সে কোথায় আমি জানি না; সে তার মামার সাথে পালিয়ে গেছে, শুনেছি আমি; মেয়েটির মুখ আমি মনে করতে পারি না; কিন্তু আমার ভালো লাগতে থাকে। তার সাথে দেখা হলেও আমি অপরাধবোধে ভুগবো না।

দু-তিন দিন আমি ঘর থেকে বেরোই নি; বিছানা ছেড়েই উঠি নি। তারপর আমার বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাসা থেকে বেরিয়ে বুঝতে পারি না কোথায় যাবো; তবে আমি একটি রিক্সা ডেকে ফেলেছি, রিক্সাঅলা আমার সামনে এসে থেমেছে, না থামলেই আমার ভালো লাগতো। রিক্সাঅলাকে ফিরিয়ে দেবো? লোকটি আমার দিকে কেমন করে তাকাবে না? আমি রিক্সায় উঠে বসি, রিক্সাঅলাকে আমি আজিমপুর যেতে বলি। আমার দেলোয়ারদের বাসায়ই যেতে ইচ্ছে করে। গেলেই হয়তো আমি দেলোয়ারকে দেখতে পাবো। রিক্সা থেকে নেমে আমি দেলোয়ারদের বাসার সামনে এসে দাঁড়াই; বাসার ঘণ্টা বাজাতে গিয়ে আমি থেমে যাই; সেখান থেকে নেমে এসে আমি রাস্তায় দাঁড়াই। তারপর আবার দেলোয়ারদের বাসার দরোজায় গিয়ে দাঁড়াই, আবার ঘণ্টা বাজাতে গিয়ে থেমে যাই; এবং রাস্তায় নেমে আসি। ওই মুহূর্তে আমার নারায়ণগঞ্জ যেতে ইচ্ছে করে, দেলোয়ারের সাথে একবার আমি যেখানে গিয়েছিলাম। আমি এখন যদি নারায়ণগঞ্জ যাই, দেলোয়ার তা জানবে না; আমি যে আবার অপবিত্র হয়ে গেছি, দেলোয়ার তা জানবে না; আমাকে বলতে পারবে না তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। একবার অপবিত্র হওয়ার পর কেউ কি দ্বিতীয় বার অপবিত্র হতে পারে, একবার চরিত্র নষ্ট হওয়ার পর কি দ্বিতীয় বার চরিত্র নষ্ট হতে পারে? আমার আর কিছু অপবিত্র হওয়ার নেই, আর কিছু নষ্ট হওয়ার নেই। আমি একটি রিক্সা নিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে যাই, দেখি সেখানে কোনো ট্যাক্সি নেই; এখন আর ট্যাক্সি

চলে না। আমার নারায়ণগঞ্জ যেতেই হবে, নারায়ণগঞ্জে আমার জরুরি কাজ রয়েছে, কাজটি আজ সন্ধ্যায়ই সম্পন্ন করতে হবে, নইলে আর করা হবে না; আমি একটি বেবি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে নামি। কিন্তু কোথায় যাবো? দেলোয়ার আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছিলো? আমার অপবিত্রতার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কোথায়? আমি জানি না। আমি একটি রিক্সা নিই, রিক্সাঅলা বারবার কোথায় যাবো জানতে চায়, আমি তাকে আমার গন্তব্য বলতে পারি না। আমি একেকটি অন্ধকার পথের মোড়ে এসে রিক্সাঅলাকে ঢুকতে বলি, তারপর আরো অন্ধকার একটি গলি খুঁজি, সেই গলি পাই না; তখন তাকে আমি অন্য দিকে যেতে বলি; আবার কোনো অন্ধকার পথের মোড়ে এসে তাকে ভেতরে ঢুকতে বলি, আরো অন্ধকার একটি গলি খুঁজি, সেই গলি পাই না; রিক্সাঅলাকে আবার চালাতে বলি। আমি শুধু তাকে চালাতে বলতে থাকি; কিন্তু কেউ সম্পূর্ণ গন্তব্যহীন হয়ে কিছু চালাতে পারে না; আমার রিক্সাঅলাও পারে না, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু আমার ক্লান্তি নেই। আমি চোখ বুজে আমার গন্তব্যটিকে দেখতে পাই,–একটি মেয়ে আমাকে টেনে তার ঘরে ঢুকিয়ে ফেলছে,–কিন্তু চোখ খুলে আর দেখতে পাই না।

রিক্সাঅলা রিক্সা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, ছার, আসলেই কন আপনে কই যাইবেন?

আমি বিব্রত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলি, তোমাকে বলা যাবে না।

রিক্সাঅলা হেসে ওঠে, বলে, এইডা ক্যামন কতা অইল, আমারে লইয়া যাইবেন আর আমারে বলন যাইব না।

আমি চুপ করে থাকি।

সে বলে, কিছু ভাইবেন না, ছার, কই যাইবেন কইয়া ফালান।

আমি বলি, একটি অন্ধকার রাস্তা, তারপর একটা অন্ধকার গলি।

রিক্সাঅলা বলে, অহন বুজছি ছার, আপনে পাড়ায় যাইবেন। তারপর হেসে বলে, ঢাকা থিকা আইছেন বুঝি।

আমি বলি, হ্যাঁ।

রিক্সাঅলা বলে, ছার, পাড়ায় যাইয়া কাম নাই; আপনারে আমি এক ভাল জায়গায় লইয়া যাইতে পারি।

আমি বলি, কোথায়?

রিক্সাঅলা বলে, আমারই বাসায়, ছার; খুব ভাল, ছার। আমার বউ আছে, আর আমার বইন আছে, যারে আপনার পছন্দ অয়।

রিক্সাঅলা তার বাসার দিকে রিক্সা চালাতে থাকে; ময়লা অন্ধকারের পর অন্ধকার ঠেলে সে আমাকে তার ময়লা অন্ধকার বাসায় নিয়ে যায়। ভেতরে ঢুকতে আমার ভয় হয়, তবু তার পেছনে পেছনে আমি ঢুকি; ঢুকতেই দুটি রোগা কুৎসিত নারী আমার সামনে এসে

দাঁড়ায়; আমার শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে; আমি সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখি। নারী দুটি ভেতরে মরচে-পড়া ধাতুর ঘর্ষণের মতো হেসে ওঠে।

রিক্সাঅলা মাফ চেয়ে বলে, আমার বউ আর বইনডা দেকতে ভাল না, ছার, কামে ভাল; এমন পাইবেন না, ছার।

মায়া হয় আমার লোকটির জন্যে, কিন্তু আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠে বমি করে দিতে চায়; আমি হাঁটতে শুরু করি, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমি কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারি না; আমি হাঁটতে থাকি। রিক্সাঅলা কি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? কিন্তু দেখি রিক্সাঅলা তার রিক্সা নিয়ে আমার পাশে এসে থেমেছে।

সে বলে, ওডেন ছার, আপনেরে দিয়া আহি।

আমি রিক্সায় উঠে বসি।

একদিন বিকেলে আমি ডলির টেলিফোন পেয়ে চমকে উঠি।

ডলি বলে, নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন।

আমি বলি, না, না; আমারই উচিত ছিলো আপনার খবর নেয়া।

ডলি বলে, আমি তো আপনার খবর নেয়ার জন্যে টেলিফোন করি নি।

আমি বলি, তা করেন নি ভালোই করেছেন; তবে আপনার খবর নেয়া সত্যিই আমার উচিত ছিলো।

ডলি বলে, সত্যি করে বলুন আপনি গাড়ি থেকে নেমেছিলেন কেনো?

আমি বলি, আমি জানি না।

ডলি বলে, আপনি জানেন।

আমি বলি, আমি কেনো গাড়ি থেকে নেমেছিলাম তা আপনাকে আমি কখনোই বলতে পারবো না।

ডলি বলে, আপনি না নামলে আমি নামতাম না।

আমি বলি, আমার অপরাধ হয়ে গেছে।

ডলি বলে, আমার অপরাধ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

আমি বিলি, আমি খুব দুঃখিত।

ডলি বলে, আমার এখন শোকের মধ্যে থাকার কথা, কিন্তু আমি রয়েছি। অপরাধবোধের মধ্যে।

আমি বলি, সব কিছু ভুলে যাওয়াই ভালো।

ডলি বলে, আপনি ভুলতে পারবেন?

আমি বলি, না।

ডলি বলে, তাহলে আমাকে ভুলতে বলছেন কেনো?

আমি বিব্রত হয়ে বলি, আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না বলে।

ডলি খিলখিল করে ওঠে, এমন মানুষ আমি দেখি নি।

ডলিদের বাসায় আমাকে যেতে হবে; ওর মা আমাকে দেখতে চান, অর্থাৎ আমার সাথে কথা বলতে চান; এবং ডলি চায় আমি যেনো শিগগিরই, আগামী কালই, ওদের বাসায় যাই। আমি কি ডলিদের বাসায় যাবো? ডলির মায়ের সাথে কথা বলতে?, ডলির মায়ের সাথে আমি কী কথা বলবো? তিনিও কি জানতে চাইবেন কেনো আমি গাড়ি থেকে নেমেছিলাম? জানতে চাইবেন ডলির সাথে আমার আগে পরিচয় ছিলো কি না? আমি কি ওদের বাসায় যেতে পারবো? মাংসমেশানো সুগন্ধে যদি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে? দেলোয়ারদের বাসায় আমি গিয়েছিলাম, কলিংবেল বাজাতে পারি নি; ডলিদের বাসায়

গিয়েও যদি অমন হয়? আমি কি ডলিদের বাসায় যাবো? আমার যেতে ইচ্ছে করে না; কিন্তু বাইরে বোরোনোর জন্যে যখন আমি চুল আঁচড়াচ্ছি তখন ইচ্ছে করে, এখনই আমি ডলিদের বাসায় যাই। ডলিকে কি দেখতে আমার ইচ্ছে করছে? একটা তীব্র সুগন্ধ কি পেতে ইচ্ছে করছে আমার? তার মুখটি আমি মনে করতে পারছি না। আমি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি, এবং ডলিদের দরোজায় গিয়ে ঘণ্টা বাজাই। ডলিই দরোজা খুলে দেয়, এবং আমাকে দেখে খুব বিস্মিত হয়।

ডলি বলে, আপনি এখনই আসবেন আমি ভাবি নি।

আমি বলি, নইলে আমার আর আসা হতো না।

ডলি বলে, কেনো?

আমি বলি, আমার এমনই মনে হচ্ছে।

ডলি একটু ভয় পেয়ে যায়, আমাকে সে বসতেও বলে না; কিন্তু আমি বসে পড়ি। আমি একটা তীব্র সুগন্ধ পেতে চাই, যা মাংসের ভেতর থেকে উঠে আসে, উঠে এসে শ্বাস রোধ করে; তবে আমি কোনো সুগন্ধ পাই না। ডলির মাংস কি আর সুগন্ধ উৎপাদন করে না, ডলির মাংস কি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে; দেলোয়ারের জন্যে? তার মাংস কি অপরাধবোধে ভুগছে?

ডলি বলে, আপনি আজই এসে পড়লেন? আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাকে দেখে বোধ হয় ডলির ভেতরে অপরাধবোধটা জেগে উঠছে।

আমি বলি, একটা তীব্র সুগন্ধ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে।

ডলি বলে, এখন সুগন্ধ পাচ্ছেন?

আমি বলি, না।

ডলি জিজ্ঞেস করে, আপনি যে-সুগন্ধটি পেয়েছিলেন, সেটা কেমন?

আমি বলি, মাংসের সাথে মেশানো এক রকম সুগন্ধ আর সুগন্ধের সাথে মেশানো এক রকম মাংস; আগে আমি কখনো পাই নি।

ডলি বলে, আপনি সুস্থ ছিলেন না।

আমি বলি, আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

ডলি বলে, এতে পুরুষদের শ্বাসরুদ্ধ হয় না।

ডলির কাছে পুরুষ বলতে কি শুধু দেলোয়ারই বোঝায়? না কি আমিও তার অন্তর্ভুক্ত? এতে দেলোয়ারের শ্বাসরুদ্ধ হতো না,–ডলি ভালোভাবেই জানে; দেলোয়ার হয়তো ওই

সুগন্ধে বেশি করে বেঁচে উঠতো–আমি ঠিক জানি না, কিন্তু ডলি জানে; আর আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছিলো। ডলি ভেতরে চলে যায়; একটু পর তার মা এলে অভ্যাসবশতই আমি দাঁড়িই; তিনি হাত ধরে আমাকে বসান। আমি যেমন অভ্যাসবশত তাঁকে দেখে দাঁড়িই, তিনি কি তেমনি অভ্যাসবশতই আমাকে হাত ধরে বসান? আমাকে দেখে তিনি সুখ পাচ্ছেন–আমি একটু কষ্ট পাই; দেলোয়ারের মা এভাবে আমার হাত ধরতেন না। অমনি নিজেকে আমার অপরাধী মনে হয়; আমি একজনের মায়ের কাছে অপরাধ করেছি বলে আরেকজনের মা সুখী হয়েছেন, যদিও তাকে সুখী করার কথা আমি কখনো ভাবি নি; এখনো ভাবতে পারছি না।

তিনি বলেন, ডলিকে দেলোয়ারদের বাসা থেকে একবারও কেউ দেখতে আসে নি।

আমি বলি, ডলি কি দেলোয়ারদের বাসায় গিয়েছিলো?

তিনি বলেন, না। আমি বারবার যেতে বলছি, ডলি যাচ্ছে না। মনে হয় কোনোদিন যাবে না। তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিলো।

আমি বলি, আমার অপরাধ হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, না, না; তোমার জন্যেই ডলি বেঁচে আছে।

আমি বলি, আমরা দুজনই অপরাধ করেছি।

তাঁর চোখে আমি কয়েক বিন্দু অশ্রু জমতে দেখি; তিনি চোখ মুছতে মুছতে ভেতরে চলে যান।

এবার আমি মাংসমেশানো সুগন্ধটি পেতে শুরু করি;–মহাজগতের কোথাও মাংসের ভেতরে তীব্র সুগন্ধ উৎপাদন শুরু হয়েছে; সে-সুগন্ধ বইতে শুরু করেছে আমাকে ঘিরেই। আজ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না; আমি আরো সুগন্ধের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠছি; আমার ভেতর, মাংসের ভেতর, আমার যে-আত্মা নেই, তারও ভেতর ওই সুগন্ধের জন্যে ক্ষুধা জেগে উঠছে।

ডলি ঢুকে জিজ্ঞেস করে, মাংসমেশানো সুগন্ধ কি পাচ্ছেন?

আমি বলি, পাচ্ছি।

ডলি বলে, আজ আপনার কেমন লাগছে?

আমি বলি, এ-সুগন্ধই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ডলি বলে, আপনার কাছে একটি কথা আমি জানতে চাই, আপনি কি আমাকে বলবেন?

আমি বলি, বলুন।

ডলি বলে, আপনি কি চান আমি সারাজীবন অপরাধবোধের মধ্যে থাকি?

আমি বলি, অপরাধবোধের মধ্যে থাকা খুব কষ্টকর।

ডলি বলে, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি; আমি হয়তো আত্মহত্যা করে বসবো।

আমি বলি, আত্মহত্যার কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে, তবে কখনো করে উঠতে পারবো না।

ডলি বলে, মা আমাকে সব সময় জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়, বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চান, তাতে আমার মনে হয় আমি অপরাধ করেছি।

আমি বলি, আমারও এমনই মনে হয়। আমি আছি বলে মা এতো সুখী বোধ করছে যে আমার মনে হয় আমি কোনো অপরাধ করেছি।

ডলি বলে, দেলোয়ার আমাকে অপরাধবোধের মধ্যে রেখে গেছে।

দেলোয়ার আমাকে অনেক বছর অপরাধবোধের মধ্যে রেখেছিলো। আমি বলি।

ডলি বলে, সেটা কী?

আপনাকে আমি তা বলতে পারবো না; এখন আমি সেই অপরাধবোধ কাটিয়ে উঠেছি। আমি বলি।

ডলি বলে, দেখে মনে হয় না আপনি কোনো অপরাধ করতে পারেন।

আমি বলি, আমি তো প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অপরাধ করি।

ডলি বলে, আপনি বাড়িয়ে বলছেন।

আমি বলি, এই যে আমি এখন মাংসমেশানো সুগন্ধ পাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে আমি কোনো অপরাধ করছি।

ডলি বলে, এই সুগন্ধেই আপনি সেদিন গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন?

আমি বলি, হ্যাঁ।

ডলি বলে, আজ কেমন লাগছে?

আমি বলি, বুক ভরে সুগন্ধ নিতে ইচ্ছে করছে।

ডলি বলে, আপনি অপরাধ করছেন।

আমি বলি, আমি সব সময়ই বোধ করি আমি অপরাধ করছি, কিন্তু বুঝে উঠতে পারি না কী অপরাধ করছি, কার কাছে অপরাধ করছি।

ডলি বলে, আপনার বন্ধুর কাছে।

আমি হাসি, আমার খারাপ লাগে না;–আমি প্রফুল্ল মনেই বেরিয়ে আসি; শহরটিকে আমার সুন্দর মনে হয়। অনেক বছর আমি প্রফুল্লতা–(শব্দটি ঠিক তো? অনেক বছর। আমি শব্দটি ব্যবহার করি নি)–বোধ করি নি; অনেক বছর আমার বুক ঝলমল করে ওঠে নি। কখন থেকে আমি প্রফুল্ল নই? যে-মেয়েটিকে দেখে আমি কেঁপে উঠতাম, তাকে কেরোলিনের শার্টপরা মামার সাথে বেবিতে কোথায় চলে যেতে দেখার পর থেকে? অদ্ভুত চুল আঁচড়ানো দুলাভাইয়ের সাথে বেবিতে করে কোথায় চলে যেতে দেখার পর থেকে? কেনো আমার প্রফুল্লতা নষ্ট হয়ে যায়? মেয়েটি কি আমাকে কথা দিয়েছিলো সে কারো সাথে বেরিয়ে যাবে না? আমি কি কোনোদিন তাকে বলেছি আপনি কারো সাথে বেবিতে উঠবেন না; আমার সাথে উঠবেন? আমার সাথে মেয়েটি উঠবে কেনো? আমার সাথে দূরে যাবে কেনো? আমি কি তখন থেকেই প্রফুল্লতা হারিয়ে ফেলি? নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পর থেকে? অপবিত্র হওয়ার পর থেকে? আমি আজ কেনো প্রফুল্ল হয়ে উঠছি?

বৃষ্টি নামছে–মসৃণ কোমল উষ্ণ-শীতল নিবিড় সিল্ক নামছে; অনেক বছর আমি বৃষ্টি দেখি নি, ছোঁয়া পাই নি। কেনো দেখি নি, ছোঁয়া পাই নি। বৃষ্টিকে কি আমি প্রতিপক্ষ ভেবেছি? বৃষ্টির ফোঁটা না ঠাণ্ডা আলোর টুকরো এগুলো? আমার মুখে আমার চোখে। আমার চুলে রাশিরাশি আলোর টুকরো জলের টুকরো হয়ে পড়ছে; আমার সঙ্গে শুধু বৃষ্টি আছে, আর কেউ নেই। আমি বৃষ্টির সাথে খেলছি, বৃষ্টি আমার সাথে খেলছে। রাস্তার পাশে কয়েকটি

গাছ আমার মতোই প্রফুল্ল, গাছগুলো গলে সবুজ রঙ ঝরে পড়ছে। সবুজ? না কালো? না লাল? না হলদে বুঝতে পারছি না। কতো বছর আমি গাছের নিচে দাঁড়াই নি। কেনো দাঁড়াই নি? আমি গাছগুলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াই, গাছের পাতা থেকে রঙ ঝরে পড়ুক, আমার চুলের ওপর পড়ুক, আমার মুখের ওপর পড়ুক। ডলিকে ডেকে আনবো? নারায়ণগঞ্জের মেয়েটিকে? যে-মেয়েটি বেবিতে চলে যেতো, তাকে। বৃষ্টি আরো প্রচণ্ড মধুর অন্তরঙ্গ নিবিড় নামছে। যতোই নামছে, আমি প্রফুল্ল হয়ে উঠছি, বৃষ্টি ততোই নামছে। পৃথিবীতে বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নেই। ওই দিক থেকে একটি মেয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে। সেও কি আমার মতোই প্রফুল্ল। তাকে ছুঁয়ে কি বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও প্রফুল্ল? মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। না কি আমিই মেয়েটির দিকে এগোতে থাকি? মেয়েটিকে দেখে আমি হাসি; হাত নাড়ি–মেয়েটিকে চেনা মনে হয়, যদিও আগে কখনো দেখি নি; আমাকেও তার চেনা মনে হয়, যদিও আগে কখনো দেখে নি; সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। না কি আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। মেয়েটি আমার হাত ধরে-না কি আমি তার হাত ধরি? হাত ধরাধরি করে আমরা রাস্তার মাঝে দিয়ে দৌড়োই; মেয়েটি খলখল করে হাসতে থাকে; আমরা দৌড়োত থাকি। একবার আমরা রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ি। তারপরই হাত ধরাধরি করে আমরা একটি ঝোঁপের ভেতর ঢুকি; আমরা যে ঝোঁপের ভেতরে ঢুকবো আমরা জানতাম না; আমি যখন জানতে পারি মেয়েটি তখন জানতো না, মেয়েটি যখন জানতে পারে আমি তখন জানতাম না; আমরা দুজনই এক সময় এক সাথে জানতে পারি। আমাদের জড়িয়ে ধরে আমরা ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ি; আমরা খলখল করে হেসে উঠি, আমাদের খলখল হাসি শুনে আমরা আরো খলখল করে হেসে উঠি;–এক সময় আমি সম্ভবত বলে উঠি, কতো লাগবে তোমার–তখন বৃষ্টি আরো কালো আরো শাদা আরো খলখল করে নামে; মেয়েটি আমাকে ঘাসের সাথে মিশিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে, এই বিষ্টিতে টাকা লাগবে না, এই বিষ্টিতে টাকা লাগবে না।

কয়েক দিন আগে এটা আমার চোখে পড়ে; পড়ার পর থেকেই আমি ভয় পাচ্ছি–ঠাণ্ডা একটা ভয়; ভয়টা শিরশির করে আমার রক্তের ভেতর দিয়ে বয় আমি তা টের পাই। সকালে আমি যতোই অফিসের দিকে এগোতে থাকি, ভয়টা বাড়তে থাকে; আমার ভয় করতে থাকে যে আজো যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠবো দারোয়ানটি আমাকে দেখে দাঁড়াবে না, সালাম দেবে না। আগে কি দারোয়ানটি আমাকে সালাম দিতো না? আমাকে দেখে পঁড়াতো না? যতো দূর মনে পড়ছে লোকটি আগে আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠতো, একটা বড়ো সালাম দিতে; আমার হাতের জিনিশপত্রগুলো নেয়ার জন্যে অনেকটা টানাটানিই করতো। না, আমি তাকে জিনিশপত্রগুলো বইতে দিই নি; আমার হাতে এমন কীই বা থাকে। আমি হাতে কোনো ব্যাগ বা বাক্স বইতে পছন্দ করি না; যাদের হাতে ওগুলো থাকে তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমার; তাদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি; আমার অমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে ভয় হয়। আমার হাতে যা থাকে সেগুলো আমি নিজেই বয়ে নিতে পারি; তার জন্যে দারোয়ানটির মতো একটা আস্ত লোক আমার দরকার নয়। কিন্তু লোকটি আজকাল আমাকে দেখতে পায় না কেনো? আমাকে কি আজকাল আগের থেকেও গুরুত্বহীন দেখায়?

আজকাল সে নিজেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; মুখের চারদিক ঢেকে দাড়ি রেখেছে, মাথায় একটা গোল টুপিও পরছে; লিকলিকে হলেও তাকে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হয়; এজন্যেই হয়তো দাঁড়ায় না, সালাম দেয় না। আমিই হয়তো কোনোদিন তাকে সালাম দিয়ে বসবো। লোকটি যদি না দাঁড়াতো, সালাম না দিতো, আমার যেতে আসতো না–আমি প্রত্যেক মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস করি, তাকে একটি চেয়ার এনে দিতেও মাঝেমাঝে ইচ্ছে হয় আমার; কিন্তু দেখছি আমার একটু যায় আসে, আমি যখন দালানে ঢুকি তখনই দেখতে পাই কেরামতুল্লাহ মিয়াও ঢুকছেন, আর তাকে দেখার আগেই দোরোয়ানটি দাঁড়িয়ে পড়ছে, উঠে বড়ো একটা

সালাম দিচ্ছে; কেরামতুল্লাহ মিয়ার। বাক্সটি হাতে নিয়ে তার পেছনে পেছনে চোদো জন্মের চাকরের মতো হাঁটছে। আমি অবশ্য এ-দৃশ্য দেখতে চাই না, দেখেও দেখি না, পেছনে তাকাই না; আমি চোখ আর কান বন্ধ করে ওপরে উঠতে থাকি; কিন্তু আমি সব কিছুই দেখতে আর শুনতে থাকি; আমার সব কিছুই ঠিক থাকে, তবে মনে হয় আমার কিছুই ঠিক নেই। আমি দারোয়ানটিকে 'তুমি'ই বলি; দেখেছি সে টুলে বসেই আমার কথার জবাব দেয় বা দেয় না; কিন্তু কেরামতুল্লাহ মিয়া তাকে 'তুই'ই বলেন। আমি শুনতে পাই কেরামতুল্লাহ মিয়া দারোয়ানটিকে বলছেন, অই হারামজাদা, তোর বউ ক্যামন আছে? দারোয়ানটি গলে পড়ছে, সে জানাচ্ছে তার বউ ভালোই আছে; কেরামতুল্লাহ মিয়া জানতে চাচ্ছেন, হারামজাদা, আবার বউর প্যাট বানাইছছ নি? শুনে বিনয়ে দারোয়ানটি সিঁড়িতে মিশে যাচ্ছে, লজ্জায় মুখ খুলতে পারছে না, শেষে বলছে, হ, গরিবগো সখআল্লাদের আর কী আছে, কেরামতুল্লাহ মিয়া বলছেন, তর বউরে একবার দেকতে যামু; দারোয়ানটি বলছে, আমার বউ আপনের কতা প্রত্যেক দিনই কয়। কেরামতুল্লাহ মিয়াকে দারোয়ানটি চোদ্দো পুরুষের প্রভু মনে করছে; যদিও কেরামতুল্লাহ মিয়া আমার বেশ নিচের পদেই আছেন; আমার মুখোমুখি হ'লে বড়ো একটা সালাম দেন; কিন্তু দারোয়ানটি কেনো আমাকে মূল্য দিচ্ছে না?

আমি কি আগামী সকালে গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ানটিকে বলবো, এই দাঁড়াও; আমাকে সালাম দাও? সেটা কি শোভন হবে? অন্যরা শুনলে কী ভাববে? ভাববে, না হাসবে? কিন্তু এ-দারোয়ানটিই তো বছরখানেক আগে আমার কাছে এসেছিলো; মেঝেতে মিশে গিয়ে কেরামতুল্লাহ মিয়ার নামে অভিযোগ করেছিলো যে কেরামতুল্লাহ মিয়া তাকে হারামজাদা, বাপের-জন্ম-না বলে গালি দেন, এবং ঘরে নিয়ে তাকে দিয়ে জুতো খোলান, এবং মাঝেমাঝে চড় কষিয়ে দেন, এবং তার ঘরে কোনো কোনো দিন মেয়েলোক এলে

কেরামতুল্লাহ মিয়া তাকে দরোজায় দাঁড় করিয়ে রাখেন-এসব অভিযোগ করেছিলো; এবং আমি ব্যাপারটি দেখবো বলে তাকে কথাও দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই দুপুরেই দেখি কেরামতুল্লাহ মিয়া তাকে নিয়ে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন; বলছেন, হারামজাদা, একশোটা ট্যাকা নে; ঈদের বকশিশ। দারোয়ানটি পা ছুঁয়ে সালাম করছে কেরামতুল্লাহ মিয়াকে, এবং বলছে, বউর একটা শাড়ি দরকার। কেরামতুল্লাহ মিয়া বলছেন, একদিন বউ দ্যাকতে লইয়া যাইচ, শাড়ি কিন্না দিমু। আমি আর ব্যাপারটি দেখি নি; দারোয়ানটিও আর চায় না যে আমি ব্যাপারটি দেখি।

কিন্তু দারোয়ানটি আমাকে দেখে দাঁড়ায় না বা সালাম দেয় না, তাতে আমার কী আসে যায়? তবে ভেতরে ভেতরে কেনো আসে যায়? আমি কি লোকটিকে এখান থেকে বদলি করিয়ে দেবো? ইচ্ছে করলে আমি পারি; তাকে যে দেখাশোনা করে, তাকে বললেই দু-একদিনের মধ্যে দারোয়ানটিকে অন্য কোথাও বদলি করে দেবে। কিন্তু আমি কি একটি দারোয়ানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছি? তাকে কি ভেতরে ভেতরে আমার সমান করে তুলেছি? আচ্ছা, দারোয়ানটি কি আমার চেয়ারে বসতে পারতো না? আমি বসতে পারতাম না তার টুলে? আমার খারাপ লাগতে থাকে; ইচ্ছে হয় একবার নিচে নেমে তার কাছে মাফ চেয়ে আসি। আমি নিচে নামি না, মনে মনে মাফ চাই। কিন্তু দুপুরে একবার আমার নিচে নামতে হয়; দেখি দারোয়ানটি টুলে বসে আছে, আমাকে দেখে দাঁড়াচ্ছে না, সালাম দিচ্ছে না।

আমি বলি, এই, দাঁড়া।

দারোয়ানটি লাফিয়ে উঠে সালাম দেয়। আমার বেশ ভালো লাগে।

সে বলে, কী, ছার?

আমি বলি, যা দেখে আয় আমার ঘরে তালা লাগানো হয়েছে কি না।

লোকটি দৌড়ে ওপরে উঠে যায়। আমি বুঝতে পারি না এখন কোথায় যাবো। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ওপরে উঠতে থাকি; দেখি দারোয়ানটি নিচে নেমে আসছে; আমাকে দেখেই একটা সালাম দেয়, আর কী যেনো বলে; আমি তার কথা শুনতে পাই না, শুনতে চাই না; আমি আমার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকি; আর দারোয়ানটি আমার পিছে পিছে আসতে থাকে। আমি উঠে আমার ঘর খুলে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিই; দারোয়ানটি আমার দরোজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি চাই সে আমাকে ডাকুক, ভেতরে ঢুকুক; কিন্তু সে হয়তো সাহস পায় না; আমিও তাকে ডাকি না। কেরামতুল্লাহ মিয়া বারান্দায় বেরিয়েছেন, তাঁর জুতোর শব্দেই আমি তা বুঝতে পারি; দারোয়ানটিকে দেখে তিনি বলেন, এই হারামজাদা, তুই অইখানে কী করছ? এই দিকে আয়। দারোয়ানটি তাকে জোরে একটা সালাম দেয়, আমি ঘরে বসে শুনতে পাই। কেরামতুল্লাহ মিয়া বেশ জোরে কথা বলেন, এটা একটি সুবিধা; তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন তা দূর থেকেও টের পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, আমার ঘরে আয়, পাও দুইটা টিপ্পা দে। তারা দুজনে ঘরে ঢুকছে আমি বুঝতে পারি। এখন দারোয়ানটি কেরামতুল্লাহ মিয়ার ঘরে আছে, আমি বেরোলে তার সাথে দেখা হবে না; দাঁড়িয়ে সে আমাকে সালাম দেবে না; আমার একটু স্বস্তি লাগে। আমি বসে থাকতে পারি না, উঠে দাঁড়াই; দাঁড়াতে গিয়ে একবার পা কাঁপে; কিন্তু আমাকে এখনই বেরোতে হবে, দারোয়ানটির মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারবো না, আমি আস্তে আমার ঘরের

দরোজা খুলি, মাথা নিচু করে তালা লাগানোর চেষ্টা করি, তালাটি প্রথমে লাগতে চায় না, আমি একটু ঘেমে উঠি;–তারপর সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি।

ডলি কয়েকবার ফোন করেছে, পায় নি; সে তার পরিচয়ও দেয় নি, দিতে তার ভালো লাগে নি; সে কোনো মেস্যাজ রাখে নি; মনে করেছে একবার না একবার পাবেই; এবার পেয়ে গেলো। ডলি আশা করেছিলো আমি তাকে টেলিফোন করবো, করি নি; করি নি বলে আমার স্বভাব সম্পর্কে-আমার সম্পর্কে-একটি সিদ্ধান্ত সে। নিয়েছে, যদিও সিদ্ধান্তটি আমাকে জানাবে না। আমি কি ডলির সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছি? কারো সম্পর্কে কোনো স্থির ধারণায় পৌঁছোনো আমার পক্ষে সম্ভব হয় না; কাউকে বছরের পর বছর ধরে দেখেও আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে সে এ-রকম, বা ও-রকম, বা সে-রকম; ডলির সম্পর্কে হয়তো কখনোই নিতে পারবো না। নেয়ার কথাই আমার মনে আসে নি। ডলি কি তার সাথে আমাকে সম্পর্কিত মনে করছে? সে কি মনে করছে আমরা দুজন একই অপরাধের শেকলে বাঁধা পড়ে গেছি, এবং আমাদের পরস্পর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার? নইলে আমাকে সে খুঁজবে কেনো; সারাজীবনে সে খোঁজার দরকার বোধ করে নি; তার জীবনে আমি ছিলামই না; এই সেদিন প্রবেশ করেছি। ওই ঘটনা না ঘটলে সে আমাকে খুঁজতো না; ঘটনাটি ডলিকে-আমাকে বেঁধে ফেলেছে? একসঙ্গে? ডলি আমাকে খুঁজবে, একবার না পেলে বারবার খুঁজবে? আমি ডলিকে খুঁজবো, একবার না পেলে একশোবার খুঁজবো? ডলি আমাকে বাসায় যেতে বলছে; আজই যেতে বলছে-বিকেলেই; আমার সাথে তার অনেক কথা আছে। তার কথা আর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত লাগছে আমার; এ-পর্যন্ত কেউ আমাকে বলে নি তার সাথে আমার অনেক কথা আছে। অনেক কথা কাকে বলে? আমি কখনো কারো সাথে অনেক কথা বলি নি, কখনো মনে হয় নি আমার কারো সাথে অনেক কথা আছে। অনেক কথা কি একা ডলিই বলবে, কি আমাকেও বলতে হবে?

অনেক কথা শোনার জন্যে, অনেক কথা বলার জন্যে আমি তো কোনো ব্যাকুলতা বোধ করছি না।

আমি বলি, আমার সাথে আপনার অনেক কথা আছে?

ডলি বলে, তাহলে কার সাথে?

আমি বলি, কথাগুলো আপনি ভেবে ঠিক করে রেখেছেন?

ডলি বলে, চমৎকার লোক তো আপনি! কথা কি সব আগে থেকে কেউ ঠিক করে মুখস্থ করে রাখে? কথা বলতে বলতেই তো কথা আসে।

আমি বলি, কথা বলতে বলতে কি ঠিক কথা আসে?

ডলি বলে, ঠিক কথা বলে কিছু নেই; একই কথা ঠিক হতে পারে আবার ঠিক নাও হতে পারে।

আমি বলি, আপনার সাথে তো আমার অনেক কথা নেই।

ওপাশে ডলি নিশ্চুপ হয়ে যায়, যেনো সারা শহর ভ'রে মৃত্যু নেমে এসেছে; টেলিফোন জুড়ে বয়ে চলে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা; তাতে আমার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মেরুশীতলতা থেকে মাথা জাগিয়ে ডলি বলে, আমার আছে।

আজই যাবো বলে ডলিকে আমি কথা দিই; তবে যতোই বিকেল হতে থাকে আমার ততোই ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সন্ধ্যায় আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না, বাইরে বেরোই। অনেক বছর পুরোনো বইয়ের দোকানে যাই না, পুরোনো নিউজপ্রিন্টের গন্ধ কি না; পুরোনো গন্ধের জন্যে আমার ভেতরটা ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। পুরোনো গন্ধ শুকতে শুকতে আমি সেদিকে এগোতে থাকি। পুরোনো বাঙলা বইয়ের গন্ধ আমার ভালো লাগে না, আমার পছন্দ ঝকঝকে নতুন বাঙলা বই; কিন্তু পুরোনো ইংরেজি বই, নিউজপ্রিন্টের, আমার ভালো লাগে; তার ভেতর থেকে একটা ধূসর গন্ধ ওঠে, বিদেশি গন্ধ ওঠে, আমার ভালো লাগে। রিক্সা থেকে নেমে আমি বই পর্যন্ত পৌঁছোতে পারি না; রেলিংয়ে বোম্বের একঝাক মেয়ের সারিসারি রঙিন ছবি আমাকে এলামেলো করে দেয়; আমার রক্ত থেকে নিউজপ্রিন্টের গন্ধ মুছে যায়, আমি রঙ আর রক্তের বিপর্যয়কর গন্ধ পেতে থাকি। আমার মগজে অজস্র রঙ হল্লা করে ঢুকতে থাকে, একটি মেয়ের নাভি দেখে আমি ওই অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই;–আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। একটু দূরেই রবীন্দ্রনাথ ঝুলছে, দেখে আমার হাসি পায়;–মহৎ হওয়ার কী কষ্ট; আমি এভাবে কখনো ঝুলবো না। নাভির মেয়েটির পাশে ওই ছবিটিকে অশ্লীল মনে হয়; আমি ওদিকে আর তাকাতে পারি না; কিন্তু নাভি আমাকে টানতে থাকে। নাভি, নাভি, নাভি। রবীন্দ্রনাথ যদি এখন এসে দাঁড়াতো কোন ছবিটি তাকে টানতো? কোন ছবিটি সে কিনতো? কোনো ছবি সে কিনতো না, সে মহাপুরুষ; আমি মহাপুরুষ নই, কখনো হবো না; পুরোনো বইয়ের দোকানে আমি এসেছি, কিন্তু বইয়ের কাছে যেতে পারছি না, আমাকে টেনে ধরে আছে ওই পাতালগভীর নাভিটি। কোনটি আমি কিনবো–নাভি না রবীন্দ্রনাথ? নাভি কেনা আমার ঠিক হবে না, কিনলে রবীন্দ্রনাথই কেনা উচিত। কিন্তু

নাভিই আমাকে টানছে, নাভিই ডাকছে আমাকে। আমি নাভিটি কিনে ফেলি; লোকটি সুন্দরভাবে গুটিয়ে নাভিটি আমার হাতে তুলে দেয়।

ছার, নাবিডা বড় সোন্দর, একনম্বর মাল, লোকটি হাসে আর বলে, শোঅনের ঘরে টাঙ্গাইয়েন। আমি একটা টাঙ্গাইছি।

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি।

ঘরে বউ থাকলে অসুবিদা অইব, লোকটি আবার হাসে।

আমি বলি, নেই।

তাইলে ত কতা নাই, লোকটি বলে, দিইনরাইত চাইয়া থাকতে পারবেন।

আমি আবার হাসি।

লোকটি বলে, নাবির নিচের দিকটা দ্যাহেন, চাইলেই পাগল অইয়া যাইতে ইচ্ছা অয়।

আমি নাভিটি নিয়ে হাঁটতে শুরু করি; নাভিটি ভয়ঙ্করভাবে নড়ে উঠছে, আমার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ে যাচ্ছে; আমি নাভিটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে হাঁটতে থাকি, এবং তার প্রচণ্ড আন্দোলন অনুভব করি। আমি কি নাভির নিচের দিকে চেয়েছি, আমি কি পাগল হয়ে গেছি? বোধ হয় নাভিটিকে আমি ধরে রাখতে পারবো না; নাভিটি আমার বাহু ভেঙে রাস্তায়

উপচে পড়তে চাচ্ছে; আমি জোরে নাভিটিকে ধরে রাখি, কিন্তু নাভিটি আমার বাহুর ভেতরে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত হতে থাকে। নারায়ণগঞ্জের মেয়েটি তো এমনভাবে দোলে নি; সে তো আমার বাহু ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায় নি;–সে বারবার চেষ্টা করছিলো যাতে আমি বোতাম খুলতে না পারি। সে আরো দশ টাকা চাচ্ছিলো; আমি তাকে আরেকটি দশ টাকা দিয়েছিলাম, তারপরও সে বোতাম খোলে নি; আমাকে খুলতে দেয় নি। এই মেয়েটির নাভির নিচে কী আছে? ভাবতে ভাবতে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে? আমি একটি রিক্সা নিই, ডলিদের বাড়ির দিকে যেতে থাকি। এই নাভি নিয়ে কি আমি ডলির সামনে দাঁড়াতে পারি? ডলি আমার হাতে এটা দেখে হয়তো মনে করবে আমি তার জন্যে কোনো উপহার এনেছি; যখন বুঝবে এটা উপহার নয়, তখন হয়তো জানতে চাইবে এটা কী? আমি কি বলতে পারবো আমার হাতে একটা নাভি রয়েছে? আমি বলতে পারবো না। কিন্তু কেনো বলতে পারবো না? ডলির কাছে কি আমি একটি মহাপুরুষ হতে চাই? বাঙালি, বিশেষ করে মেয়েরা, মহত্ত্বে খুব বিশ্বাস করে; তাই পুরুষগুলো মারাত্মক মহাপুরুষ হতে চায়; প্রতিটি বাঙালি পুরুষই একেকটি অবতার। আমি পুরুষ, ডলি নারী; ডলির কাছে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা আমার জাতিগত কর্তব্য। আমি কি ডলির কাছে অবতার হতে চাই? আমি কি চাই ডলি আমার চরিত্রের প্রশংসা করুক; আমার নির্মল চরিত্রে ডলি মুগ্ধ হোক? না, আমি তা চাই না; চরিত্রের থেকে নাভিটি আমাকে বেশি আকর্ষণ করছে। নাভিটিকে আমি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না।

ডলি বলে, আপনার আসতে এতো দেরি হলো।

ডলি খুব ক্লান্ত; দেলোয়ার যেদিন গাড়ি নিয়ে নদীতে পড়ে যায় সেদিনও ডলির স্বর এতো ক্লান্ত শোনায় নি।

আমি বলি, একটু বইয়ের দোকানে যেতে চেয়েছিলাম।

ডলি বলে, দেলোয়ারের জন্যেও কখনো আমি এতো অপেক্ষা করি নি।

শুনে আমার ভালো লাগে। আমি বলি, একটি ছবি কিনলাম।

ডলি বলে, আমার কথা না ভেবে আপনি ছবি কিনতে গেলেন?

আমি বলি, আপনার কথা আমি সারাক্ষণ ভেবেছি।

ডলি বলে, একেই বলে সারাক্ষণ ভাবা?

আমি বলি, আমি এভাবেই ভাবি।

ডলি আমার মুখের দিকে বরফের মতো তাকিয়ে থাকে; এতোক্ষণ ধরে কেউ আমার মুখের দিকে আগে কখনো তাকায় নি। আমার মুখের দাগগুলো নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে ডলির; তবে মুখের দাগ সম্পর্কে আমার অস্বস্তিগুলো অনেক আগেই কেটে গেছে ব'লে আমি অস্বস্তি বোধ করি না।

আমি বলি, আপনি কি আমার মুখের দাগগুলো ভালোভাবে দেখছেন?

ডলি চমকে উঠে বলে, কী বললেন?

আমি বলি, আপনি বোধ হয় আমার মুখের দাগগুলো দেখছিলেন।

ডলি বলে, না তো; আপনার মুখে দাগ আছে না কি?

আমি বলি, অনেকগুলো ছিলো।

ডলি বলে, ওসব থাক; আপনি কী ছবি কিনলেন দেখি।

আমি সামনের নিচু টেবিলের ওপর নাভিটিকে মেলে ধরি, ডলি চিৎকার করে। উঠতে গিয়ে থেমে যায়; বসা থেকে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়ে; চোখ বন্ধ করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করতে পারে না; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি বিব্রত বোধ করি না; আমি ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকি।

ডলি বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি কোনো ভালো ছবি কিনেছেন।

আমি বলি, ছবিটি ভালো।

ডলি বলে, এটা আপনার কাছে ভালো ছবি?

আমি বলি, হ্যাঁ, এটা ভালো ছবি; ছবির নাভিটি।

ডলি বলে, আপনি এমন মানুষ?

আমি বলি, আপনাদের দেয়ালের ওই ছবিটির থেকে অনেক ভালো ছবি।

ডলি বলে, রবীন্দ্রনাথের ছবির থেকে এটা ভালো?

আমি বলি, হ্যাঁ।

ডলি বলে, কেনো?

আমি বলি, ওই ছবিটির দিকে তাকানো আর না তাকানো সমান।

ডলি বলে, আপনি একথা বলছেন?

আমি বলি, আর এ-ছবিটি ভরে আছে সৌন্দর্য;–অসম্ভব আগুন, ঠাণ্ডা, কোমল, রঙিন; দেখার পর কেউ আর আগের মতো থাকে না।

আমি ডলিকে অনুরোধ করি, আপনি ছবিটির দিকে আরেকবার তাকান।

ডলি আমার কথা রাখে, ছবিটির দিকে চোখ খুলে তাকায়।

আমি বলি, নাভিটি।

ডলি কোনো কথা বলে না; আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; এমনভাবে তাকায় আমার মনে হয় আরো অনেকক্ষণ ডলি তাকিয়ে থাকুক; আমার মুখের দাগগুলো তাহলে মুছে যাবে।

আমি আবার বলি, নাভিটি।

ডলি বলে, সুন্দর, সুন্দর; তবে অশ্লীল।

আমি বলি, আপনিও তাহলে সুন্দর, সুন্দর; তবে অশ্লীল।

ডলি বলে, আমরা দুজন অপরাধ করেছি, এমন আলোচনা আমাদের সাজে না।

আমি বলি, অপরাধীরা যে-কোনো আলোচনা করতে পারে।

ডলি বলে, আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমি অশ্লীল?

আমি বলি, জানেন, কয়েক দিন আগে আমি ফেরিঘাটে গিয়েছিলাম।

আমার কথা শুনে ডলি চমকে ওঠে; তারপর ডলিকে অসহায় দেখায়; তারপর ডলিকে রক্তশূন্য দেখায়; তারপর ডলিকে সুন্দর দেখায়; তারপর ডলিকে অপরাধী দেখায়। নিজেকে আমার হাল্কা লাগে; ডলিকে এমন অসহায় রক্তশূন্য সুন্দর অপরাধী দেখায় যে আমার

ভেতরের অপরাধবোধটা অনেকটা কেটে যায়, আমি নাভিটির দিকে তাকিয়ে থাকি। তাহলে আমার থেকে ডলি বেশি অপরাধ করেছে; আমার অপরাধ ডলির অপরাধের থেকে কম। কিন্তু ফেরিঘাটে আমি কেনো গিয়েছিলাম? আমার কোনো কাজ ছিলো না বলে? আমার সময় কাটছিলো না বলে? নদীর দৃশ্য দেখতে ইচ্ছে করছিলো বলে? আমি ভুল করে একটা বাসে চেপে বসেছিলাম বলে? আমার মনে পড়ছে আমি একটা বাসে চেপে বসেছিলাম; বাসে আমি অনেক ধরনের গন্ধ। পেয়েছি, কিন্তু কোনো মাংসমেশানো তীব্র সুগন্ধ পাই নি। মাংসমেশানো তীব্র সুগন্ধ পাই নি বলে আমার দম আটকে আসে নি, বাস থেকে আমার নামতে ইচ্ছে করে নি; বাসটি যখন ফেরিতে উঠছিলো, তখনো আমি নামি নি; নামার কথাই আমার মনে আসে নি। একটা ভয়ঙ্কর শব্দ করে বাসটি ফেরিতে উঠেছিলো, উঠতে গিয়ে একবার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো; তাতে আমার অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো; বাসের কেউ ভয় পায় নি-একটি লোক চিনেবাদাম খাচ্ছিলো; কেউ বাস থেকে নামে নি, আমিও নামি নি। বাসটির ইঞ্জিন আবার চালু হলে গোঁ গোঁ করে বাসটি ফেরির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; আমি আমার সামনে পানি দেখে হেসে উঠি। পেছনে একটা ট্রাক এসে থামে, এতো মসৃণভাবে থামে যে মনে হয় কেউ শেলাইকল বন্ধ করলো। আমি বাস থেকে নামি নি, নামতে আমার ইচ্ছে হয় নি। ফেরি ছেড়ে দিলে আমার আরো বেশি ভালো লাগে; নদীটিকে আমার অচেনা মনে হয়। এই নদী আমি আগে দেখি নি? ফেরিটি নদীর অন্য পারে ভিড়তেই আমি বাস থেকে নেমে আসি; আমার মনে পড়ে আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই। ফেরিতে নেমে আমি ঝাল মুড়ি কিনি, খেতে আমার ভালো লাগে; অনেক দিন আমি ঝাল মুড়ি খাই নি, খাওয়ার কথাও মনে হয় নি। আমি কেনো এখানে এলাম একবার ভাবতে চেষ্টা করি। কার যেনো মুখ আমি মনে করার চেষ্টা করি, পরে মনে হয় দেলোয়ারের মুখ মনে করার চেষ্টা করছি; কিন্তু মনে করতে পারি না। এই নদীর তলদেশে যদি কখনো আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমার খারাপ লাগবে না; আমার হয়তো বেশি করে ঘুম পাবে; যে-ঘুম

আমি ঘুমোতে চেয়েছি, কিন্তু পারি নি, সে ঘুম আমি ঘুমোতে পারবো। আমার ওপর দিয়ে ঘুমের স্রোত বয়ে যাবে। ফেরিটি আবার এপারে ফিরে আসে; আমি বাস থেকে নেমে একটি বেবি নিই; পোন্টুন বা নদীর পারে আমার দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না।

ডলি বলে, আমাকে নিয়ে গেলেন না কেনো?

আমি বলি, আপনার কথা আমার মনে পড়ে নি।

ডলি বলে, ফেরিঘাটে গেলেন অথচ আমার কথা মনে পড়লো না?

আমি বলি, আপনার কথা আমি সব সময় ভাবি না।

ডলি বলে, অথচ আপনার কথা আমি সব সময় ভাবি, দেলোয়ারের থেকে বেশি ভাবি; ফেরিঘাটের কথা মনে হলেই প্রথম আপনার কথা মনে পড়ে, তারপর দেলোয়ারের কথা।

আমি বলি, কেনো?

ডলি বলে, আপনার জন্যেই আমি আজ বেঁচে আছি। আপনার জন্যেই আমি অপরাধবোধের মধ্যে আছি।

আমি বলি, আমি আপনার বেঁচে থাকা আর অপরাধবোধ?

ডলি বলে, দুটোই।

এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠে; ডলি গিয়ে দরোজা খুলে দেয়। ডলির সাথে ঢোকেন দেলোয়ারের আব্বা; আমি উঠে সালাম দিই।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ-বাসায় মাঝেমাঝেই আসো?

আমি বলি, জি।

তিনি বলেন, কিন্তু তুমি তো আমাদের বাসায় একবারও গেলে না।

আমি বলি, না।

তিনি বলেন, তোমাদের আগে থেকেই পরিচয় ছিলো?

আমি বলি, হ্যাঁ।

তিনি বলেন, দেলোয়ার না থাকায় তোমরা সুখীই হয়েছো।

আমি কোনো কথা বলি না, ডলি কোনো কথা বলে না। দেলোয়ারের আব্বা উঠে দাঁড়ান, দরোজার দিকে হাঁটতে থাকেন; দরোজা খুলে বেরিয়ে যান। ডলি কোনো কথা বলে না, আমি কোনো কথা বলি না।

আমার আলমারির ড্রয়ারে একটি ফাইল পড়ে আছে; অত্যন্ত জরুরি–সচিব আর যুগ্মসচিব চাচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী এখনো চান নি; যুগ্মসচিব আভাস দিয়েছেন তিনিই আসলে এটা চান; আমি ড্রয়ারে ফেলে রেখেছি, ফাইলটির কথা মনে না পড়লেই আমি ভালো থাকি। কিন্তু কেনো ভালো থাকি? আমি বুঝতে পারি না। বিপ্লবটিপ্লব করে ফেলছি, তা নয়; একটা নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি, তাও নয়; তবে ওটির কথা মনে হ'লে আমার ভালো লাগে না। আমার কাছে একটি বিশেষ নোট চাওয়া হচ্ছে, আমার তা লিখতে ইচ্ছে করছে না; প্রত্যেক দিনই চাপ পড়ছে, আমাকে ওই নোট লিখতে হবে। আমি আমলা; আমি শিখেছি বস কখনো ভুল করতে পারেন না; আমার টেবিলেই, ইংরেজিতে, একটি শ্লোক বাঁধানো রয়েছে বস কখনো ভুল করতে পারেন না; যদি সন্দেহ হয় তুমি অপর পিঠ দেখো; অপর পিঠে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে। বস কখনো ভুল করতে পারেন না। এ-শ্লোকের পবিত্রতায় আমার কোনো সন্দেহ নেই; এ-শ্লোক আমি মানি, প্রথম কলমার মতো এটি আমি মেনে চলবো সারাজীবন; কিন্তু আমি ওই নোট আমি লিখতে পারছি না। আমলা হওয়া আমার ঠিক হয় নি? আমার উচিত ছিলো রাড়িখাল ভাগ্যকূল কাজিরপাগলা কণকসার হাই ইস্কুলে মাস্টার হওয়া। আমি নোট লিখছি না এটা কোনো মহৎ কাজ নয়; কিন্তু আমি লিখতে পারছি না। সৌদিতে আট হাজার শ্রমিক পাঠানোর ফাইলে আমাকে এক পারা নোট লিখতে হবে; আমি না লিখলেও চলবে, শুধু আমাকে একটা সই দিতে হবে। এটা এমন কী কঠিন কাজ। মাঝেমাঝে ইচ্ছে হয় একটা প্যারা লিখে ফেলি, কী লিখবো তার ভাষাটাও আমার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে; কিন্তু লিখতে পারছি না। ওই ফাইলের কথা মনে হ'লে আমি মরুভূমি দেখতে পাই, মরুভূমিতে নিজেকে ঝাড়ুদার হিশেবে দেখতে পাই; আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। মরুভূমি আমার ভালো লাগে না। এর চেয়ে আমি পুকুরে পুকুরে পুঁটিমাছ ধরে বেচবো। আধুনিক দাসব্যবসার ফাইল এটা; এ-দাসব্যবসার ফাইল

আমার খুলতে ইচ্ছে করে না, সই দিতে ইচ্ছে করে না। সবুজ গাছপালা আর কালো মেঘের ছেলেগুলোকে, আমার মনে হয়, আমি দাস করে পাঠানোর নোট লিখছি। মনে হয় নিজেকেই দাস করে পাঠাচ্ছি; নতুন হাবশি হয়ে উঠছি।

হাবশি হওয়ার জন্যে, আমি জানি, সবাই পাগল। পুকুরে পুকুরে কেউ পুঁটিমাছ ধরতে চায় না, পুকুরই নেই-পুঁটিমাছ কোথায়; সবাই হাবশি হতে চায়। নতুন একটা হাবশি জাতি হয়ে উঠছি আমরা–চমৎকার। তবু ওরা, এই আট হাজার, ঝাড়ুদার হবে; কিছু দিন পর হয়তো আমাকে পঞ্চাশ হাজার খোঁজা পাঠানোর নোট লিখতে হবে। আমাদের খোঁজারাই শ্রেষ্ঠ, ওদের সব কিছু উপড়ে ফেলা হয়; তারপর শেলাই করে দেয়া হয়; আপনারা আমাদের দেশ থেকে খোঁজা নিন, এমন কোনো আবেদন লিখতে হবে হয়তো আমাকেই আট হাজার হাবশি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেয়াই তো ভালো; যেতে না পারলে ওরা ডাকাতি করবে, যারা চমৎকার আছি তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। ওদের হাবশি করে তোলাই ভালো। হাবশি হলেও বেশ বেতন পাবে,-আমার তিনগুণ; ফিরে ভালো বিয়ে করতে পারবে, অষ্টম শ্রেণী ফেলকরা ছেলেগুলো দেশে ফিরে বিএ পাশ মেয়ে বিয়ে করতে পারবে। সমাজের উন্নতি হবে, শিক্ষিত মায়েদের পেট থেকে শিক্ষিত সন্তান বেরোবে; সন্তানগুলোর গায়ে লেখা থাকবে না বাপ অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করেছিলো; লেখা থাকবে না ওরা মেথরের সন্তান। ওরা হাবশি হোক, মেথর হোক আমার কিছু যায় আসে না; কিন্তু আমার কাছ থেকে যে-নোট চাওয়া হচ্ছে তা আমার লিখতে ইচ্ছে করছে না। ওখান থেকে যে-প্রস্তাব এসেছে, তা আমার খুব খারাপ লাগছে না; বিমান ভাড়া দিয়ে ওরা নেবে, তিন বছর পর ফেরার সময় বিমান ভাড়া দেবে, আর যে-বেতন দেবে সব ব্যয়ের পরও তিরিশ হাজারের মতো থাকবে। খুব খারাপ মনে হচ্ছে না আমারা কাগজপত্র দেখেই চুক্তিটা করে ফেলতে পারি; বা বেতন বাড়ানোর জন্যে একটা দাবি পাঠাতে পারি।

আমার কাছে চাওয়া হচ্ছে অন্য ধরনের নোট; লিখতে হবে ব্যাপারটি দেখার জন্যে কমপক্ষে চার সদস্যের একটি উচ্চপর্যবেক্ষক দল ওখানে যাওয়া দরকার; কেননা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আট হাজার লোকের ব্যাপার; তাই সব কিছু ভালোভাবে দেখেই চুক্তি করা উচিত; নইলে মন্ত্রণালয় আর রাষ্ট্র অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। এটা লেখার কোনো ইচ্ছে আমার হচ্ছে না। মন্ত্রণালয় আর রাষ্ট্র অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়বে? অস্বস্তি কাকে বলে? রাষ্ট্র আর মন্ত্রণালয় অস্বস্তিকে কবে পাত্তা দিয়েছে। আমার হাসি পায়; আমি আমলা, আমার কাজ নিজের প্রয়োজনে দুঃস্বপ্ন বানানো; দুঃস্বপ্নটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। আমি তা পারছি না। কিন্তু আজই ফাইলটা যুগ্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এগারোটার মধ্যে না পৌঁছোলে সচিব আমাকে ডাকবেন–এমন একটা আভাস সকালেই পেয়েছি। আমি নোট লিখছি না; বরং আমার ভিখিরিনিটিকে মনে পড়ছে; লিকলিকে কুৎসিত মেয়েটিকে মনে পড়ছে। লিকলিকে কুৎসিত মেয়েটি পিঠে প্রায়-মরা একটা বাচ্চা নিয়ে আমার সামনে হাত পেতেছিলো; মনে হয় এখনো হাত পেতে আছে। আমি চারদিকটা আরেকবার দেখে নিই। না, এখানে কোনো আবর্জনা নেই; কোনো নোংরা হাত নেই। মেয়েটিকে দেখেই আমার ঘেন্না লেগেছিলো, তারচেয়ে বেশি ঘেন্না লেগেছিলো পিঠের প্রায়-মরা বাচ্চাটিকে দেখে। অমন বাচ্চা আমি দেখতে পারি না; বাচ্চাঅলা ভিখিরিনিদের আমি কখনো ভিক্ষা দিই না, বুড়ো ভিখিরিগুলোকেও দিই না; আমার ঘেন্না লাগে।

ভিখিরিনিটি হাত পেতে বাচ্চাটার জন্যে একটা টাকা চায়। আমি এড়িয়ে যেতে পারতাম; এড়াই না, দাঁড়াই; জিজ্ঞেস করি, বাচ্চাটা কার?

ভিখিরিনিটি বলে, আমার।

আমি বলি, ওর বাপ কোথায়?

ভিখিরিনিটি বলে, মইর্‌রা গ্যাছে।

আমি বলি, সত্য করে বলল ওর বাপ কে?

মেয়েটি ভয় পেয়ে যায়; বলে, ছার, রাস্তায় হুই, বচ্ছর বচ্ছর বাচ্চা হয়; বাপের খবর রাকতে পারি না।

সচিব আমাকে সালাম দিয়েছেন;–সালাম শব্দটি শুনলে আমার হাসি পায়। প্রথম যোগ দেয়ার পর পিয়ন আমাকে এসে বলেছিলো, ছার আপনেরে ছালাম দিছে। আমি ব্যাপারটি বুঝি নি, বলেছিলাম, স্যারকে গিয়ে বলো অলাইকুম সালাম। পিয়ন হেসে বলেছিলো, এইডা না, ছার আপনেরে ডাকছেন। আজো আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি হেসে উঠি।

সচিব আমাকে বলেন, তুমি ফাইলটা ছাড়ছো না কেনো?

আমি একটু সময় নিই, কী বলবো বুঝতে পারি না; তারপর বলি, স্যার, আমাকে আপনি বলেই সম্বোধন করবেন।

সচিব চমকে ওঠেন; এটা তিনি আশা করেন নি। তিনি বলেন, তুমি বেয়াদবি করছো, খুব বিপদে পড়বে।

আমি বলি, আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার; আপনাকে অপমান করার জন্যে কথাটি বলি নি, বিপদেও আমি পড়তে চাই না; তবে অপরিচিত কেউ আমাকে তুমি বললে আমার ভালো লাগে না।

তিনি আরো ক্ষেপে উঠে চিৎকার করে বলেন, আমি তোমার অপরিচিত নই।

আমি বলি, আপনাকে আমি চিনি, আপনার সব সংবাদ জানি, আপনার বাল্যকাল থেকে গতকালের সব গল্প আমার জানা; আপনার তৃতীয় স্ত্রীকেও আমি দেখেছি; তবু আপনাকে আমার অপরিচিত মনে হয়।

তিনি বলেন, তুমি দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে কথা বলো; আমার সামনে তোমার বসার অধিকার নেই।

আমি দাঁড়াই, দাঁড়াতে আমার খারাপ লাগে না; বসেই আমার খারাপ লাগছিলো, দাঁড়িয়ে আমার ভালো লাগে; সারাদিন আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো।

তিনি বলেন, নোটটা আজই লিখে দাও।

আমি বলি, স্যার, আমি লিখতে পারছি না।

তিনি বলেন, তোমাকে কথা দিচ্ছি চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিশেবে তোমার নাম আমি রাখবো।

আমি বলি, আমার নাম রাখবেন না, স্যার; সদস্য হতে আমার ভালো লাগবে না।

তিনি বলেন, তুমি বোধ হয় আরো বেশি চাও; ঠিক আছে, যাতে জন পঞ্চাশেক লোক তুমিও পাঠাতে পারো, তাও আমি দেখবো;–তোমার অন্তত পাঁচ লাখ থাকবে।

আমি বলি, স্যার, আমি সদস্য হতে চাই না, লোকও পাঠাতে চাই না।

তিনি বলেন, কেনো?

আমি বলি, আমি নোটটি লিখতে পারবো কি না জানি না; তারপর নোট লিখলেও মরুভূমিতে আমি যেতে পারবো না।

তিনি বলেন, কেনো?

আমি কোনো জবাব দিই না।

তিনি বলেন, ওমরাটাও তোমার করা হয়ে যাবে, বেশ কিছু ডলারও থাকবে।

আমি বলি, হজ করতে আমার ভালো লাগবে না।

সচিব লাফিয়ে ওঠেন, চিৎকার করেন, তুমি কি মুসলমান নও?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না; এ-প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমার জানা নেই বলে মনে হয়। আমি বুঝতে পারি আমার সাথে তার আর কোনো কথা নেই। ফিরে এসে আমি নোটটা লিখে ফেলি, লিখতে আমার খারাপ লাগে না; লেখার পর দেখতে পাই বেশ গুছিয়ে লিখেছি; আমি কয়েকবার পড়ি নোটটা, পড়তে পড়তে আমার মুখস্থ হয়ে যায়।

ছুটির দিন; ঘুম থেকে জেগে দেখি সিগারেট নেই। চায়ের সাথে সিগারেট না খেলে আমার মনেই হয় না চা খাচ্ছি; মনেই হয় না ভোর হয়েছে; মনেই হয় না বেঁচে আছি; মনেই হয় না আমার বেঁচে থাকা দরকার। সিগারেট না থাকলে আমি কাজের মেয়েটিকে ডাকি, আজো ডাকছি; মেয়েটি আমার ডাকে ভোরের আলোর মতো ছুটে আসে, আজ আসছে না। মেয়েটির একটা রোগ আছে, মাঝেমাঝে পেটের ব্যথায় কাতরাতে থাকে–দেখলে মনে হয় মেয়েটি খুব কষ্ট পাচ্ছে; আমি একদিন পেট টিপেও দিয়েছিলাম; মেয়েটি আমার হাত তার পেটে শক্ত করে চেপে ধরেছিলো; আজ হয়তো তাই হয়েছে। আগেই বোঝা উচিত ছিলো মেয়েটির কিছু হয়েছে; চা চাওয়ার পর মেয়েটি চা আনে নি, মা-ই চা নিয়ে এসেছে; তখনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। ওই হিতৈষী লোকটির পরামর্শ শোনা উচিত হয় নি আমার; লোকটি সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো, ছেড়ে দেয়ার পর তার কী কী উন্নতি হয়েছে তাও বুঝিয়ে বলেছিলো; আর ছেড়ে দেয়ার একটা উপায়ও দেখিয়ে দিয়েছিলো। ছেড়ে দেয়ার উপায় হচ্ছে পাঁচটি পাঁচটি করে সিগারেট কেনা; পুরো প্যাকেট না কেনা। আমার অভ্যাস একসাথে দশ প্যাকেট কেনা; সেখান থেকে পাঁচটায় এসেই বিপদে পড়েছি, আধঘণ্টা পরপরই সিগারেট শেষ হয়ে যায়, আর মেয়েটিকে আমি দিনে পাঁচসাতবার

ডাকাডাকি করি। প্যাকেটে পাঁচটা সিগারেট দেখলেই আমার ভয় লাগে, মনে হয় পৃথিবীতে সিগারেট নেই; আমার সিগারেট খাওয়ার তৃষ্ণাটা তখন তীব্র হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সব সিগারেট একসাথে টানতে ইচ্ছে করে, আনার সাথে সাথেই আমি সিগারেটগুলো শেষ করে ফেলি; আবার মেয়েটিকে ডাকতে থাকি। মেয়েটিও চমৎকার, টাকা নিয়ে নাচতে নাচতে সিগারেট আনতে চলে যায়। আমার সিগারেট দরকার; তাই কি ও এমন নাচতে নাচতে যায়? না কি মুদিদোকানটিতে যেতে পারছে বলেই ওর পায়ে নাচ আসে? কে ওকে নাচায়? নাচুক ও; কিন্তু আজ আসছে না।

মা এসে জানতে চায়, মেয়েটিকে ডাকছো কেনো?

আমি বলি, সিগারেট আনতে হবে।

মা বলে, ওর পেট ব্যথা করছে।

সিগারেট ছাড়াই আমাকে নিরর্থক বেঁচে থাকতে হবে; আমি নিজে এখন সিগারেট কিনতে যেতে পারবো না; অর্থাৎ আমাকে বেঁচে থাকতে হবে কিন্তু আমি বেঁচে থাকবো না। আমি উঠে বাথরুমে যাই; সেখান থেকে বাবা ও মা কথা বলছেন শুনতে পাই, শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বাবা বলছেন, আনিস মেয়েটিকে ডাকছে কেনো?

মা বলছে, সিগারেট আনার জন্যে।

বাবা বলছেন, আমাকে টাকাটা এনে দাও না, আমি সিগারেট এনে দিই।

বাবার কথা শুনে আমার সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কাঁপতে থাকে; আমি আর বাথরুম থেকে বেরোতে পারবো না। অবসর নেয়ার পর থেকেই বাবা কেমন যেনো হয়ে যাচ্ছেন, শিশু হয়ে যাচ্ছেন; সবাইকে ভয় পাচ্ছেন। আগে সবাই তার ভয়ে কাঁপতাম, মনে মনে এখনো আমি কাঁপি; কিন্তু আজকাল তিনিই সবার ভয়ে কাঁপছেন। তাঁকে আগে কখনো নামাজ পড়তে দেখি নি, আজকাল মসজিদেও যাচ্ছেন; এবং দাড়ি রেখেছেন, মুখ বেশ ঢেকে গেছে কয়েক মাসে। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম দাড়ির কোনো উপকার পাচ্ছেন কি না; জবাব দিয়েছিলেন যে বেশ পাচ্ছেন, লোকজন নিয়মিত সালাম দিচ্ছে, আগে এতো সালাম পেতেন না; আর সালাম পেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আমি বলেছিলাম, আমিও দাড়িটা রেখে ফেলবো ভাবছি, ধার্মিক হতে হলে সময় থাকেতই হওয়া ভালো, বুড়ো বয়সে ধার্মিক হওয়া খুব সন্দেহজনক; শুনে তিনি হাহাকার করে উঠেছিলেন; মার কাছে কয়েক দিন বারবার জানতে চেয়েছিলেন সত্যিই আমি দাড়ি রাখতে যাচ্ছি কি না, ধার্মিক হতে যাচ্ছি কি না; মাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে আমি দাড়ি না রাখি। আমি প্রথম যখন সিগারেট ধরেছিলাম তিনি জানতে পারেন নি, জানার পর বেশ বড়ো একটা শাস্তি দিয়েছিলেন; দু-দিন একটি ঘরে আটকে রেখেছিলেন। আমি আজো সিগারেটে প্রতিটি টানের সাথে দু-দিন করে একটি ঘরে আটকে থাকি।

বাথরুম থেকে বেরোনোর পর মা বলে, টাকা দাও, সিগারেট আনিয়ে দিই।

আমি বলি, না, লাগবে না।

দুপুরে বাবা আমার ঘরে আসেন, আমি অবাক হই; আমার ঘরে তিনি অনেক বছর আসেন না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় খুবই ভয়ে আছেন, সাহস করে এ-ঘরে ঢুকেছেন; বিনা অনুমতিতে ঢোকার জন্যে তিনি ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছেন না। তাই তাড়াতাড়ি আমার বিছানার ওপর বসে পড়েন। চেয়ারও ছিলো দুটি; কিন্তু চেয়ারে তিনি বসলেন না, এটাই প্রথম আমার চোখে পড়লো;–আমি বাবার দিকে না তাকিয়ে চেয়ার দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি বলি, আমাকে ডাকলেই পারতেন।

তিনি বলেন, না, না; একটা কথা বলতে এলাম।

আমি বলি, আপনি কেমন আছেন?

তিনি বলেন, ভালোই তো; তবে তোমার সাথে একটা কথা আছে।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তিনি বলেন, আমার বেশ কিছু টাকা দরকার।

টাকার কথা শুনে আমার ভেতরটা শুকিয়ে যায়; বেশ কেনো, কিছু টাকাও আমি জমাতে পারি নি। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না এমনভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তিনি বলেন, চল্লিশ হাজার টাকার মতো দরকার, খুবই দরকার।

আমি বলি, এতো টাকা তো আমার নেই।

তিনি বলেন, নেই, তুমি সত্যি বলছো?

আমি বলি, সত্যি বলাই তো আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, কিন্তু তুমি যে-চাকরি করো, তাতে তো টাকা থাকার কথা।

আমি বলি, আমার বেতন কতো তা তো আপনি জানেন।

তিনি বলেন, তোমার চাকরিতে বেতন দিয়ে তো কেউ চলে না।

আমি বলি, আপনি তো ছেলেবেলায় আমাকে সৎ হওয়ার কথা বলতেন।

বাবা খুব বিব্রত বোধ করেন, মাথা নিচু করে বসে থাকেন; তিনি উঠে যেতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উঠতে পারেন না; তিনি বসে থাকতে চান, কিন্তু বসে থাকতে পারেন না।

ডলি আমার অফিসে

ডলি আমার অফিসে এসে উঠবে কখনো ভাবি নি; তাকে আমার কক্ষে ঢুকতে দেখে আমি কেঁপে উঠি, দাঁড়িয়ে পড়ি, তার দিকে এগিয়ে যাই; আরেকটুকু হলে তাকে ছুঁয়ে ফেলতাম। অনেক আগে যে-মেয়েটিকে দেখলে আমি কেঁপে উঠতাম, সে যদি আমার ছাত্রাবাসের কক্ষে কখনো এসে উঠতো, আমি এমনই কেঁপে উঠতাম। ক-দিন ধরে অদ্ভুত একটা ভার চেপে আছে আমার ওপর, ভারটা যে কী আমি তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওই ভারের চাপে আমি মাথা তুলতে পারছি না; ডলি ঢোকার সাথে সাথে ভারটা কেটে যায়। ভারটা কীভাবে এতো তাড়াতাড়ি কাটলো? দেলোয়ারের বাবার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে আমি ডলিদের বাসায় যাই নি, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে গিয়েছি; আর কখনো যাবো না ভেবেছি, এবং আমার ওপর ভারটা ক্রমশ ভারী থেকে আরো ভারী হয়ে উঠেছে। সময় আমার জন্যে দীর্ঘ হয়ে উঠেছে; একেকটি মিনিট একেক ঘণ্টার থেকে দীর্ঘ হয়ে উঠেছে; আমি সময়ের একটা অবর্ণনীয় ভার বহন করেছি। একেকবার আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করেছে; আমি চিৎকার করেছি যে-চিৎকার আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় নি। গতকালই একটা শস্তা চায়ের দোকানে বসে আমি পাঁচ পেয়ালা চা খেয়েছি; একটি লোক আমরা সামনে বসে ইলশে মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিলো, তার মুখ থেকে বারবার ভাত ছিটকে আমার হাতের ওপর পড়ছিলো; ভাত যে মানুষ এত যত্নের সাথে খায়, তা দেখতে দেখতে আমার ভারটা আরো বেড়ে যাচ্ছিলো। এখন নিজেকে আমার খুব হাল্কা লাগে। ডলিকে আমি কখনো নাম ধরে ডাকি নি; ডলিকে নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু আমি কোনো কথা বলতে পারছি না।

ডলি বলে, চলুন।

আমি তার কথা বুঝতে পারি না।

ডলি আবার বলে, আমার সাথে চলুন।

এবার আমি বুঝতে পারি; বলি, কোথায়?

ডলি বলে, আমি একটু ফেরিঘাটে যাবো।

আমি বলি, কোন ফেরিঘাটে?

ডলি বলে, আমার ও আপনার জন্যে একটিই ফেরিঘাট আছে।

আমি বলি, সেখানে যেতে আমার ভয় করবে।

ডলি বলে, ভয় করবে কেনো?

আমি বলি, ক-দিন ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি ফেরিঘাটে দেলোয়ারের লাশ ভাসছে; দেলোয়ারের লাশ আমাকে ডাকছে।

ডলি বলে, আপনি অপরাধবোধ আর দুঃস্বপ্নে ভুগছেন।

ডলি উঠে দাঁড়ায়; এবং বলে, চলুন।

আমি ডলির সাথে উঠে দাঁড়াই; এবং বেরিয়ে পড়ি। ডলির পেছনে পেছনে হাঁটতে আমার ভালো লাগে; মনে পড়ে কোনো নারীর পেছনে এর আগে আমি হাঁটি নি; আমি মন দিয়ে ডলির পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকি। আমি ডলির ধবধবে গোড়ালি দেখতে পাই; লাল স্যান্ডলের ওপর ধবধবে গোড়ালি দেখে আমার সরোবরের কথা মনে পড়ে। আমরা একটি বেবি নিই, ডলিকে আমি উঠতে বলি, ডলি উঠে ডান দিকে বসে; আমি বাঁ দিকে বসি। বেবি চলতে শুরু করলে একবার আমার মনে হয় দেলোয়ার চালাচ্ছে; আমি ড্রাইভারকে ডাকি, তার মুখের সাথে দেলোয়ারের মুখের কোনো মিল নেই। তখন আমি বাইরের দিকে তাকাই। ডান দিকে তাকাতে সম্ভবত আমার সাহস হয় না।

ডলি জিজ্ঞেস করে, আপনি ড্রাইভারের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন কেনো?

আমি বলি, মনে হচ্ছিলো দেলোয়ার চালাচ্ছে।

ডলি বলে, আপনি কি সব সময় চারপাশে দেলোয়ারকে দেখতে পান?

আমি বলি, আপনি পান না?

ডলি বলে, না।

আমি আজ মাংসমেশানো তীব্র সুগন্ধটি পাচ্ছি না; ডলির শরীর থেকে একটা মাংসসম্পর্কহীন সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে। ডলি অনেক দিন মাংসের জগত থেকে দূরে আছে বলেই হয়তো তার মাংস থেকে আর ঝাঁজালো গন্ধ বেরোচ্ছে না। গন্ধটা আমার ভালো লাগছে, আমি বড়ো একটা নিশ্বাসে অনেকটা সুগন্ধ ভেতরে টেনে নিই; ডলি তা টের পায়, কোনো কথা বলে না। বেবি বেশ তীব্র গতিতে ছুটে চলছে, ডলি না থাকলে আমি মাঝেমাঝেই ভয় পেতাম; একটি ট্রাকের পাশ দিয়ে যেভাবে বেবিটি কেটে বেরিয়ে গেলো তাতে আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠতাম; কিন্তু, মনে হয়, ডলি আমার পাশে বসে আছে বলেই আমি ভয় পেলাম না; ট্রাকের চাকাগুলোকে সুন্দর রঙিন : খেলনার মতো লাগলো। ডলি তার বাঁ হাতটি বাড়িয়ে আমার ডান হাতটি ধরেছে। আমি ভেবেছিলাম ভুল করে সে আমার হাত ধরেছে। আমি আমার হাতটি টেনে নিতে চাই, পারি না; আমার হাতটি ওই হাতের সাথে লেগে থাকে, ওই হাতে আটকে থাকে, আমি সরিয়ে আনতে পারি না।

ডলি বলে, আমার হাতটি একটু শক্ত করে ধরুন।

আমি শক্ত করে ধরার চেষ্টা করি, পারি না; মনে হয় অন্য একটি হাত আমার হাতটিকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমার হাত ডলির হাত থেকে খসে পড়ছে।

ডলি বলে, ধরুন, আমার ভয় করছে।

আমি বলি, আমি ধরতে চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না।

ডলি বলে, দেলোয়ারের লাশ কি সত্যিই ভেসে উঠতে পারে?

আমি বলি, কঙ্কাল কখনো ভাসে না।

ডলি বলে, আপনি দু-হাত দিয়ে আমাকে একটু জড়িয়ে ধরুন।

আমি ডলিকে জড়িয়ে ধরে একটা মাংসঅস্থিহীন সুগন্ধ পাই। আমি একটু শক্ত করেই ধরি; আমার ভয় হয় নইলে অন্য কোনো হাত আমাকে টেনে ডলির কাছ থেকে সরিয়ে দেবে। আমি মনে মনে সেই হাত দুটিকে ঠেলে সরিয়ে দিই; ডলি শিশুর মতো আমার বাহুর ভেতরে পড়ে থাকে-এখন ওর ভয় করছে না। এমন সময় বৃষ্টি নামে-শ্যামল শুভ্র নিবিড় বৃষ্টি; চারপাশ শাদা হয়ে যায়, বেবি এগিয়ে যেতে যেতে চারপাশ আরো শাদা থেকে আরো শাদা হতে থাকে; আরো অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার হতে থাকে। আমি বেবিঅলাকে আস্তে চালাতে বলি। দু-পাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে আমাকে শীতল করে দিতে চায়, কিন্তু আমি বিস্ময়কর উষ্ণতা বোধ করি। বাঙলায় এমন আশ্চর্য বৃষ্টি নামতে পারে। দু-পাশের গ্রামগুলোকে ডলির ভুরুর মতো মনে হয়। ডলির মুখটি আমার দিকে এগিয়ে এসেছে, বৃষ্টির ফোঁটায় ডলির মুখ রজনীগন্ধার গুচ্ছ হয়ে উঠেছে; আমি রজনীগন্ধার গন্ধ পেতে থাকি। আমি ডলিকে আরো জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খাই। ডলির ঠোঁট আমার ঠোঁটে রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো ঝরে পড়ে।

ডলি ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বলে, আমি যাবো না।

আমি জানতে চাই, কোথায়?

ডলি বলে, ফেরিঘাটে। আমি ফেরিঘাটে যাবো না; আমি কারো কাছে অপরাধ করি নি।

ডলি বেবি থামাতে বলে; একবার বৃষ্টিতে ভিজে আসতে তার ইচ্ছে হয়; দূরে একটা ঝোঁপ দেখে আমি ভয় পাই। আমার ভয় হতে থাকে এই বৃষ্টিতে নামলে ধীরে ধীরে আমরা ঝোঁপের ভেতরে ঢুকে যাবো; ডলিকে নিয়ে আমি ঝোঁপের ভেতর ঢুকতে পারবো না। আমরা ফিরতে থাকি। ডলির শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে; সুগন্ধটি কি ক্রমশ মাংসমেশানো হয়ে উঠছে? আমার দম আটকে আসছে না। আমি ডলিকে তাদের দরোজায় নামিয়ে দিয়েই ফিরতে চেয়েছিলাম; ডলি ফিরতে দেয় না; আমি ডলির গোড়ালির শুভ্রতা দেখতে দেখতে আর সুগন্ধ অনুসরণ করতে করতে তাদের বসার ঘরে ঢুকি। ঢুকে দেখি ডলির আম্মার সাথে দেলোয়ারের আম্মা বসে আছেন। তাকে দেখে আমার হাসি পায়।

দেলোয়ারের আম্মা আমাকে বলেন, তুমি জানো ডলি দেলোয়ারের বউ?

ডলি আর আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি; ডলির আম্মা উঠে ভেতরের দিকে চলে যান।

দেলোয়ারের আম্মা বলেন, তুমি ডলিকে নষ্ট করছো।

ডলি বলে, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন না।

দেলোয়ারের আম্মা বলেন, তোমরা দুজন আমার দেলোয়ারকে নদীতে ফেলে দিয়েছো।

ডলি মেঝের ওপর বসে পড়ে, আমি দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

তিনি বলেন, দেলোয়ারকে নদীতে ফেলে দিয়ে তোমরা সুখে আছো। তোমরা সুখে থাকো, কিন্তু দেলোয়ারকে তোমরা কেনো নদীতে ফেলে দিলে?

আমি বেরিয়ে আসি। আমরাই দেলোয়ারকে নদীতে ফেলে দিয়েছি? আমি ফেলে দিয়েছি? ডলি ফেলে দিয়েছে? ডলি আর আমি ফেলে দিয়েছি? আমরা দেলোয়ারকে নদীতে ফেলে দিই নি? দেলোয়ার কীভাবে নদীতে পড়েছিলো, আমার ঠিক মনে পড়ে; আমার মনে হয় দেলোয়ার ফেরিতে উঠে গাড়ি থামিয়ে ডলি আর আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো, সিগারেট ধরিয়ে টান দিচ্ছিলো, তখন ডলি আর আমি ঠিক করি দেলোয়ারকে নদীতে ফেলে দেবো: আমরা দুজনে পেছন থেকে তার গাড়িটি ঠেলে পানিতে ফেলে দিই। দেলোয়ার কী করো, কী করো বলে হাসতে হাসতে পানিতে ডুবে যায়। আবার আমার মনে হয় আমি একটা ট্রাক চালাচ্ছিলাম, দেলোয়ার চালাচ্ছিলো তার দামি সুন্দর গাড়ি; দেলোয়ারের গাড়িটা আমার ট্রাকের আগে ছিলো; অতো সুন্দর গাড়িতে কেউ বসে থাকলে আমার সহ্য হয় না, আমি সহ্য করতে পারি নি; আমি আমার ট্রাক দিয়ে ঠেলে দেলোয়ারের গাড়িটাকে নদীতে ফেলে দিই। আমি যাকে ঠেলে নদীতে ফেলে দিয়েছি, তার নাম কী ছিলো?–মাহমুদ, আবদুল হালিম, দেলোয়ার? সে কি আমার বন্ধু ছিলো? বন্ধুকে আমি কী করে ট্রাক দিয়ে ঠেলে নদীতে ফেলে দিতে পারলাম? আমি কি আজ তার বউকে জড়িয়ে ধরেছি? আমি কি আজ তার বউকে চুমো খেয়েছি? আমি কি তার বউকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়ার জন্যে তাকে ঠেলে নদীতে ফেলে দিয়েছি? আমার বন্ধু কি তার বউকে কখনো বলেছে যে আমি নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম? বাবাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে? বাবার নিশ্চয়ই দরকার। চার সদস্য দলের একজন হিশেবে আমাকে রাখবে তো? আমার বেশ টাকা থাকবে? হজও হবে? হজ কাকে বলে? ট্যুরিজম? ধর্মীয় ট্যুরিজম বেড়াতে আমি ওখানে যাবো কেনো?

টেকনাফ না গিয়ে? আমার অপরাধের শেষ নেই? আমি নিয়মিত অপরাধ করি? ভিখিরিনিটাকে আমি কেনো জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বাচ্চার বাপ কে? বাপ কে তাতে কী আসে যায়? ডলিকে আমি নষ্ট করছি? নষ্ট কাকে বলে? দেলোয়ার ডলিকে পবিত্র করতো? ডলিকে আমি চুমো খেয়েছি-নষ্ট করেছি? ডলি কি আমাকে নষ্ট করেছে? আমি কি এখন বাসায় ফিরবো?

আমি আবদুস সালামের বাসার দিকে হাঁটতে থাকি। সালামকেই আজ মনে পড়ছে। কেনো সালামকে মনে পড়ছে। অনেকবার যাবে বলেও তো তার বাসায় আজো আমার যাওয়া হয় নি। সালাম কি এখন বাসায় আছে? না থাকলেই ভালো; অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। সালাম কি আরার চাকুরি নিয়েছে? ও বছরে তিনটা চাকুরি বদলায় কেনো? সালামের বউ দরোজা খুলে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, ঢুকতে বলেন না। হয়তো একটু বেশি বিস্মিত হয়ে গেছেন; আমি আগে কখনো আসি নি, বারবার আসবে বলেও।

তিনি বলেন, আসুন, ঠিক দিনে এসেছেন।

আমি বলি, তাহলে আমি যাই।

তিনি বলেন, না, না; যাবেন কেনো।

তিনি আমাকে বসার ঘরে না নিয়ে ভেতরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, যার জন্যে এসেছেন, তার ঘরেই চলুন। দেখুন কেমন আছে।

সালাম কি ভালো নেই? ও কি অদ্ভুত রকমে খারাপ আছে? ও কি একটা দেখানোর বস্তু হয়ে উঠেছে? দেখে আমি সহ্য করতে পারবে তো?

সালাম মেঝেতে বসে খাটে মাথা রেখে কাত হয়ে আছে, হাতে বেশ বড়ো একটা গেলাশ- মেঝেতে রাখা; সালাম পান করছে, আমাকে দেখে চিনতে পারছে না। আমার থেকে বছর আটেকের বড়ো সালাম, যখনই দেখা হয় জড়িয়ে ধরা তার অভ্যাস; আজ আমাকে চিনতে পারছে না, কিন্তু জড়িয়ে ধরছে ঠিকই। সালাম এখন পৃথিবীর সব কিছু জড়িয়ে ধরতে পারলে ভালো থাকতো; আমাকে জড়িয়ে ধরে একটু ভালো বোধ করছে। আমারও ভালো লাগছে; এর আগে আমাকে এমন অসহায়ভাবে কেউ জড়িয়ে ধরে নি; আমি সালামকে বুঝতে দিচ্ছি না যে আমারও সারা পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করছে, আমিও তাকে জড়িয়ে ধরে আছি।

সালাম বলে, তুই বোধ হয় সেই ভালো ছেলেটা, যে মদটদ খায় না। সালাম আমার মুখে চুলে আঙুল বুলোতে থাকে।

আমি বলি, খাই না, তা ঠিক নয়।

সালাম বলে, দু-নম্বরের সঙ্গে আজ একটু মনোমালিন্য হচ্ছে। তুই কিছু মনে করিস না; আয়, একটু খা।

সালাম হুহু করে কাঁদতে শুরু করে; শিশুর মতো কান্না, শিশুর থেকে গভীর কান্না। শিশুরা এমন ভেঙে পড়ে কখনোই কাঁদতে পারে না। এই প্রথম আমি কাউকে কাঁদতে দেখলাম।

সালামের বউ বলেন, ওর কান্না দেখে আমার ঘেন্না হচ্ছে। আমাকে ও অপমান করছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে, ভাবী?

সালামের বউ বলেন, ওর মেয়ের আজ ফল বেরিয়েছে।

সালামের আরো কান্না দরকার, সে আমাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদে; ভেঙে ভেঙে বলে, আমার মেয়ের আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, মা আমার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে, পত্রিকায় আমার মা বলেছে ওর কোনো আব্বা নেই।

সালাম মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। আমি বুঝতে পারি সালামের এভাবে কান্নার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে; কিন্তু কারো দুঃখ কীভাবে অনুভব করতে হয় আমি জানি না। আমি শুধু চেয়ে থাকতে পারি, সালামের দিকে চেয়ে থাকি।

সালাম ডুকরে উঠে বলে, আমার মাকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম, মা আমার সাথে দেখা করে নি; ব'লে পাঠিয়েছে ওর কোনো আব্বা নেই।

সালামের বউ বলেন, আর ফিরে এসেই আমাকে বলছে, তুই চিৎ হয়ে শো, তোর পেটে আমি আজই একটা মেয়ে জন্ম দেবো।

সালাম জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, তোর পেটে অমন মেয়ে আসবে না রে আসবে না।

সালামের বউ বলেন, তাহলে সেই রত্নপ্রসবিনীকে নিয়ে থাকলেই পারতে।

সালাম বলে, তোর বাইরটাই রত্নের মতো ঝলমলে, ভেতরে কোনো রত্ন নেই রে, তোর ভেতরে শুধু আবর্জনা।

সালামের বউ বলেন, তোমার মুখে থুতু দিতে ইচ্ছে করছে।

সালাম বলে, অই বউ বেশি ক্ষেপিস না, নিজে একটু খা, আর এই ভালো ছেলেটারে একটু দে।

সালামের বউ আমার জন্যে বেশখানিকটা হুইস্কি ঢালেন, নিজের জন্যে তারও বেশি। আমরা দুজনেই প্রথম চুমুকেই বেশ খানিকটা খাই। খেতে আমার বেশ লাগে, নিজেকে হাল্কা লাগে; আমার মনে হয় আমার ভেতরে একটা শোক আছে, আমার খাওয়া উচিত।

প্রত্যেকটা মানুষ অশ্রুবিন্দুর মতো, সালাম বলে, কখন টলমল করে উঠবে কেউ জানে না। সালামের কণ্ঠ খুব জড়িয়ে গেছে। সে বলে, আমি আজ অশ্রুতে পাপ ধুয়ে ফেলতে চাই।

সালামের বউ খলখল করে হাসতে থাকেন; বলেন, ওই অশ্রুতে পাপ কেনো, চোখের পাতাও ধোয়া হবে না; তোমার চোখের পানিও তোমার মতোই নোংরা।

অই ভালো ছেলে, শোন, সালাম বলতে থাকে, তুই সামনে যে-রত্নটারে দেখছিস, তার মাংসের কণায় কণায় রত্ন জ্বলে; এই রত্নের জন্যেই আমি জীবনটাকে বর্জন করেছি। ওর সঙ্গে যখন শুই আমার জীবনের কথা মনে থাকে না; শোয়া শেষ হলেই মনে পড়ে আমার একটি মা ছিলো, দুটো বাবা ছিলো।

সালাম মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে, ব্যাকুলভাবে বাহু দিয়ে কাদের যেনো জড়িয়ে ধরে সমস্ত হৃৎপিণ্ড দিয়ে চুমো খাচ্ছে। তার আবেগ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, তবু আমার ভেতরও একটা দুঃখ জেগে ওঠে; কিন্তু সালামের বউ খলখল করে হাসতে আর পান করতে থাকেন। তিনি ঝলমল করতে থাকেন, তার শরীর থেকে অজস্র রত্ন ঝলমল করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আমি উঠে দাঁড়াই।

সালামের বউ বলেন, উঠছেন কেনো, বসুন; আরেকটুকু খান।

আমি বলি, আমি কষ্ট পাচ্ছি, আরেকটুকু বসলে আমিও কাঁদতে শুরু করবো।

তিনি বলেন, আপনার আবার কিসের কষ্ট?

আমি বলি, আমি আমার বন্ধুকে নদীতে ফেলে দিয়েছি।

তিনি হা হা করে হেসে ওঠেন, এটুক খেয়েই বন্ধুকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন ভেবে কান্না পাচ্ছে, আরেকটু খেলে তো আমাকে খুন করে ফেলেছেন ভেবে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাতে থাকবেন।

রাতে খুব ঘুম হয় আমার। ঘুমের মধ্যে আমি নিবিড় বর্ষণের শব্দ শুনতে পাই, আমার চোখ মেলতে ইচ্ছে করে না; ছেঁড়া কাঁথার মতো আমার শরীর বিছানার ওপর এলিয়ে থাকে। একেকবার আমার মনে হয় অজস্র সবুজ পাতা ঝরে পড়ছে বনের ভেতর, আমি সেই পাতার স্তূপের নিচে পড়ে আছি, আমার ওপর সবুজ বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টিতে গলে যাচ্ছি আমি, কাদামাটির মতো হয়ে যাচ্ছি। পাতার ভেতর থেকে একটি সবুজ অজগর বেরিয়ে আসে; আমার শরীরের ওপর অজগরটি খেলতে থাকে, আমি অজগরটিকে জড়িয়ে ধরে খেলতে থাকি, অজগর আমার গলা জড়িয়ে ধরে, আমি। অজগরের গলা জড়িয়ে ধরি, অজগর আমাকে চুমো খায় আমি চুমো খাই অজগরকে; খেলতে খেলতে সবুজ পাতার ভেতরে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কখন ভোর হয় আমি বুঝতে পারি না, ঘুম ভাঙার পরও অজগরের স্মৃতি আমার মনে স্পষ্ট জেগে থাকে; একবার আমি কেঁপেকেঁপে উঠি। আমি বিছানা থেকে উঠি না, উঠতে আমার ইচ্ছে করে না; আমি অফিসে যাই না। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, বৃষ্টি হচ্ছে মাঝেমাঝেই; আমি চা খাচ্ছি, আবার চা খাচ্ছি, সিগারেট খেতে আমার ছেলেবেলার মতো ভালো লাগছে। সিগারেটে আমি ছেলেবেলার গন্ধ পাচ্ছি।

দশটার দিকে আমি বেরিয়ে পড়ি; একটু বৃষ্টিতে ভিজি; ডলিদের বাসায় যাই। ডলি অবাক হয়; ডলির অবাক হওয়া দেখে আমি সুখ পাই।

ডলিকে বলি, একটি সুন্দর শাড়ি পরে এসো।

ডলি চমকে ওঠে, কেনো?

আমি বলি, আমরা বাইরে যাবো।

ডলি বেশ তাড়াতাড়ি শাড়ি পরতে পারে; আমার চমৎকার লাগে; আমরা দরোজা খুলে বেরোই। দূরে দাঁড়ানো বেবিটাকে আমি ডাকি।

ডলি জিজ্ঞেস করে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমি বলি, কোর্টে-আমরা বিয়ে করবো।

ডলি একবার আমার দিকে তাকিয়ে উঠে বেবির ডান দিকে বসে, আমি উঠে বা দিকে বসি।

সব কিছু হয়ে গেলে লোকটি বলে, কাজির অফিসে গিয়ে একবার বিয়ে পড়ে নেবেন।

আমি জানতে চাই, কেনো?

লোকটি বলে, আপনারা মুসলমান তো।

আমি বলি, তাহলে এখানে এলাম কেনো?

আমি ডলির ডান হাতটি ধরে পা বাড়াই, ডলিও আমার সাথে পা বাড়ায়।

ডলি বলে, তোমার বউকে তুমি এখন কোথায় নেবে?

আমার রক্তের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে ঝলমলানো রোদ ঢুকতে থাকে, আমার মাংস ঝলমল করে ওঠে; আমি বৃষ্টির মধ্যেই পা বাড়িয়ে দিই। আমার মনে পড়ে না যে বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে। ডলিও আমার সাথে পা বাড়ায়। ডলি আমার বা হাতটি ধরে আছে। অনেকগুলো রিকশা ভিড় করে এসেছে, দু-তিনটি বেবি খুব চিৎকার করছে, আমি আর ডলি বেবি বা রিকশার কথা ভাবতে পারছি না, কোনো যানবাহন যে আমাদের দরকার পড়তে পারে, আমাদের তা মনে হচ্ছে না।

আমি ডলিকে জিজ্ঞেস করি, তোমার এখন কী ইচ্ছে করছে?

ডলি বলে, এতো কিছু ইচ্ছে করছে যে ব'লে সারাজীবনেও শেষ করতে পারবো না।

আমি বলি, অন্তত একটি বলো।

ডলি বলে, তোমার হাত ধরে হাঁটতেই ইচ্ছে করছে।

আমি বলি, আমার খুব দূরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ডলি বলে, তাহলে তা-ই চলো।

আমি বলি, হেঁটে অতো দূর যাওয়া যাবে না।

ডলি বৃষ্টির থেকেও নিবিড় হেসে বলে, তাহলে একটা প্লেন ভাড়া করো।

কংকর্ডের থেকেও দ্রুত ও শব্দিত একটি বেবি এসে আমাদের সামনে থামে; আমরা উঠে বসি, ডলি ডান দিকে আমি বাঁ দিকে।

আমি ড্রাইভারকে বলি, শহর পেরিয়ে যে-দিক ইচ্ছে যাও, খুব দূরে।

বেবি চলতে শুরু করে। আমরা যে-দুজনই ভিজে গেছি, এটা প্রথম মনে পড়ে। ডলির; সে তার ব্যাগ থেকে একটি ছোটো তোয়ালে বের করে, আমার চশমাটি খুলে নিয়ে মুছে পরিয়ে দেয়, এবং আমি ডলিকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাই। আমি যখন তাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে থাকি, সে তোয়ালেটি আমার শরীরের এদিক সেদিক বুলোতে থাকে; ঘষে ঘষে চুলগুলো শুকিয়ে ফেলে; আমি একবার ডলির হাত থেকে তোয়ালেটি নিই, ডলি মনে করে আমি হয়তো আমার এমন কোনো অঙ্গ মুছবো যেখানে তার হাত পৌঁছোবে না; আমি তোয়ালেটি দিয়ে তার মুখটি মুছে দেয়ার চেষ্টা করতেই সে আমার হাতটি তার দু-হাতে আস্তে চেপে ধরে। তোয়ালেটি আমার হাত থেকে খসে পড়ে, আমি তার মুখের একরাশ কোমলতা আমার দু-হাতের অঞ্জলিতে ধরে রাখি। বৃষ্টিতে পৃথিবী তখন শাদা হয়ে গেছে, পথঘাট থেকে মানুষেরা মুছে গেছে, আমরা শুধু ছুটে চলেছি। শহর পেরিয়ে অনেক দূরে এসে গেছি আমরা; পথের পাশে আমি একটি ভাঙা নড়োবড়ো ভাতের দোকান দেখতে পাই;

দোকানটি বৃষ্টিতে কাকের মতো কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু ভেতর থেকে একটা গরম গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি বেবি থামাতে বলি।

চলো, আমি বলি, ভাত খাই।

ডলি বলে, ভাত? কোথায়?

এ-দোকানে, আমি বলি, খুব মোটা চালের গন্ধ পাচ্ছি।

ডলি বলে, ভাতের সুগন্ধ এটা?

আমরা নামতেই লোক তিনটি পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে; কী খাবো আর কী খাবো না জানার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। তারা কি বুঝে ফেলেছে আমরা এইমাত্র বিয়ে করে এসেছি। আমাদের একটা উষ্ণ সংবর্ধনা জানাতো উচিত? পোলাও রোস্ট তৈরি করা দরকার?

আমি ডলিকে বলি, আগে ওরা খবর পায় নি, ভাগ্য।

ডলি বলে, আগে খবর পেলে কী হতো?

আমি বলি, হয়তো লাল নীল কাগজ কেটে গেইটই তৈরি করে ফেলতো।

ডলি বলে, গেইট দিয়ে ঢুকতে আমার মন্দ লাগতো না।

আমি বলি, তাহলে গেইট সাজাতে বলি?

ডলি বৃষ্টির মতো দিকে দিকে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে থাকে।

ডলি বলে, ওই লোকটিকেও বলো।

আমি বলি, কাকে?

ডলি বলে, বেবিঅলাকে।

আমি ডাকি, ড্রাইভার, ড্রাইভার।

ডলি আমার পাতে খাবার তুলে দিতে থাকে, আমার অদ্ভুত লাগে। মা আমার পাতে খাবার তুলে দিলেও আমি থামিয়ে দিই; বলি, রাখো তো, রাখো তো, কিন্তু ডলিকে থামাতে পারি না। আমি ডলির আঙুলের দিকেই তাকিয়ে থাকি; তার আঙুলের ভেতর থেকে স্বাদ গড়িয়ে পড়ছে আমার প্লেটে। লাল টকটকে নলা আর ঝাল কাঁচকি মাছ। দিয়ে আমরা ভাত খাই; আমার ঠোঁটজিভ পুড়ে যেতে থাকে। আমাদের জিভে এতো স্বাদ আছে আমরা আগে কেউ জানতাম না; আমি জানতাম না, ডলিও জানতো না।

ডলি বলে, কী যে স্বাদ লাগলো।

আমি বলি, এসো আরেকবার খাই।

ডলি বলে, আরেক দিন খাবো।

শহরে ফিরে একটি শাড়ির দোকানের সামনে আমি বেবি থামাতে বলি।

ডলি বলে, এখানে কেনো?

আমি বলি, আমার কয়েকটি শুকনো শাড়ি দরকার।

যখন বেরোচ্ছি, সন্ধ্যা অনেকটা হয়ে গেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি একটি বেবির জন্যে ডানে বায়ে তাকাচ্ছি।

ডলি বলে, তোমার বউকে তুমি কোথায় রাখবে?

আমি চমকে উঠি, কথাটি আমি ভাবিই নি; আমি ধরেই নিয়েছিলাম ডলিকে আমি ডলিদের বাড়ি পৌঁছে দেবো, তারপর বাসায় ফিরে আসবো; কিন্তু ডলি যে আজ আমার বউ হয়ে উঠেছে, আমি তা ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি বলি, তাতো ভাবি নি।

ডলি বলে, একলা আমার ঘুম হবে না।

আমি বলি, আমরা কি একসাথে ঘুমোবো?

ডলি হাসতে থাকে।

আমি বলি, তোমার হাসি আমার ভালো লাগছে, কিন্তু তুমি হাসছো কেনো?

ডলি বলে, আমরা তো বিয়ে করেছি।

আমি বলি, হ্যাঁ।

ডলি বলে, তোমার কি বিশ্বেস হচ্ছে আমরা বিয়ে করেছি?

আমি বলি, হ্যাঁ।

ডলি বলে, প্রথম রাতেই দু-বাসায় ঘুমোনোর জন্যে কেউ বিয়ে করে না।

আমি বলি, ঘুমোনোর কথা আমার মনে পড়ে নি।

ডলি বলে, তাহলে বিয়ে করলে কেনো?

আমি বুঝে উঠতে পারি না কেনো বিয়ে করেছি। ডলির সাথে ঘুমোনোর জন্যেও আমি কোনো ব্যগ্রতা বোধ করছি না, আমার সব কিছুই আমার কাছে খুব শীতল ও সুন্দর মনে হচ্ছে, একটি নারীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোনোর কোনো তীব্রতা আমার নেই; বরং আমার মনে হচ্ছিলো ডলিকে ওদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি ফিরবো,–প্যান্টটি আমার এখনো ভিজে আছে, সেটি খুলে ফেলে টয়লেটে গিয়ে অনেকক্ষণ প্রস্রাব করবো,–তারপর খেয়ে কিছু একটা পড়বো, এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়বো। ডলি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে বিয়ে করলে একসাথে ঘুমোতে হয়, দু-বাসায় ঘুমানোর জন্যে কেউ বিয়ে করে না। গতকালও আমি ডলির সাথে ঘুমোতে পারতাম না; আমার যদি ইচ্ছে হতো, এবং আমি যদি ঘুমোতে চাইতাম, ডলি নিজেই চিৎকার করে উঠতো; তার সাথে চারপাশের বাড়িঘর, মসজিদ, মন্দির, রাষ্ট্র চিৎকার করে উঠতো; কিন্তু আজ তার সাথে না ঘুমোলে সে কাঁদবে। শুধু কাঁদবে না, সে আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকবেই না।

আমি বলি, তোমার কি একসাথে ঘুমোনোর ইচ্ছে হচ্ছে?

ডলি কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, তুমি কিন্তু কথা বলছে না।

ডলি বলে, সব কথা বলতে হয় না।

আমরা দোকানগুলোর সামনের পথ দিয়ে হাঁটতে থাকি; শাড়ির প্যাকেটগুলো ডলি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে, ডলিকে খুব উষ্ণ মনে হচ্ছে। একটি সোনার দোকানের পাশ দিয়ে যেতেই আমি একবার দাঁড়াই।

ডলি বলে, থামলে কেনো?

আমি বলি, দোকানটিতে একবার ঢুকলে কেমন হয়?

ডলি বলে, না, না, এখন না।

আমি সামনের দিকে একবার পা বাড়াতেই ডলির মুখটিকে ম্লান মনে হয়; আমি আবার পিছিয়ে দোকানটিতে ঢুকি।

আমি বলি, একটি আংটি।

ডলি বলে, তাহলে দুটো আংটি।

আমরা বেরিয়ে আবার হাঁটতে থাকি; একটা অষুধের দোকান দেখে আমি থামি; ভেতরে পা দিই।

ডলি বলে, অষুধ কিনবে?

আমি দোকানিকে বলি, কয়েক প্যাকেট কনডম দিন।

ডলি মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

আমি ডলিকে বলি, ডলি, পিল কিনবো?

ডলি বলে, না।

আমি হাসতে থাকি। ডলি বলে, হাসছো কেনো?

আমি বলি, পিল হচ্ছে আধুনিক নারীদের প্রধান খাদ্য, তুমি তা খেতে চাও না।

ডলি বলে, তুমি খাওয়ালে তো খাবোই।

আমি হাসতে থাকি, আর বলি, না, না দরকার নেই; আধুনিক পুরুষদের প্রধান পোশাকটিই আমি পরবো।

রিকশা নিয়ে আমরা একটি চীনে রেস্তোরাঁয় ঢুকি। ডলির মুখ দেখে আমার ভালো লাগে, ঢোকার সাথে সাথে ডলি ঝলমল করে উঠেছে। আমরা মুখোমুখি বসি; কিন্তু টেবিলটি এতো ছুটো যে মনে হয় আমরা জড়িয়ে ধরে বসে আছি।

লোকটি চলে গেলে আমি ডলিকে বলি, তোমার পা দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে দাও তো।

ডলি প্রায় চিৎকার করে উঠে বলে, কেনো?

আমি বলি, চুমো খাবো। ডলি চমকে আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।

ডলি বলে, রিকশায় ভেবেছিলাম তুমি জড়িয়ে ধরবে।

আমি বলি, আমার মনে পড়ে নি, চলো রিকশায় ঘুরে আসি।

ডলি হেসে ওঠে, তোমার সঙ্গে জীবনটা অন্য রকম হবে।

ডলি তার পা বাড়িয়ে দেয়, আমি পা দুটো আমার কোলে রেখে চুমো খাই।

আমরা যখন বাসায় পৌঁছি তখন বেশ রাত হয়েছে; মা, বাবা, বেলা–ছোটো বোনটি, উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আজকাল দেরিতে ফিরলেই তারা সবাই খুব উদ্বিগ্ন থাকে; আমাকে কিছু বলে না, একটু বেশি রাত করে টেলিভিশন দেখে, আমি বুঝতে পারি তারা উদ্বিগ্ন। তিনজনেই একসাথে দরোজা খুলে দেয়। বাবা আর মা ডলিকে চিনতে পারে না; তারা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলো বলে বেশি অবাক হতে পারে না; বেলা ডলিকে ঠিকই চিনতে পারে, এবং এমনভাবে তাকায় যেনো কিছু খুঁজছে।

বেলা বলে, আম্মা, চিনতে পারছো? উনি দেলোয়ার ভাইর বউ।

আমি বলি, না, আমার বউ।

তারা তিনজনই একসাথে চমকে ওঠে, কিন্তু বেশি চমকাতে পারে না, বেশি রাত হয়ে গেছে বলেই হয়তো। ডলি এর মাঝেই সালামের কাজটি সম্পন্ন করেছে; মা তখনো ডলির মাথায় তার হাত ছুঁয়ে রেখেছে।

আমি বলি, আজ আমি ডলিকে বিয়ে করেছি।

তারা তিনজন একসাথে একটু বেশি নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে; তাদের কিছু বলতে বা করতে হবে তাও বুঝে উঠতে পারে না। আমি ডলিকে নিয়ে আমার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকি; তারা আমাদের পিছে পিছে আসতে থাকে। আমার ঘরে এসে আমি বিছানায় বসি, ডলি দাঁড়িয়ে থাকে; বাবা, মা, আর বেলাও দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলি, তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেনো? বসো।

বাবা বলেন, তোমাদের যেহেতু আগেই পরিচয় ছিলো, তোমরা আগেই বিয়ে করতে পারতে।

আমি বলি, আগে আমাদের পরিচয় ছিলো না।

মা কোনো কথা বলে না, বেলাও কোনো কথা বলে না।

আমি ডলিকে বলি, তুমি কি বাসায় টেলিফোন করবে?

ডলি বলে, না।

মা বলে, চলো, তোমাদের খেতে দিই।

আমি বলি, আমরা খেয়ে এসেছি।

বেলা ডলিকে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা বলে, আমাদের আগে বলতে পারতে।

আমি বলি, আমি আগে জানতাম না।

বাবা বলেন, তুমি তো এমন ছিলে না।

আমি বলি, পনেরো বছর হওয়ার পর আপনি আর আমাকে জানেন না।

বাবা উঠে চলে যান।

কাপড় বদলিয়ে আমি টয়লেটে যাই, ফিরে এসে শুয়ে পড়ি; বালিশের নিচে একটি বই পড়ে ছিলো, হাতে ঠেকতেই তুলে নিই বইটি নিষিদ্ধ, আমার প্রিয় বইয়ের একটি পাতা

খুলেই আবার দেখতে পাই–উর্বরতার দেবীরাই তখন ছিলো প্রধান দেবী, তাদের হটিয়ে আসে পুরুষ দেবতারা; বিশাল কালো পাথরটি ছিলো উর্বরতার দেবী আফ্রোদিতির মূর্তি, যার যোনিদেশে চুমো খেতে ভক্তরা, কেননা মাটি যেমন জন্ম দেয় শস্য তেমনি নারীর ওই প্রত্যঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে রহস্যময় সন্তান। পাথর আকাশ থেকে পড়ে নি। শস্য আমার পছন্দ, কিন্তু সন্তান সম্পর্কে আমার দ্বিধা রয়েছে; সন্তান জন্ম দেয়ার প্রণালিটি আমার ভেতরে ঘেন্না জাগায়। বেলা ডলিকে নিয়ে আমার ঘরে ঢোকে। ডলি লাল টকটকে নতুন শাড়িটি পরেছে। আমার নারায়ণগঞ্জের কথা মনে পড়ে; দেলোয়ার আমাকে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছে; আমি দেখতে পাই মেয়েটি আমাকে ব্লাউজ খুলতে দিচ্ছে না; পুলিশ আমার কাছে দশ টাকা চাচ্ছে; দেলোয়ার বলছে, তুমি অপবিত্র। ডলি কি আমার সাথে ঘুমোবে? আমি কি ডলির সাথে ঘুমোবো? ডলির ওই লাল টকটকে শাড়ি কি আমার খুলতে হবে? ডলি কি খুলতে দেবে? ডলির শাড়ি খোলার কোনো আগ্রহ আমি ভেতরে বোধ করছি না। ডলি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দরোজা বন্ধ করে দেয়, এবং এসে বিছানায় বসে।

আমি বলি, তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।

ডলি বলে, আমি তোমার বউ।

আমি বলি, এতো সুন্দর বউর কথা আমি কখনো ভাবি নি।

ডলি বলে, আমি সুন্দর নই।

আমি বলি, তোমার সৌন্দর্য দেখে আমার ভয় লাগছে।

ডলি বলে, এ-সৌন্দর্য নষ্ট হতে বেশি সময় লাগবে না।

আমি বলি, ওঠো, উঠে শুয়ে পড়ো।

ডলি বলে, আমাকে ধরে উঠোও, নইলে আমি উঠতে পারবো না।

আমি ডলিকে ধরে উঠোতে গিয়েই দেলোয়ারের মুখ দেখতে পাই। আমি ডলিকে আর উঠোতে পারি না; দেলোয়ার শক্ত হাতে ডলিকে ধরে রেখেছে, আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে, আমি পেরে উঠছি না।

ডলি বলে, আমি তোমার বউ, আমাকে ধরো।

আমি বলি, ডলি, আমি তোমাকে ধরতে পারছি না।

ডলি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার মুখের দিকে তাকাও।

ডলির মুখটি আমার অঞ্জলিতে নেয়ার জন্যে আমি হাত বাড়াই, মুখটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, অঞ্জলিতে স্থান পেতে চায়; আমি দেখতে পাই দেলোয়ার হাত দিয়ে ডলির মুখ ঢেকে রেখেছে, দেলোয়ারের অঞ্জলিতে ওই মুখ আধোঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে; তার অঞ্জলি আমি সরাতে পারি না; বারবার চেষ্টা করতে থাকি, কিছুতেই সরাতে পারি না; দেলোয়ারের

আঙুল ডলির মুখে ময়লা দাগের মতো লেগে থাকে; এক সময় তার আঙুল সরিয়ে দুটি উজ্জ্বল রক্তের দাগের মতো ডলির ঠোঁটের দিকে আমি ঠোঁট বাড়াই; বাড়াতে গিয়েই দেখি দেলোয়ারের ঠোঁট লেগে আছে সেখানে, তার ঠোঁট খসতে চাচ্ছে না; দেলোয়ারের ঠোঁটের চাপে ওই ঠোঁট রক্তগোলাপের মতো ফুটে উঠছে; আমি ঠোঁট ফিরিয়ে নিই; ডলি শাদা পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে; কিন্তু ডলি আমার, ডলিকে উদ্ধার করতেই হবে, ডলি আমার বউ; আমি টান দিয়ে ডলির লাল শাড়িটি খুলে মেঝের দিকে ছুঁড়ে ফেলি, আমার মনে হয় অন্য কেউ শাড়িটি ছুঁড়ে ফেললো, নোংরা হয়ে গেলো শাড়িটি; তার ব্লাউজ খুলতে গিয়ে অন্য কারো হাতের সাথে আমার আঙুলের ঘর্ষণ লাগে; ওই হাত অনেক আগে থেকেই খুলছে ডলির ব্লাউজ; সে-হাত বারবার আমার আঙুলগুলোকে ফিরিয়ে দিতে থাকে; আমি ডলির ব্লাউজ টেনে চারপাঁচ টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি, ছেঁড়ার শব্দ মধুর লাগে আমার; ডলির কম্পমান চাঁদের আলোয় আমার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে; ওই অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে দেখি অন্ধকারের ভেতরে বসে আছে অন্য কেউ; আমার চোখে আরো গাঢ় অন্ধকার নামে; ডলিকে আর ডলি মনে হয় না, নদীর ওপর দীর্ঘ চর মনে হয়; ওই চরে আমি যেখানেই যেতে থাকি, সেখানেই দেখি দেলোয়ার ঘর বানিয়েছে, চাষ করেছে, লাঙ্গল চালিয়েছে, ধান পাট সরষে তিল যব কাউন কুমড়ো শিম বুনেছে; দিঘি কেটেছে, জল টলমল করছে; এ-জমি থেকে আমন তুলেছে, ওই জমি থেকে আউশ; পুবের জমি থেকে মশুর, পশ্চিমের জমি থেকে কলই; আমি ডলির বাহু থেকে বগল থেকে নাভিতে ছুটতে থাকি; লাল তিল থেকে ধূসর তিলে দৌড়োতে থাকি-প্রত্যেকটিই দেলোয়ারের; হেঁটে হেঁটে। বাহুতে গিয়ে ডলিকে জিজ্ঞেস করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; হেঁটে হেঁটে বগলে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; গড়াতে গড়াতে নাভিতে গিয়ে ডলিকে জিজ্ঞেস করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; হামাগুড়ি দিয়ে জংঘায় গিয়ে জিজ্ঞেস করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; পায়ের তালুতে গিয়ে ডলিকে জিজ্ঞেস

করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; শত শত মাইল পেরিয়ে সোনার খনিতে গিয়ে ডলিকে জিজ্ঞেস করি, দেলোয়ার কি এখানে ছিলো;–হ্যাঁ; আমি অন্ধ হয়ে যেতে থাকি, অন্ধত্বের ওপারে এক অদ্ভুত জ্যোৎস্নাই শুধু আমার চোখ দুটিকে। ম্লানালোকিত করে রাখে; ওই অন্ধ আলোর ভেতরে আমি ডলিকে দেখার চেষ্টা করি, দেখতে পাই না; আমার মনে হয় ডলি আমার স্ত্রী নয়, এ-শরীর যার সে আমার স্ত্রী নয়; অন্য কারো; আমি নিঃশব্দে ডলির শরীর থেকে খসে পড়ি।

একটু পর ডলির জন্যে আমি কষ্ট পেতে থাকি; তাকে বিয়ে করতে আমাকে সে বলে নি; বরং সে আমার কথা রেখে একটি সম্পূর্ণ দিন আমাকে সুখী করেছে। একটি সম্পূর্ণ দিন আমি কখনোই সুখী থাকি নি পনেরো বছর হওয়ার পর। আমি যখন আজ তাকে বেবিতে উঠতে বলি, যদি সে উঠতে রাজি না হতো, বলতো, আপনাকে বিয়ে করার কথা আমি ভাবতে পারি না; আপনি ভুল বুঝেছেন আমাকে; আপনাকে আপন মনে করেছি শুধু আমরা একই অপরাধ করেছি বলে, তাহলে একটি সম্পূর্ণ সুখের দিন আমি কখনোই পেতাম না। ডলি কোনো কথা বলছে না, আমি কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি; প্রথম মনে হচ্ছিলো আমি নিজেই কাঁদছি, পরে বুঝতে পারি কাঁদছে ডলি। দেলোয়ার নদীতে ডুবে যাওয়ার পরও ডলিকে কাঁদতে দেখি নি; আজ তার কাঁদার কথা নয়, আজ সম্পূর্ণ একটি দিন আমি তাকে সুখে রেখেছি, পনেরো বছর হওয়ার পর, কাউকে আমি একটি সম্পূর্ণ দিন সুখী রাখতে পারিনি, কেউ আমার কাছে সুখী হতে চায় নি, কাউকে আমি সুখী করে উঠতে পারি এমন কথা কেউ ভাবে নি; শুধু ডলিই আমাকে সুখী করতে চেয়েছে আর সুখী হতে চেয়েছে। ডলিকে আমি চিনিই না, কাউকেই আমি চিনি না; আমাকেও ডলি চেনে না। আমাকে কনডম কিনতে দেখে ডলি কী ভেবেছিলো? আমাকে খারাপ ভাবছিলো? তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তো মনে হচ্ছিলো তার একটি ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, যে-ভাবনাটি কখনো

সে প্রকাশ করে উঠতে পারতো না। এখন ডলি কী পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? সে কি বরফ হয়ে গেছে? আমি যদি তাকে ছুঁই সে কি আমাকে সহ্য করবে? ডলির কান্না এখন আর শুনতে পাচ্ছি না, সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তে না পারি ডলি কী করে ঘুমোতে পারবে? সে হয়তো তার নিজের বিছানাটির কথা ভাবছে। হয়তো দেলোয়ারকে ভাবছে। কেনো ভাববে না? আমার মনে পড়ছে, নারায়ণগঞ্জের মেয়েটিকে। ওই মেয়েটির শরীরে আমি অন্য কাউকে দেখতে পাই নি, কোনো দাগ দেখতে পাই নি, ময়লা দেখতে পাই নি; তাহলে ডলির শরীরে আমি এতো দাগ কেনো দেখলাম?

আমি ডাকি, ডলি।

ডলি বলে, বলো।

আমি বলি, দেলোয়ারকে মনে পড়ছে?

ডলি বলে, না।

আমি বলি, আমি দুঃখিত।

ডলি কোমলভাবে আমার ডান হাতটি ছোঁয়; মনে হয় বেশি ছুঁতে সাহস পাচ্ছে না; আমার মনে হয় ডলি আরো ছুঁক, কিন্তু আমি বলতে পারি না।

আমি বলি, দেলোয়ার আমাকে বহু বছর অপরাধবোধের মধ্যে রেখেছিলো।

ডলি বলে, আমি জানি।

আমি বলি, কী জানো?

ডলি বলে, আমি বলতে পারবো না।

আমি বলি, আমি নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম।

ডলি বলে, ওই কথা রাখো, ওই কথা রাখো।

আমি বলি, আমি খুব খারাপ।

ডলি বলে, না।

আমি বলি, দেলোয়ারই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো।

ডলি বলে, দেলোয়ার আমাকে তা বলে নি।

অফিসে গিয়ে দেখি

অফিসে গিয়ে দেখি নির্দেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে; প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নির্দেশের এক কপি পাঠানো হয়েছে আমার কাছেও;–একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক উচ্চপর্যায়ের পর্যবেক্ষক দল অবিলম্বে সৌদি যাচ্ছে; আমি ওই দলের চতুর্থ সদস্য। হাসি পায় আমার; ইচ্ছে হয় ডলিকে টেলিফোন করে জানাই আজ বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে, সৌদি যাচ্ছি, উচ্চ পর্যবেক্ষক দলের আমি চতুর্থ সদস্য। নির্দেশের সাথে আরেকটি নির্দেশও রয়েছে; আজই দশটায় সচিবের কক্ষে পর্যবেক্ষক দলের সাথে সচিবের বৈঠক হবে, আমাকে থাকতে হবে। সচিবের ঘর থেকে বেরিয়ে আর সময় পাবো না, সরাসরি বিমানে গিয়ে উঠতে হবে; ডলিকে এখনই জাতীয় সংবাদটি জানিয়ে খুব উচ্চকণ্ঠে আমার হাসতে ইচ্ছে করে। আমি হাসি না, টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে থাকে-অনেকেই সংবাদ পেয়ে গেছে, সৌদিতে আট হাজার দাস পাঠানো হচ্ছে, আমি চতুর্থ সদস্য; আমি ঘড়ির দিকে তাকাই, দশটা বাজার সময় আর বেশি নেই। আমাকে সৌদি যেতে হবে? ওমরা করতে হবে? আমিও পঞ্চাশটি পাঠাতে পারবো? সচিব কটি পাঠাবেন? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়? ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখে চুক্তির খসড়া করতে হবে? চুক্তিতে কী থাকবে? সচিবই নিশ্চয়ই আজ বলে দেবেন চুক্তিতে কী থাকবে; ঘরে ফিরে চুক্তির ভাষাটি হয়তো আমাকেই তৈরি করতে হবে।

ডলি কি বাসায় ফোন করেছে? করে থাকলে ডলির সবাই এখন আমাদের বাসায়। সারারাত তারা হয়তো ডলির আর আমার মতোই ঘুমোতে পারে নি। তারা কি রাতভর ছুটোছুটি করেছে। পুলিশের কাছে গেছে? হয়তো যায় নি। একটি রাত দেখতে চেয়েছে? আমি যে ডলিকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তারা তা জানে; ডলিকে যে আমি খুন করে ফেলবো না, অন্তত

খুন করে উঠতে পারবো না, এটাও তারা সম্ভবত জানে। আমি যে তাদের মেয়েটির কাছে যেতাম, তা কি তারা ঘেন্না করতো? তাদের দুঃখী মেয়েটিকে তারা কেনো আমার সাথে বেরোতে দিতো? তারা কি ভাবতো আমার সাথেই শুধু তাদের দুঃখী মেয়েটি সুখে থাকে? ডলি খুব চমৎকার মেয়ে। ডলি কী করছে এখন? ভেঙে পড়েছে? ভুল করে ফেলেছে ভেবে মায়ের বুকে মুখ রেখে নিঃশব্দে কাঁদছে? নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে অলৌকিক শক্তির খেয়ালের কাছে; মনে পড়ছে দেলোয়ারকে? তুলনা করছে, বারবার তুলনা করছে? কনডমের প্যাকেটগুলো আমি টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিলাম, ডলি কি ড্রয়ারে তুলে রেখেছে; কোনো দিন লাগবে না ভেবে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে? ফেলে দেয় নি হয়তো, অতো তীব্র মেয়ে নয়। ডলি; নিশ্চয়ই ড্রয়ারে বা বিছানার নিচে রেখে দিয়েছে। ওগুলো কাজে লাগবে? ওমরা করে আসার পর? ফেলে দিলে কেমন হয়? আমি কি ওগুলো পরতে পারবো? মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সাতদিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করে নিতে হবে? বরং ওমরা করে আসার পর ওগুলো ফেলে দিয়ে কিছু একটা করতে পারি, তাতে একটা পবিত্র পুত্র জন্মাতে পারে।

সচিবের ঘরে ঠিক দশটায় আমি ঢুকি; সচিব আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেন।

আমি বলি, বসবো, স্যার?

তিনি বলেন, বসুন।

সচিবের কথা শুনে তিন সদস্য অবাক হন; খুশিও হন; তারা বুঝে ফেলেন সচিবের আমি প্রিয় নই; এখন থেকে আমাকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে।

সচিব বলেন, আমাদের আজকের আলোচনা চূড়ান্ত গোপনীয়।

নেতা বলেন, জি স্যার, জি স্যার।

সচিব বলেন, তারা বলেছে শ্রমিক নেয়ার ও ফিরিয়ে দেয়ার বিমান ভাড়া তারা দেবে, আমাদের মনে হয় এটার দরকার নেই।

নেতা বলেন, জি স্যার, জি স্যার। নিজেরাই বিমান ভাড়া দিয়ে যাওয়া আসার জন্যে লাখ লাখ ছোঁকরা পাগল হয়ে আছে।

এক সদস্য বলেন, বিমান ভাড়া দিয়ে যেতে না পারলে আর সৌদি যাওয়ার কী দরকার স্যার, দেশেই ঘাস কাটতে পারে।

সচিব বলেন, আপনারা সেখানে গিয়ে এ-চুক্তিই করবেন।

নেতা আর সবাই বলেন, জি স্যার, জি স্যার।

সচিব বলেন, আর মাসে তিরিশ হাজার টাকা বেতনও দরকার নেই, পনেরো হাজার হ'লেই চলে।

সবাই চিৎকার করে ওঠেন, জি স্যার, আমরা নিজেরাই যেখানে কটা টাকা মাত্র পাচ্ছি; চাকরগুলো এতো বেতন কেনো পাবে?

সচিব বলেন, ভালোভাবে আপনাদের এসব চুক্তি করে আসতে হবে; আর–

সবাই বলে ওঠেন, জি স্যার?

সচিব বলেন, এতে ওদের কয়েক মিলিয়ন ডলার বাঁচবে। যা বাঁচবে, তার এইটি পার্সেন্ট আমাদের দিতে হবে, সুইস ব্যাংকে জমা দিতে হবে, দুটো অ্যাকাউন্টে।

সবাই বলেন, জি স্যার।

সচিব বলেন, আপনারা প্রত্যেকে পঞ্চাশজন করে পাঠাতে পারবেন; তবে দেখবেন আপনারা ওখানে থাকতে থাকতেই যাতে সুইস ব্যাংকে ডলার জমে; অ্যাকাউন্ট দুটোর নম্বর নিয়ে যাবেন।

সভা শেষ হয়ে আসছে; আমি বলি, স্যার, আমার একটি কথা আছে।

সচিব বিরক্ত হন, আমার দিকে তাকান; কোনো কথা বলেন না।

আমি বলি, আমার যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না, স্যার।

সচিব অবাক হন না; অন্য তিনজন অবাক হন।

সচিব বলেন, কেনো যেতে পারবেন না?

আমি বলি, আমি গতকাল বিয়ে করেছি, স্যার।

নেতা বলেন, আমাদের না জানিয়েই করে ফেললেন? কোথায় করলেন?

আমি বলি, হঠাৎ করে ফেললাম; এক বন্ধুর স্ত্রীকে।

সচিব বলেন, প্রথমবারই বন্ধুর স্ত্রীকে এর পর কাকে করবেন?

আমরা কেউ বুঝতে পারি না আমাদের হাসতে হবে, না গম্ভীর হতে হবে।

আমি সাধারণত বাসায় ফোন করি না; আজ নম্বরটি মনে করতে গিয়ে মনে করতে পারি না; তিন চারটি নম্বর আমার মনে পড়ে,-হয়তো এটি হবে, হয়তো ওটি হবে, নয়তো এটি হবে; আমি একটির পর একটি নম্বরে ফোন করতে থাকি।

একটি নম্বরে ফোন করতেই একজন বলে, হ্যালো, দেলোয়ার বলছি।

আমি বলি, দেলোয়ার, তুমি কেমন আছো?

সে বলে, আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

আমি বলি, আমি আনিস বলছি।

সে বলে, আনিস, কোন আনিস?

আমি বলি, তোমার বন্ধু আনিস।

সে বলে, আনিস নামে আমার কোনো বন্ধু নেই, অন্তত এখন মনে পড়ছে না।

আমি বলি, আছে, তুমি মনে করতে পারছে না।

সে বলে, তাহলে বলো তোমার সাথে আমার শেষ দেখা কোথায়?

আমি বলি, ফেরিঘাটে।

সে বলে, কোনো বন্ধুকে নিয়ে আমি কখনো ফেরিঘাটে যাই নি।

আমি বলি, ওই যে গাড়ি নিয়ে তুমি পানিতে পড়ে গেলে।

সে বলে, আমি পানিতে পড়ে গেলাম? গাড়ি নিয়ে? পাগল। ঘটরর করে সে ফোন রেখে দেয়।

আমি আবার ফোন করি, বলি, আমি আনিস বলছি।

বেলা বলে, ভাইয়া?

আমি বলি, এটা আমাদের বাসা না কি রে?

বেলা বলে, হ্যাঁ, আমাদের বাসাই, অন্য বাসা না; খুব আনন্দ লাগছে তোমার বাসায় ফোন করার অভ্যাস হচ্ছে।

আমি বলি, ভুলে করে ফেলেছি।

বেলা বলে, আহা, বানিয়ে কথা বলার দরকার নেই; ধরো, ভাবীকে দিচ্ছি।

ডলি বলে, তোমার ফোন পেতে খুব ইচ্ছে করছিলো।

আমি বলি, আসলে কি জানো, আমি বাসায় ফোন করতে চাই নি।

শুনে ডলি স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি ডাকি, ডলি।

ডলি বলে, তাহলে কোথায় ফোন করতে চেয়েছিলে?

আমি বলি, একটি ভুল নম্বরে ফোন করেছিলাম, লোকটি ফোন তুলেই বললো, দেলোয়ার বলছি।

ডলি আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি ডাকি, ডলি।

ডলি বলে, বলো।

আমি বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ডলি বলে, আমার ইচ্ছে করছে এমন কিছু করি যাতে কেউ আমাকে আর দেখতে না পায়।

আমি বলি, কিন্তু তখনো আমি তোমাকে দেখতে পাবো।

ডলি বলে, কী করে পাবে?

আমি বলি, পাবো, যেমন এখন আমি দেলোয়ারকে দেখতে পাচ্ছি।

ডলি চিৎকার করে, ওই নাম তুমি আর নেবে না।

আমি সচিবকে সম্বোধন করে একটি আবেদনপত্র লিখতে বসি; লিখতে আমার ইচ্ছে করে না, আমি ব্যক্তিগত সহকারীকে ডাকি। আমি যা বলি লিখতে লিখতে সহকারী হঠাৎ থেমে যান; আমি বেশ অবাক হই।

আমি বলি, লিখছেন না কেনো?

সহকারী বলেন, স্যার, সত্যিই আপনি যাবেন না?

আমি বলি, আপনার সন্দেহ হচ্ছে কেনো?

তিনি বলেন, গেলে স্যার আপনার চার-পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতো।

আমি বলি, জানেন আমার একশো কোটি টাকা দরকার।

তিনি বলেন, জি স্যার।

আমি বলি, কিন্তু একশো কোটি টাকা কি আমি পাবো?

তিনি বলেন, জি না, স্যার।

আমি বলি, যদি একশো কোটি না পাই তাহলে চার-পাঁচ লাখ আমার দরকার নেই।

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেনো খুঁজতে থাকেন।

আমি, মনে মনে, ডলির মুখের দিকে তাকাই; তার চিবুকের এক অংশ দেখতে পাই; চোখ স্থির হয়ে আছে, গ্রীবায় একটি তিল, নাকের নিচে লোমের সামান্য আভাস দেখতে পাই; আমি দাগগুলো আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকি, ঘষে ভোলা ময়লা ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিই, উড়তে উড়তে সেগুলো কোথায় যায় আমি দেখতে পাই না, ঝলমল করে ওঠে ডলি; এবং ডলির জন্যে আমি কষ্ট পেতে থাকি। এমন কষ্ট আমি আগে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ডলি আমার স্ত্রী? স্ত্রী কাকে বলে? সারাজীবন ডলি আমার স্ত্রী থাকবে? আমি স্বামী থাকবো? আমরা একসঙ্গে ঘুমোবো, খাবো, ডলিকে শাড়ি কিনে দেবো, রিকশায় দুজন দু-দিকে তাকিয়ে থেকে বেড়াতে যাবো? ডলি মোটাগাটা হয়ে উঠতে থাকবে; ওর মুখের প্রান্তগুলো ধীরেধীরে একাকার হয়ে যাবে। ডলি মাঝেমাঝে প্রসব করবে? তারা এসে শক্ত করে তুলবে আমাদের বন্ধন; আর বিচ্ছিন্ন হতে পারবো না, যতোই আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছে হোক? ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে আমার ডলির কাছে; আমি ক্ষমা চাইতে থাকি, আমি খুব অপরাধ করেছি, গতরাতে অনেক স্বপ্ন দেখানোর কথা ছিলো আমার, তুমি জেগে জেগে অনেক স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলো, আমি কোনো স্বপ্নই সৃষ্টি করতে পারি নি; গতরাতই ছিলো তোমার একমাত্র স্বপ্নহীন রাত। দেলোয়ার তোমাকে অনেক স্বপ্ন দিতো, আমি দিতে পারি নি; আমি ক্ষমা চাই, তুমি আমাকে স্বপ্ন সৃষ্টির ইন্দ্রজাল শিখিয়ে দাও, যেমন দেলোয়ারকে শিখিয়েছিলে।

বাসায় ফিরতে আমার ঘণ্টাখানেকের মতে দেরি হয়; তিনটার মধ্যেই সাধারণত আমি ফিরি, আজ চারটে বেজে যায়।

ডলি জিজ্ঞেস করে, তুমি কি চারটেয়ই ফেরো?

আমি বলি, না।

ডলি বলে, তাহলে কটায় ফেরো?

আমি বলি, তিনটেয়।

ডলি বলে, আজ যে চারটেয় ফিরলে?

আমি বলি, আজ হেঁটে এলাম।

ডলি বলে, হেঁটে? হেঁটে কেনো?

আমি বলি, মনে হলো তোমার কাছে হেঁটে আসাই উচিত।

ডলি বলে, কেনো এমন মনে হলো?

আমি বলি, মনে হলো তীর্থে যাচ্ছি; চারদিকে পাহাড়, নদী, উঁচুনিচু পথ; মন্দির অনেক ওপরে, যদিও আমি তীর্থ মন্দির পবিত্রগৃহে বিশ্বাস করি না।

ডলি বলে, আমি তীর্থ নই, তুমি আর হেঁটে এসো না।

আমি বলি, কেনো?

ডলি বলে, তীর্থে মানুষ একবার যায়, গিয়ে কাউকে পায় না।

ডলির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় তার শরীরে কোনো দাগ নেই; কখনো দাগ ছিলো না।

ডলি বলে, আমি তীর্থ নই; আমি গৃহ, তোমার গৃহ, গৃহে থাকতে হয়, বারবার ফিরতে হয়; তীর্থ থেকেও মানুষকে গৃহে ফিরতে হয়। ডলি কথাগুলো বেশ হাল্কা করে বলছে; সে বুঝতে পারছে কথাগুলোর ওপর একটু জোর দিলেই কথাগুলোকে কোনো প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের চরণ মনে হবে।

আমিও লঘু ভঙ্গিতে বলি, গৃহ যে আমার ভালো লাগে না।

আমার কথা শুনে ডলি একটু ভয় পায়; বলে, এতো দিন তোমার গৃহ ছিলো না, তাই তোমার গৃহ ভালো লাগতো না, এখন থেকে লাগবে।

আমি বলি, লাগছে না তো।

ডলি একটু দূরে গিয়ে চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে সে কী দেখছে আমি জানি না; হয়তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, যদিও অনেক কিছু দেখতে চাচ্ছে, অন্তত একটি গৃহ দেখতে চাচ্ছে। আমি গিয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত রাখি।

আমি বলি, ডলি, তোমাকে আমি খুব সুখী করতে চাই।

ডলি আমার হাতে হাত রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে।

বাড়িতে হঠাৎ উৎসব শুরু হয়ে গেছে। ডলির আব্বাআম্মা ভাইবোনেরা শাড়ি অলঙ্কার অজস্র জিনিশপত্র নিয়ে এসেছে ডলির জন্যে, আমার জন্যেও কী সব এনেছে। আমি বিব্রত বোধ করি; আমি আমার ঘরটিতেই বসে থাকতে চাই, কিন্তু পারি না; ডলির আব্বা ড্রয়িংরুমে আমাকে ডেকেছেন। তাকে কি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হবে? মনেই পড়ে না কখনো আমি কাউকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছি কি না। আমি ঢুকতেই তিনি দাঁড়ান; মনে করেছিলেন পায়ে হাত দেবো, আশীর্বাদ করার একটি ভঙ্গিও তিনি করে উঠছিলেন, আমি দাঁড়িয়েই থাকি দেখে তিনি এক সময় বসেন, আমাকেও বসতে বলেন।

ডলির আব্বা বলেন, তোমাকে আমরা পছন্দ করি, আনিস; তোমার সাথে যদি আমাদের আগে দেখা হতো তাহলে সব কিছু অন্য রকম হতো।

আমি বলি, আমার ভালো লাগছে আপনারা আমাকে পছন্দ করেন। তবে আগে দেখা হলে আমাকে আপনাদের পছন্দ নাও হতে পারতো।

তিনি বলেন, না, না, পছন্দ হতোই; তোমাকে পছন্দ না করার কিছু নেই।

আমি বলি, আপনারা বেশ ভালো।

তিনি বলেন, ডলি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।

আমি বলি, আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছেন।

তিনি বেশ বিব্রত হন; বলেন, কেনো ভয় পাবো, কেনো ভয় পাবো? তোমার মতো ছেলের কাছ থেকে ভয় পাবো কেনো?।

আমি বলি, আপনি ভুলতে পারছেন না ডলির আগে বিয়ে হয়েছিলো।

তিনি বলেন, তা কী করে ভুলি, বাবা? তোমার সাথেই যদি ডলির প্রথম বিয়ে হতো তাহলে প্রকৃত সুখ পেতাম।

আমি বলি, তাতে এমন কি পার্থক্য ঘটতো।

ডলির আব্বা কোনো কথা খুঁজে পান না, কিন্তু তিনি প্রচুর কথা খুঁজতে থাকেন বলে মনে হয়; তাঁর কথাগুলো হয়তো ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে আছে ভেবে তিনি চারদিকে তাকাতে থাকেন, কিন্তু কোনো দিক থেকে কথারা সাড়া দেয় না। আমার উঠে যেতে ইচ্ছে করে,

তবে উঠে যেতে পারি না; দ্রলোকের দিকে আমি নিঃশব্দে তাকাই, বারবার তাকাই; আমার মনে হয় তিনি চান আমি উঠে যাই, কিন্তু আমি উঠে যেতে পারি না।

আমার ঘরে ঢোকার আগেই সেই তীব্র সুগন্ধটি আমি পাই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে না; আমি দরোজায় দাঁড়িয়ে সুতীব্র সুগন্ধ বেশ কয়েকবার ভেতরে টেনে নিই; ঢুকে দেখি ডলি অজস্র গোলাপের মতো লাল হয়ে আছে। ওই লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো একটা আকস্মিক উত্তেজনা আমি বোধ করি, কিন্তু আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি না; পরমুহূর্তে আমার মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়লেই ভালো হতো, এমন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনা হয়তো আমার শরীরে দ্বিতীয়বার দেখা দেবে না। বিছানার মাঝখানে বসে আছে ডলি, বড়ো একটি ঘোমটাও দিয়েছে; তাকে লাল আর সুগন্ধি করে তুলতে সময় লেগেছে, এজন্যেই বেলা আমাকে রাত দশটা পর্যন্ত ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখেছে। আমার ঢোকার শব্দে ডলির ঘোমটা পড়ে যায়; আমার চোখ আজো প্রথমেই তার কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ে, চিবুকের ওপর দিয়ে পড়ে। দেলোয়ারের বউকে দেখছি-এমন একটি কালো ঝিলিক আমি বোধ করি, একটু অপরাধবোধও জন্মে; পরেই আমি অনুভব করি, এ হচ্ছে ডলি, আমার বউ, যে এখন আমার দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না আমি কী করবো। আমি কি দরোজা বন্ধ করবো? ডলি কি চাচ্ছে আমি দরোজা বন্ধ করি?

আমি বলি, ডলি, দরোজা বন্ধ করবো?

ডলি সাড়া দেয় না। আমার মনে হয় ডলি চায় আমি দরোজা বন্ধ করে দিই; বেশ শব্দ করেই আমি দরোজা বন্ধ করি। আমি চেয়েছিলাম এমনভাবে বন্ধ করবো যাতে কোনো শব্দ না হয়; এতো শব্দ হওয়াতে আমিই বিস্মিত হই; ডলিও বিস্মিত হয়ে তাকায়।

আমি বলি, এতো শব্দ যে কেনো হলো!

ডলি মধুরভাবে আমার দিকে তাকায়; তার চিবুক আবার আমার চোখে পড়ে। একটি বিশাল লাল গোলাপের মতো তার শরীর থেকে তীব্র সুগন্ধ এসে আমার রক্তের ভেতরে ঢোকে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে না।

আমি বলি, সেই তীব্র সুগন্ধটি পাচ্ছি।

ডলি বলে, তোমার কি দম বন্ধ হয়ে আসছে?

আমি বলি, না; আরো তীব্র.সুগন্ধ পেতে ইচ্ছে করছে।

ডলি বলে, তুমি এতো দূরে থাকলে কী করে তীব্র সুগন্ধ বেরোবো।

আমি ডলির কাছে গিয়ে বসি, এবং বলি, হাতটি ধরি?

ডলি বলে, শুধু হাত ধরবে?

আমি বিব্রত বোধ করি; ডলির বাঁ হাতটি প্রায় ধরে ফেলেছিলাম, আমার হাতটি কেঁপে কেঁপে সরে আসে।

ডলি বলে, আমার সারা শরীর তুমি ধরো।

ডলির সারা শরীরটি আমি একবার মনে মনে ধরি, আমার বাহু উপচে শাদা, দুগ্ধধারার মতো ডলির শরীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরটাকে আমি ধরতে পারি না; ডলির শাড়ির ভেতরে মুখ গুঁজে একবার নিশ্বাস নিই; তারপর আবার ডলির মুখের দিকে তাকাই।

আমি বলি, দেলোয়ারকে আমার মনে পড়ছে।

ডলি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এ-নামের কাউকে আমি চিনি না।

আমি বলি, দেলোয়ার আমার বন্ধু ছিলো।

ডলি বলে, তোমার কোনো বন্ধুর গল্প আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বলি, কী গল্প তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

ডলি ঠোঁট দুটি বাড়িয়ে দিয়ে একটি আঙুল ঠোঁটের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত টানতে টানতে বলে, এ-দুটো সম্পর্কে তুমি গল্প বলো। আমার ভালো লাগবে, রাতভর শুনতে ইচ্ছে করবে।

আমি বলি, তোমার ছটি ঠোঁট রয়েছে।

ডলি হেসে ওঠে, আমি কি রাক্ষস যে ছটি ঠোঁট থাকবে?

আমি বলি, তুমি রাক্ষস নও, রাক্ষসদের কতোগুলো ঠোঁট থাকে আমি জানি না; কিন্তু তোমার তিন জোড়া ঠোঁট আছে-লাল, রঙিন, কোমল, গোলাপপাপড়ি।

ডলি হেসে ওঠে, হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে বলে, একটু পরই হয়তো বলবে আমার লাখ লাখ ঠোঁট আছে।

আমি বলি, তোমার এই ঠোঁট দুটিতে ময়লা লেগে ছিলো।

ডলি চমকে ওঠে, ময়লা? আমার ঠোঁটে?

আমি বলি, এখন নেই।

ডলি বলে, কখনো ছিলো না।

লাল রঙের ঠোঁটের অন্ধকার আমাকে গ্রাস করে। আমি অজস্র লাল লাল লাল লাল ঠোঁট দেখতে পাই; আমি লাখ লাখ লাল লাল দরোজা খুলে ঢুকতে থাকি, ঢুকে আরো লাল লাল অন্ধকার থেকে আরো লাল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে, যেনো অজস্র জন্ম ধরে এগোচ্ছি, আমি আর এগোতে পারি না; মহাশূন্য থেকে খসে পড়ে যাই, পিছলে পড়ে যাই; চাঁদ তারা সূর্য আর যা কিছু আছে যা কিছু নেই আমি জড়িয়ে ধরে থাকতে চাই, আমি কিছুই জড়িয়ে ধরতে পারি না, ব্যর্থ হয়ে আমি পাতালে পড়ে যেতে থাকি, পাতাল

এতো নিচুতে যে সেখানেও আমার পা ঠেকে না। মহাজগতে, আমার মনে হয়, ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নেই; এর আগে ব্যর্থতাকে আমি এমনভাবে অনুভব করি নি। ডলি আমাকে জড়িয়ে ধরে; আমি ঠেলে সরিয়ে দিই। নিজেকে আমার ক্লান্ত মনে হয় না, ব্যর্থ মনে হয়; দেলোয়ারকে মনে পড়ে, দেলোয়ার কখনো ব্যর্থ হতো না, দেলোয়ার নিশ্চয়ই সফল হয়েছিলো, এমন মনে হতে থাকে; আমার দেলোয়ার হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, গাড়ি নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমি ভয় পাই না। ডলি আমাকে আর জড়িয়ে ধরছে না; সে হয়তো এখন দেলোয়ারকে জড়িয়ে ধরে আছে; আমাকে আর ধরবে না। ডলিকে ছুঁতে ইচ্ছে করছে আমার, আমি ছুঁতে পারছি না; ডলিকে ছুঁতে গেলে হয়তো অন্য কারো শরীরে আমার শরীরে ঠেকবে, অন্য কোনো হাত আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে; ডলির ওষ্ঠ হয়তো এখন অন্য কোনো ওষ্ঠের সাথে জড়িয়ে আছে গেঁথে আছে; আমি টানলেও ডলি ওই ওষ্ঠ থেকে নিজের ওষ্ঠকে উদ্ধার করতে পারবে না; আরো বেশি করে সমর্পণ করবে। ডলির মাংসে হয়তো ঢুকে আছে অন্য কোনো মাংস; সে-মাংস আমার নয়; ডলি সে-মাংস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইবে না হয়তো। এখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে, কোনো রঙ নেই; লাল রঙটি মুছে গেছে, মহাজগতে ডলি আছে কি না তাও আমি অনুভব করতে পারছি না।

আমি ডাকি, ডলি।

ডলি সাড়া দেয়, বলো।

আমি বলি, তুমি কি আমাকে ঘেন্না করছো?

ডলি বলে, ঘেন্না করবো কেনো?

আমি বলি, তুমি কি কষ্ট পাচ্ছো?

ডলি বলে, হ্যাঁ, একটা কেমন কষ্ট লাগছে।

আমি জানতে চাই, কষ্টটা কেমন?

ডলি বলে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো।

আমি বলি, আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে?

ডলি বলে, হ্যাঁ।

আমি বলি, তোমার খুব ঘুম পাচ্ছিলো?

ডলি বলে, হ্যাঁ।

আমি বলি, তোমার কি মনে হচ্ছে ভুল করেছো?

ডলি বলে, কী ভুল?

আমি বলি, আমাকে বিয়ে করে?

ডলি বলে, আমি ওসব ভাবছি না।

আমি বলি, দেলোয়ার কি ব্যর্থ হয়েছিলো?

ডলি চুপ করে থাকে; আমি বলি, ডলি, দেলোয়ার কি ব্যর্থ হয়েছিলো?

ডলি বলে, না।

আমার ভেতরে অজস্র বজ্র আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছুটতে থাকে; কিছুতে থামে না।

আমি বলি, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

ডলি বলে, না।

আমি বলি, কী করেছিলে?

ডলি বলে, আমাকে সে খুন করেছিলো।

আমি বলি, তুমি সুখী হয়েছিলে?

ডলি বলে, দশ পনেরো দিন আমি বসতে পারি নি, দাঁড়াতে পারি নি, ঘুমোতে পারি নি; আমার শরীরটা আমার ছিলো না।

আমি বলি, দেলোয়ার সব সময়ই সফল।

ডলি কোনো কথা বলে না।

ডলিকে ডাকতে আমার সাহস হয় না; আমরা যে পাশাপাশি শুয়ে আছি, ঠিক শুয়ে নয় ঠিক পাশাপাশি নয়-একই বিছানায় পড়ে আছি, একেও আমার অস্বাভাবিক মনে হয়; আমাদের এভাবে থাকার কথা ছিলো না। বিছানা থেকে উঠে টেবিলে গিয়ে বার ইচ্ছে হয়, অনেকগুলো সিগারেট খাওয়ার ক্ষুধা জাগে; আমি উঠতে পারি না, সিগারেট খেতে পারি না; আমার ভেতরটা মরুভূমি হয়ে ওঠে। ডলির থেকে সব কিছু আমার প্রিয় মনে হয়; সব কিছুর সাথেই আমার জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, শুধু ডলিকে ছাড়া। খুব দূরে খুব বড়ো বা খুব ছোটো কোনো গাছের নিচে বসে থাকার সাধ হয়, ডালে কোনো পাখি আছে কি না খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে; মনে হয় বছরের পর বছর ধরে আমি পাখি খুঁজতে পারি; কোনো ছোটো নদীতে একটা ছোটো নৌকোয় বসে নদী পার হ'তে আমার ভালো লাগে, ঢেউয়ের দোলাগুলো আমার রক্তে দুলতে থাকে; ট্রেন থেকে পুকুরে অনেকগুলো শিশুকে সাঁতার কাটতে দেখেছিলাম, তাদের মনে করে আমি সুখ পাই; নারায়ণগঞ্জে যে-মেয়েটি ব্লাউজ খোলে নি, তার মুখটিও মনে পড়ে, আমি সুখ পাই। সব কিছুর মুখ আমার মনে পড়ে, ডলির মুখ ছাড়া; তিন চারটি রিকশাঅলার মুখ মনে পড়ে, বাসা থেকে বেরোলেই কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই, মুখগুলো মনে পড়ছে, ওদের মুখের দাগগুলো আর

ঘাগুলোও দেখতে পাচ্ছি; ডলির মুখটি দেখতে পাচ্ছি না। একটি নদীর মুখ আমার মনে পড়ে। একবার আমি গিয়েছিলাম বনের পর বন পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে ওই নদীর পারে গিয়েছিলাম; নীল দাগের মতো পড়ে আছে নদী, ছোটো ছোটো ঢেউ, নদীতে নৌকো নেই, জাহাজ নেই; শুধু নীল হয়ে পড়ে থাকাই কাজ ওই নদীর। নদী পেরিয়ে ওপাশে কেউ যায় না, ওপাশ থেকে এপাশে কেউ আসে না; নদী শুধু নীল হয়ে পড়ে থাকে। ডলির মুখটি আমার মনে পড়ে না। আমি চোখ ভরে বালুকার স্তূপ দেখতে পাই।

ডলিকে খুব সুখী করতে হবে-ডলির মুখটি বারবার মনে করতে না পেরে এবং পুনরায় মনে করার চেষ্টা করতে করতে একথা আমার মনে হয়; ভয়ঙ্কর সুখী করতে হবে, অশেষ সুখী করতে হবে, এতো সুখী যা ডলি সহ্য করতে পারবে না; আমি মানুষ, মানুষের কাজ মানুষকে সুখী করা; ডলি মানুষ, ডলি আমার নিজস্বতম মানুষ; তাকে সুখী করতে হবে; কখনো যেনো সে কষ্ট না পায়, কখনো বুঝতে না পারে আমি একটা অপরাধবোধের মধ্যে রয়েছি, ডলি অনুভব করতে না পারে প্রেতের সাথে আমি যুদ্ধ করে চলছি। আমাকে কি দেলোয়ারের সাথে যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতদিন আমি বাঁচবো, ডলি বাঁচবে? বেঁচে থেকে সুখ পাবো? আমার অপরাধবোধ উত্তরাধিকারীর রক্তে সংক্রামিত করে যাবো? কোনো উত্তরাধিকারে আমি বিশ্বাস করি না, কোনো উত্তরাধিকারী চাই না; আমি কোনো অপরাধীকে রেখে যেতে চাই না। ডলি কি মেনে নেবে? একটি দুটি উত্তরাধিকারীর জন্যে ডলি পাগল হয়ে উঠবে না? তার ভেতর কি একটা মারাত্মক মা জেগে উঠবে না? আমি কোনো পুত্র চাই না, কন্যা চাই না; পুত্রকন্যাকে জড়িয়ে ধরতে চাই না। পাশের বাসায় একটি নতুন পুত্র জন্মেছে বোধ হয়, ওর চিৎকার আমার কানে লাগে; কর্কশ মনে হয়। আমি কখনো কোনো শিশু কোলে নিই নি; আমি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাবো না। ডলিকে সুখী

করতে হবে। কীভাবে সুখী করতে হয়? ডলি কিসে সুখী হবে? ডলি এখন কী ভাবছে? ডলি কি আমাকে সুখী করার কথা ভাবছে? আমরা কেউ কি সুখী করতে পারি কাউকে? আমি ডলিকে, ডলি আমাকে? আমি যে এতোদিন বেঁচে আছি, এটা কি সুখ? সুখ কি মানুষের জন্যে দরকার? দেলোয়ার কি সুখে ছিলো, ডলি কি দেলোয়ারকে সুখী করেছিলো? দেলোয়ার ডলিকে? আমার বাবা মা কি সুখী? ডলির বাবা মা? মানুষ কি কখনো সুখী হয়েছে। কিন্তু ডলিকে সুখী করতে হবে। ডলি সুখী না হলে মনে হবে দেলোয়ার নিশ্চয়ই সুখী করতে পারতো ডলিকে; আমি পারছি না।

ভোরবেলা ডলির দিকে আমি চায়ের পেয়ালাটি এগিয়ে দিই।

ডলি অনেকটা চিৎকার করে ওঠে, করছো কী, করছে কী? আমি তোমাকে চা করে দিচ্ছি।

আমি বলি, দেখো তো চিনি ঠিক হয়েছে কি না?

ডলি পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ঝলমল করে ওঠে, তুমি এতো চমৎকার চা বানাতে পারো।

ডলির কী যেনো মনে পড়ে; বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এক পেয়ালা চা বানিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি বলি, আমি তো নিজেই বানাতাম।

ডলি বলে, তুমি আমাকে চা বানিয়ে দেবে, নিজে বানিয়ে খাবে; শুনলে সবাই কী বলবে?

আমি বলি, সবার কী বলার ভয়েই তুমি চা বানালে?

ডলি উত্তর দেয় না; বরং নিজেই প্রশ্ন করে, আমার জন্যে তুমি কেনো চা বানালে, বলো তো?

আমি অপরাধীর মতো বলি, তোমাকে সুখী করতে চাই।

ডলি হাসে, কেনো সুখী করতে চাও?

আমি বলি, আমার অনেক অপরাধ।

ডলি বলে, তোমার কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ আমার।

আমি বলি, না; তুমি অপরাধ করতে পারো না।

ডলি বলে, আমি চেয়েছিলাম দেলোয়ারের গাড়িটা পানিতে পড়ে যাক।

আমি বলি, আমাকে সুখী করার জন্যে তুমি এটা বানিয়ে বললে।

ডলি বলে, দেলোয়ারের গাড়ি পানিতে পড়লে তুমি কেনো সুখী হবে? বন্ধুর গাড়ি পানিতে পড়লে কেউ সুখী হয় না।

আমি বলি, হয়তো আমি হই।

ডলি বলে, আমার তা মনে হয় না।

আমি বলি, আমাকে কি সুখী মনে হচ্ছে না?

ডলি কোনো উত্তর দেয় না, আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বলি, চা খাও।

ডলি বলে, চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বলি, কেনো?

ডলি বলে, জানি না।

আমি বলি, আমি বোধ হয় জানি।

ডলি চুপ করে থাকে; আমি চা খাই, সিগারেট ধরাই; চা আর সিগারেট দুটিই আমার ভালো লাগে।

আমি যে আগে খুব অনিয়মিত ছিলাম বাসায় ফেরার ব্যাপারে, এমন নয়; ঠিকঠাক সময়েই আমি বাসায় ফিরেছি এতোদিন, বেরিয়েছিও ঠিকঠাক সময়ে; কিন্তু এখন থেকে আমি আরো নিয়মিত হয়ে উঠতে থাকি। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না কেনো সব কিছু আমি এতো ঠিকঠাকভাবে করছি। বেলা এ নিয়ে কয়েকবার পরিহাসও করে, আমি তাতে কান দিই না। আমিই বিস্মিত হই আমার নিখুঁত আচরণে, আমার অসম্ভব মানবিকতায়।

ডলি একদিন বলে, তুমি খুব চমৎকার।

আমি জানতে চাই, কেনো এমন মনে হচ্ছে?

ডলি বলে, তোমাকে নিয়ে একটুও চিন্তায় থাকতে হয় না; ঠিক সময়ে তুমি ফেরো, ঠিক সময়ে বাইরে যাও।

আমি বলি, মাঝেমাঝে তো আমার দেরি হয়।

ডলি বলে, দেরি হলেও তুমি টেলিফোনে জানিয়ে দাও।

আমি বলি, এখন থেকে দেরি করে ফিরবো, দেরি হলেও জানাবো না।

ডলি বলে, না, না; দেরি কোরো না, দেরি হলে জানাবেই।

বাসায় ফেরার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আমার কাছে; আমি বুঝতে চেষ্টা করি কেনো আমি এতো নিয়মিত দেলোয়ার কি সময় মতো ফিরতো। আমি জানি না। দেলোয়ারের ব্যবসা ছিলো; যারা ব্যবসা করে, তাদের একটি বড়ো স্বাধীনতা থাকে, ঠিক সময়ে তাদের ফিরতে হয় না; ঠিক সময়ে ফিরলেই সবাই মনে করে তাদের ব্যবসা জমছে না; দেরি করে বা মাঝরাতে বা কখনো কখনো না ফিরলে সবাই মনে করে তাদের ব্যবসা এতো জমছে যে বাসায় ফেরার মতো সময়ও তারা পাচ্ছে না; যখন তারা বাসায় ফেরে সবাই তাদের মুখের দিকে তাকায় যেনো তারা বীরের মুখ দেখছে। দেলোয়ার কি দেরি করে ফিরতো? মাঝেমাঝে ফিরতো না? ডলিকে জিজ্ঞেস করে দেখবো? জিজ্ঞেস করাটা কি ঠিক হবে? আমি যা করি, তাতে দেরি করার সুযোগ খুব কম। আমার মনে হয় দেলোয়ার দেরি করে ফিরতো না; তার বাসায় ডলি ছিলো, বাসায় ডলি থাকলে দেলোয়ার দেরি করে ফিরতে পারে না। আমি কি ডলির জন্যে ঠিক সময়ে ফিরি? আমি ফিরলে ডলির মুখটি উজ্জ্বল দেখায়, ওই উজ্জ্বলতা আমার ভালো লাগে; কিন্তু আমি উজ্জ্বলতার জন্যে ফিরি না, ফিরি দেলোয়ারের জন্যে; দেলোয়ারের আগে আমাকে অবশ্যই বাসায় ফিরতে হবে। দেলোয়ার একশো মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে, একটার পর একটা গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে; রিকশা এড়িয়ে, ট্রাক-বাস বেবির জট পেরিয়ে, লালবাতির নিষেধ না মেনে ছুটে চলছে ডলির দিকে; আমাকে তারও আগে ডলির কাছে পৌঁছোত হবে। আমি কি ডলির জন্যে প্রবল আবেগ বোধ করি? ভাবতেও আমি ভয় পাই। যদি দেখতে পাই ডলির জন্যে আমি আবেগ বোধ করি না, আমি তা সহ্য করে উঠতে পারবো না হয়তো; দেলোয়ার নিশ্চয়ই প্রবল আবেগ বোধ করতো। আমার আবেগ দেলোয়ারের আবেগের থেকে কম হলে আমি খুব অপরাধ বোধ করতে থাকবো। আমি তাই আবেগের কথা ভাবি না, ডলির কথা ভাবি; ডলি আছে, তাই আমার ভেতরে নিশ্চয়ই আবেগ আছে ডলির জন্যে, আমি এমন ভাবতে চেষ্টা করি। একবার মনে হয় ডলির জন্যে সম্ভবত আমি কোনো আবেগ বোধ করি না;

ডলিকে যদি আর কোনোদিন নাও দেখতে পাই তাহলেও আমার ভেতরে তার জন্যে কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হবে না। মনে হবে না আমি কিছু হারিয়ে ফেলেছি। ডলি কখনো কখনো খুব আবেগকাতর হয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে, তখন তার শরীর ঝরনার মতো বইতে থাকে; আমি ওই মুহূর্তে খুব আবেগ বোধ করার চেষ্টা করি, ডলির মতোই প্রবাহিত হতে চাই; কিন্তু পারি না। ডলি তা বুঝতে পারে না; পারে না বলে আমার ভালো লাগে; তারপরই আমার মনে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে, আমার খারাপ লাগে যে ডলির জন্যে আমি আবেগ বোধ করছি না।

ডলি কখনো কখনো বলে, তুমি কিছু ভাবছো?

আমি বলি, না তো।

ডলি বলে, আমার মনে হচ্ছে ভাবছো।

আমি বলি, কী ভাবছি সেটাও তুমি বলো।

ডলি বলে, অতোটা পারবো না।

আমি বলি, তোমার কি সব সময় আমার মনের কথা জানতে ইচ্ছে করে?

ডলি বলে, আমার মনের কথা জানতে তোমার ইচ্ছে করে না?

আমি বলি, না তো।

ডলি বলে, অ।

আমি বলি, যদি বলতাম 'হ্যাঁ' তাহলে কি তুমি সুখী হতে?

ডলি বলে, মিথ্যে শুনে কেউ সুখী হয় না।

আমি বলি, আমি যতো সুখ পেয়েছি তার অধিকাংশই মিথ্যে থেকে।

ডলি বলে, তুমি কি এখন সুখ পাচ্ছো না? আমার জড়িয়ে ধরা, আমার ভালোবাসা কি মিথ্যে?

আমি বলি, সুখ পাচ্ছি কি না বুঝতে পারছি না।

ডলি বলে, তার মানে তুমি সুখ পাচ্ছো না।

আমি বলি, পাচ্ছি কি না বুঝতে পারছি না।

ডলি বলে, কেনো বুঝতে পারছো না? তোমার শরীর নেই, মন নেই?

আমি বলি, তুমি কি সুখ পাচ্ছো?

ডলি বলে, হ্যাঁ, পাচ্ছি।

আমি বলি, যদি বলি আমি তোমাকে মিথ্যে জড়িয়ে ধরে আছি?

ডলি কোনো কথা বলে না।

একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা-ডলি আর আমি। ডলিই প্রস্তাব দিয়েছিলো; আমার যদিও বেড়ানোর কোনোই আগ্রহ নেই, সিন্ধু বা শিশিরবিন্দু দেখার কোনোই ব্যাকুলতা কখনোই আমি বোধ করি নি–এজন্যেও আমার একটা গোপন অপরাধবোধ রয়েছে,–আমি রাজি হয়েছিলাম। ডলি সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলো, আমিও তার সাথে সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলাম। আমার কাছে সমুদ্র দেখাটা দায়িত্ব বলে মনে হয়েছিলো ডলি কি আগে সমুদ্র দেখেছিলো? আমি জানতে চাই নি; মনে হয়েছিলো ডলি সমুদ্র দেখেছে, আর আমি যদি তাকে অন্তত একবার সমুদ্র না দেখাই, সে চিরকাল একটা দীর্ঘশ্বাস পুষবে। ডলির কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ডলি আমাকে সমুদ্র দেখিয়েছিলো, নইলে আমার সমুদ্র দেখা হতো না। সমুদ্র দেখে, আমি মনে করেছিলাম, আমি খুব বিচলিত চঞ্চল হয়ে উঠবো, কিন্তু আমি ততোখানি চঞ্চল বিচলিত হচ্ছিলাম না; আমাদের চারপাশে যারা খুব চঞ্চল হয়ে পড়ছিলো, যতোটা চঞ্চল হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব তার চেয়ে বেশি চঞ্চল হওয়ার চেষ্টা করছিলো, তারা সদ্রপারের নুড়ি আর কাকড়া হ'তে চাচ্ছিলো; আমার মনে হচ্ছিলো নুড়ি আর কাকড়া তারা কখনো হতে পারবে না। ডলি আমাকে জড়িয়ে ধরে নোনাজলে গড়িয়ে পড়ছিলো, ডলির চঞ্চলতায় বিব্রত বোধ করছিলাম আমি। ডলির মতো গড়িয়ে পড়তে পারছিলাম না বলে ডলি আমাকে ভীতু মনে করছিলো; ভীতু মনে করে সুখ পাচ্ছিলো।

ডলি বলছিলো, তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেনো?

আমি বলছিলাম, একটুও ভয় পাচ্ছি না।

ডলি বলছিলো, চলো আরো সমুদ্রের দিকে যাই।

আমি বলছিলাম, কতো দূরে তুমি যেতে চাও?

ডলি বলছিলো, যতো দূরে তুমি আমাকে নিতে চাও।

আমি বলছিলাম, আমি এখানেই থাকতে চাই।

ডলি বলছিলো, কেনো?

আমি বলছিলাম, ভয়ঙ্কর কোনো ঢেউ আসতে পারে।

ডলি বলছিলো, আসুক।

আমি বলছিলাম, দেলোয়ারকে জড়িয়ে ধরে তুমি কি আরো সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলে?

ডলি বলছিলো, আহ্, আবার দেলোয়ার।

আমি বলছিলাম, তুমি কি কিছু মনে রাখো না?

ডলি বলে, রাখি, যা মনে রাখার।

ডলি আমাকে জড়িয়ে ধরে নোনাজলে গড়িয়ে পড়ে, নিজেকে আমার দেলোয়ার মনে হয়। কোনো দিন কি আমি ডলির বদলে অন্য কাউকে জড়িয়ে ধরে এই নোনাজলে গড়িয়ে পড়বো? তখন আমার কী মনে পড়বে? আমার ভয় হতে থাকে একটা মারাত্মক ঢেউ এসে আমাকে গভীর সমুদ্রের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, আমি ডলিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। ডলি খুব সুখী হয়ে ওঠে।

ডলি বলে, সমুদ্রের পানিতে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে কী যে সুখ লাগছে।

আমি বলি, শয্যার থেকেও বেশি? ডলি বলে, কী যে বলো।

ডলি খুব উল্লসিত, সে সমুদ্রের নুড়ি আর লাল কাকড়ায় পরিণত হয়ে গেছে তার উল্লাস দেখে আমার সুখ লাগছে, এবং মনে হচ্ছে ডলি একটু বেশি সুখী বোধ করার চেষ্টা করছে।

আমি বলি, ডলি, তুমি একটু বেশি সুখী বোধ করছো।

ডলি বলে, আমি তো বেশি সুখীই।

আমি বলি, আমার তা মনে হয় না।

ডলি বলে, তোমার কী মনে হয়?

আমি বলি, সমুদ্রের জলে তুমি কিছু একটা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছো।

ডলি বলে, তুমি আমাকে গভীর সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দাও।

আমি বলি, আমি কি এত নিষ্ঠুর?

ডলি বলে, তুমি যা বলছে তার চেয়ে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিলেও আমি কম কষ্ট পাব।

এমন সময় একটি ঢেউ আসে। ঢেউয়ের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আর প্রস্তুত থাকার জন্যে ডলি সমুদ্রে আসে নি; তার হয়তো ধারণা সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে তারই জন্যে, তারই গড়িয়ে পড়ার জন্যে; এমন কোনো ঢেউ আসতে পারে না, যা তাকে গভীর সমুদ্রে টেনে নিতে পারে। নোনাজলের আকস্মিক আক্রমণে আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি, কিন্তু পা দুটি আমি মাটিতে অলৌকিকভাবে ঢুকিয়ে দিই, এবং ডলিও আমার ওপরে এসে পড়ে। ডলি আমাকে ধরার চেষ্টা করে, ধরে উঠতে পারে না; আমিই তার একটি হাত ধরে ফেলি। ডলির হাতটি আমি ছেড়ে দিতে পারতাম, ডলির হাত খসে যেতে পারতো আমার হাত থেকে তার কোনোটিই হয় নি। ঢেউটি আমাদের দুজনকেই প্লাবিত করে দেয়, এবং অল্পপরেই সমুদ্রের দিকে টানতে থাকে। আমি তখন আমার পা দুটি আরো শক্তভাবে মাটিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ডলিরও হাত দুটি শক্তভাবে ধরেছি। ডলি আমাকে ধরেছে বলে

মনে হয় না; হয়তো তার ধরার কথাই মনে হয় নি ঢেউটি টান দেয়, আমার ইচ্ছে হয় ডলিকে ছেড়ে দিই, কিন্তু তখনই আমার ভেতরে অপরাধবোধটা জেগে ওঠে, আমার সাথে সেদিন বেবিতে না উঠলে ডলি আজ সমুদ্রে ভেসে যেতো না, সে শহরে থাকতো, আমি তার হাত দুটি শক্তভাবে ধরে রাখি; এমন শক্তভাবে কখনো কিছু আমার ধরতে হয় নি। ডলি কি সাঁতার জানে? নিশ্চয়ই জানে না। ডলির এখন কী মনে হচ্ছে তার কি সমুদ্রে ভেসে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে? ডলি আমার হাত ধরে নেই, আমিই ধরে আছি ডলির হাত; মনে হচ্ছে সমুদ্রে ভেসে যেতে তার ভালোই লাগবে। কিন্তু আমি তাকে ভেসে যেতে দিতে পারি না। আমি সমুদ্রে একটি নারীকে নিয়ে নেমেছিলাম; জোয়ার আসার কথাও আমি জানতাম; সবাই তাদের নারীদের নিয়ে ওপরে উঠে গেছে, শুধু আমিই আমার নারীকে ঢেউয়ের হাতে তুলে দিয়ে উঠে আসবো? আমার খুব নিঃসঙ্গ লাগবে। আমি ডলির হাত ধরে থাকি। আমার পা বালুর ভেতর থেকে উঠে আসে; সাঁতার দিয়ে সমুদ্রকে আমি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকি। ডলি আমাকে ধরে নেই, ধরার কথাও হয়তো তার মনে নেই; তাকে ধরে রাখার দায়িত্ব আমার, সে হয়তো তাই মনে করছে, আমি তাকে ধরে রাখছি। ডলি, তোমাকে আমি ধরে আছি, যদি তুমি ছুটে যাও, মনে কোরো না আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, আমি তোমাকে ছেড়ে দিই নি, আমার মনে হতে থাকে, পারলে তোমাকে আমি জড়িয়ে ধরে রাখতাম, চুমো খেতাম, সঙ্গম করতাম, আমার মনে হতে থাকে, তুমি সমুদ্রের না আমার জানি না, সমুদ্র তোমাকে নিয়ে গেলেও তুমি মনে কোরো না আমি তোমাকে সমুদ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেউটি কেটে যায়, আমি ডলিকে জড়িয়ে ধরে পারে এসে এলিয়ে পড়ি।

ডলিকে আজ আমি বাঁচিয়েছি, বলতে পারি, যেমন অনেকেই বলছে। লোকজন ভিড় করে প্রশংসা করছে, আমি কে জানতে চাচ্ছে; কেউ কেউ ডলির দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে,

বুঝতে পারছি তারা এমন একটি নারীকে বাঁচাতে পারলে ধন্য বোধ করতে। আমি কি ধন্য বোধ করছি? ডলির সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ ঝলমল করছে, আমাকে হয়তো ঈর্ষাও করছে। আমি ধন্য বোধ করছি না, অর্থাৎ ধন্য বোধ করার মতো কিছু বোধ করছি না; ডলি সমুদ্রে ভেসে গেলেও আমি কষ্ট বোধ করতাম না–এটা নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারছি না, আমার এখন এমনই মনে হচ্ছে। কেনো বাঁচালাম তাহলে? ডলি তো বাঁচার জন্যে আমার কাছে প্রার্থনা করে নি। আমি কি তখন দেলোয়ারকে দেখতে পাচ্ছিলাম? আমার কি মনে হচ্ছিলো দেলোয়ার ডলিকে সমুদ্রে ভেসে যেতে দিতো না? দেলোয়ার নিজে ভেসে যেতে, ডলিকে ভেসে যেতে দিতো না? সমুদ্রকে আমার দেলোয়ার মনে হচ্ছিলো? দেলোয়ার সদ্র হয়ে ডলিকে কেড়ে নিচ্ছে আমার থেকে; আমি যে ডলির সাথে আছি, ডলি যে আমার সাথে আছে, ডলি যে আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমরা যে মিলিত হই, দেলোয়ার তা সহ্য করতে পারছে না, এটা কি আমার মনে হচ্ছিলো? না কি আমি ভয় পাচ্ছিলাম সবাই আমাকে অপরাধী মনে করবে? মনে করবে আমি ইচ্ছে করেই ডলিকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি। অপরাধীর মতো আমি ঢাকা ফিরে যেতে পারবো না? ডলিকে কি আমি বাঁচিয়েছি নিজেকে। বাঁচানোর জন্যে? ডলি সমুদ্রের দিকে ভেসে গেলে আমাকেও সাথে সাথে ভেসে যেতে হতো? আমার একা ফিরে আসা কেউ পছন্দ করতো না। আমি বাঁচতে চেয়েছি বলেই বাঁচিয়েছি ডলিকে? আমি সভ্য মানুষ, আমার দায়িত্ব প্রথম নারীকে বাঁচানো; সবার শেষে নিজেকে বাঁচানো, নিজেকে না বাঁচালেও চলে। আজ যদি আমি নিজে না বেঁচে ডলিকে বাঁচাতাম, তাহলে সভ্যতার পুস্তকে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হতো। সভ্যতার কথা আমার মনে ছিলো না, কেনো আমি তাহলে সমুদ্রের থাবা থেকে ডলিকে ফিরিয়ে আনলাম।

হোটেলে ফিরে ডলি বলে, আজ বুঝেছি তুমি আমাকে কতো ভালোবাসো।

আমি কোনো কথা বলি না।

ডলি বলে, আব্বাও হয়তো আমাকে এভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করতো না।

আমি বলি, বাঁচানো আর ভালোবাসার মধ্যে সম্পর্ক নেই।

ডলি বলে, অবশ্যই আছে; তুমিও আমার সাথে সমুদ্রে ভেসে যেতে পারতে।

আমি বলি, হ্যাঁ, পারতাম।

ডলি বলে, ভালো না বাসলে উদ্ধার করলে কেনো?

আমি বলি, উদ্ধারকারীরা ভালোবাসে বলে উদ্ধার করে না।

ডলি বলে, তুমি কি শুধুই আমার উদ্ধারকারী?

আমি কোনো কথা বলি না, ডলিও চুপ করে থাকে; আমার শরীর থেকে তার হাত দুটি খসে পড়ে। ডলির হাত দুটি আমার ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ধরতে পারি না।

বছর দুয়েক কেটে গেছে; আমার মনেই পড়ে নি বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছু করার আছে। বেশ তো ভালোই বেঁচে আছি; ডলি দিন দিন আরো সুন্দর আর মাংসল হচ্ছে; সে পিল

খাচ্ছে, আমি রাবার পরছি; আমি চেষ্টা করে চলছি যাতে ডলি কষ্ট না পায়, ডলি চেষ্টা করে চলছে যাতে আমি সুখ পাই। ডলির আশ্চর্য প্রতিভা আছে কষ্ট না পাওয়ার।

ডলি একদিন বলে, একটি কথা বলবো?

আমি বলি, বলো।

ডলি বলে, আমাদের কি একটিও ছেলেমেয়ে লাগবে না?

আমি বলি, ছেলেমেয়ের কথা আমার মনেই পড়ে নি।

ডলি বলে, মনে পড়ে নি তা ঠিক নয়।

আমি বলি, মানে?

ডলি বলে, তোমার খুবই মনে পড়ে।

আমি অবাক হই, বলি, আমার মনে পড়ে অথচ আমিই জানি না?

ডলি বলে, আমি বুঝি তোমার খুবই মনে পড়ে।

আমি বলি, কী করে বোঝো?

ডলি বলে, না-হওয়ার জন্যে তুমি যে-যত্ন নাও, তাতেই বুঝতে পারি।

আমি বলি, আমি কি না-হওয়ার জন্যে বেশি যত্ন নিই?

ডলি বলে, হ্যাঁ।

আমি বলি, তোমার ভালো লাগে না?

ডলি বলে, মাঝেমাঝে আমি কল্পনা করি তোমার রাবার ছিঁড়েফেড়ে গেছে, আমার পেটে একটা বাচ্চা এসেছে।

আমি বলি, পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে।

ডলি বলে, তাতে আমাদের কী? তারা আমার পেটের নয়।

আমি বলি, তোমার পেটে তো ও-রকম মানুষই হবে।

ডলি বলে, আমি আমার পেটের মানুষ চাই।

আমি বলি, ইচ্ছে করলে তুমি পেটে মানুষ নিতে পারো, দুটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি...।

ডলি চিৎকার করে ওঠে, তুমি কি আমাকে এমন ভেবেছো? অন্যের বাচ্চা আমি পেটে নেবো?

আমি বলি, অন্যের কেনো? তোমার।

ডলি বলে, আমি শুধু আমার বাচ্চা পেটে নিতে চাই না, তোমার বাচ্চা পেটে নিতে চাই।

আমি বলি, আমার বাচ্চা নেয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো মহিমা নেই।

ডলি বলে, আমি তোমরা বউ, তোমার বাচ্চাই তো আমি পেটে নেবো।

আমি বলি, হতে পারে জন্ম দেয়ার শক্তি আমার নেই।

ডলি বলে, খুবই আছে, তুমি ওই রাবারগুলো বিদেয় করো।

আমি বলি, আমি কোনো বাচ্চা চাই না।

ডলি বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে, তুমি মানুষ নও।

হয়তো আমি মানুষ নই; মানুষ হলে মানুষ জন্ম দিতে হয়; কিন্তু সত্যিই আমি বুঝে উঠতে পারি না মানুষ জন্ম দিয়ে কী সুখ? ধরা যাক আমি রাবারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ডলি পিলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো–অনেক আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তারপর ডলিকে অনেক

মাস প্যাড পরতে হলো না; মানুষ আসবে বলে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ডলিকে আমি সপ্তাহে সপ্তাহে গাইনির কাছে নিয়ে যেতে থাকলাম, গাইনিটা তাকে দেখতে থাকলো, কী দেখলো আমি জানি না, ডলির জন্যে নানা ধরনের টেবলেট কিনলাম, পরীক্ষার পর পরীক্ষা করালাম; তাতে সুখ কোথায়? মানুষ জন্ম দিচ্ছি ভেবে আমি সুখ পেতে থাকবো? ডলি খুব ভয়ঙ্কর কল্পনা করতে পারে বলে মনে হচ্ছে; সে কল্পনা করছে রাবার ছিঁড়েফেড়ে যাচ্ছে; ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে আমার, সূর্যটা হঠাৎ ছুটে আসতে থাকলে যেমন লাগবে; আমাকে সাবধান হতে হবে, সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। সাবধান হতে হবে, লোহার থেকে শক্ত রাবার পরতে হবে। নারায়ণগঞ্জে তো আমি রাবার পরি নি, সেখানে কি আমি কোনো মানুষ সৃষ্টি করে এসেছিলাম? যদি সৃষ্টি করে এসে থাকি? সে-মানুষটা আমার নয়? সেটা এখন কোনো ড্রেনের পাশে ভিক্ষে করছে? যদি মেয়ে হয়? তার মায়ের পেশা শিখছে? না, ডলির পেটে আমি কোনো মানুষ সৃষ্টি করতে চাই না। কারো পেটেই আমি মানুষ সৃষ্টি করতে চাই না। মানুষকে আমি কি ঘেন্না করি? কখনো ভেবে দেখি নি। মানুষ প্রজাতিটিকে টিকিয়ে রাখার একটা দায়িত্ব আছে আমার রক্তে আমি তেমন কোনো সংকেত পাই নি। ডলি হয়তো পাচ্ছে। প্রকৃতি আর সভ্যতা হয়তো তার রক্তে বেজে চলছে; তাকে নির্দেশ দিয়ে চলছে মানুষ বানানোর। তার ভেতরে মানুষ তৈরি হচ্ছে না বলে সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করছে? সে সফল হতে পারে ভেতরে একটির পর একটি মানুষ সৃষ্টি করে? সভ্যতাকে দেখিয়ে দিতে পারে সে পাথর নয়, মরুভূমি নয়, নারী; তার ভেতরে উর্বর পলি রয়েছে; বীজ বুনলেই সেখানে সোনালি ধানের উৎসব শুরু হয়? পলিমাটিতে বীজ বুনবো আমি? আমার ইচ্ছে করে না। মানুষ তৈরি করার কথা ভেবে আমি কোনো সুখ পাই না।

আমি একটি স্বপ্ন দেখি, অনেকটা দুঃস্বপ্নই; তবে দেখে চিৎকার করে ডলিকে আমি জড়িয়ে ধরি নি। কে যেনো আমার হাতে একটি লাল বেলুন এনে দিয়েছে, সেটি ফোলাচ্ছি আমি,

খুব আনন্দ পাচ্ছি; ফুঁ দিচ্ছি, আমার মুখ থেকে বাতাসের থেকে লালা বেশি ঢুকছে বেলুনে, আমি যতোই বাতাস ঢোকাতে চাচ্ছি ততোই লালায় ভরে উঠছে বেলুন; ফুলতে ফুলতে একটা কুমড়োর মতো হয়ে উঠছে, খুব ভারী হয়ে উঠছে। আমি ফুঁ দিতেই থাকি, বেলুনটি লালায় ভরে উঠতে থাকে, আমি উড়োতে চাই, বেলুনটি ওড়ে না; এলিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বেলুনটি একটা উড়োজাহাজের সমান হয়ে উঠেছে, লালাভর্তি উড়োজাহাজ; শক্ত রশি দিয়ে আমি বেলুনটির গলা বেঁধে ফেলি। বেঁধে ফেলার পরই আমি লাখ লাখ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পাই। খুব সরু আর মসৃণ চিৎকার; উল্লাসের না আতঙ্কের প্রথমে আমি বুঝতে পারি না। একেকবার আমার কাছে উল্লাস মনে হয়, একেকবার মনে হয় আর্তনাদ। ওই চিল্কারে আমার কান ভরে ওঠে, খোঁচা দিয়ে আমি বেলুন ফাটিয়ে দিই; আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপরও আমি উল্লাস আর আতঙ্কের কোলাহল শুনতে পাই; মনে হয় লালার স্রোতের নিচে আমি তলিয়ে যাচ্ছি, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি চিৎকার করে উঠি নি, ডলি বুঝতেও পারে নি যে আমি একটি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

কয়েক দিন পর ডলি তার একরাশ স্বপ্নের কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি আমার পুরোনো-হয়ে-যাওয়া দুঃস্বপ্নটি বলি; শুনে ডলি খুশি হয়।

ডলি বলে, ওগুলো হচ্ছে আমাদের শিশুদের চিৎকার।

আমি বলি, তুমি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে পারো?

ডলি বলে, এটা খুব সহজ স্বপ্ন–তোমার রাবারে আটকে পড়ে আমাদের শিশুরা চিৎকার করছে; তুমি রাবারগুলো ফেলে দাও।

আমি বলি, তারপর কী করব?

ডলি বলে, আমাকে শিশু দাও।

আমি বলি, ভাবতেও আমার ভালো লাগে না।

ডলি বলে, তুমি বুঝতে পারছে না তোমার মন তোমাকে বলছে শিশুদের মেরো না?

আমি বলি, লাখ লাখ শিশু তুমি পেটে নিতে পারবে?

ডলি বলে, লাখ লাখ কেনো? একটি দুটো।

আমি বলি, আমি তো লাখ লাখ শিশুর চিৎকার শুনেছি।

ডলি বলে, আমি একটি দুটো শিশু চাই।

আমি বলি, চলো, কাল কোনো অনাথ আশ্রমে যাই।

ডলি বলে, অনাথ আশ্রমে কেনো?

আমি বলি, একটি শিশু আমরা অ্যাডোপ্ট করবো।

ডলি চিৎকার করে, না, না, না।

আমি বলি, তুমি তো শিশু ভালোবাসো, ওরাও শিশু।

ডলি বলে, আমি আমার শিশু চাই, আমার শিশুকে ভালোবাসতে চাই।

আমি বলি, মনে করো তুমি বন্ধ্যা।

ডলি ভয় পায়, চিৎকার করে, না, না, আমি বন্ধ্যা নই।

আমি বলি, মনে করো আমি বন্ধ্যা।

ডলি চমকে ওঠে, আমার দিকে কঠোরভাবে তাকায়, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডলিকে কি আমি গর্ভবতী করবো? অন্তত একবার উদ্যোগ নেবো? ফেলে দেবো। প্রতিরোধকগুলো মানুষের বিরুদ্ধে আমি কাজ করে চলছি? অমানবিক আমি? আমার দায়িত্ব কিছু মানুষ জন্ম দিয়ে যাওয়া? পিতা-পিতামহদের মতো মানবিক হওয়া? গর্ভবতী করবো ডলিকে। কিন্তু গর্ভবতী নারী দেখতে আমার ভালো লাগে না, কখনো ভালো লাগে নি; মাকে গর্ভবতী দেখেই আমার ভালো লাগে নি। সিক্সে পড়ার সময় শুনতে পাই মার বাচ্চা হবে, শুনেই আমার ঘেন্না লাগে। কেউ আমাকে সংবাদটি দেয় নি, তবে সকলের মুখ থেকে আমি সংবাদটি পেয়ে যাই; একদিন আমার ইস্কুল থেকে ফিরতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয়

ইস্কুলের কোনো ঘরে লুকিয়ে থাকি। লুকোনোর জন্যে একটি ঘরে গিয়ে ঢুকি আমি, বুড়ো দপ্তরি আমাকে দেখে মনে করে আমি হয়তো কিছু হারিয়ে ফেলেছি। সে আমার কাছে এসে জানতে চায় আমি কী হারিয়েছি, কী খুঁজছি; আমি তাকে কিছু বলি না, বেঞ্চের নিচে সে আমার পেন্সিল বা কলম বা অন্য কিছু খুঁজতে শুরু করে। তার খোঁজা দেখে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমি বলতে পারি না। আমার কিছু হারায় নি, আমি লুকিয়ে থাকার জন্যে এ-ঘরে ঢুকেছিলাম। আমি কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, দপ্তরি বলতে থাকে পেলে সে পরদিন আমাকে জিনিশটি ক্লাশে গিয়ে দিয়ে আসবে। আমি মনে মনে বলি, দপ্তরি, আমার হারানো জিনিশ তুমি কোনোদিন খুঁজে পাবে না। আমি কী হারিয়েছিলাম? মাকে অপবিত্র মনে হচ্ছিলো। আমার আমি হারিয়ে ছেলেছিলাম মার পবিত্রতা? কিছুদিন পর দেখতে পাই মা আর ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না; কলসি থেকে পানিও ঢেলে খেতে পারছে না। মার সামনের নিচের দিকটি খুব ফুলে উঠেছে, চোখ দুটি ব'সে গেছে; হাঁটার সময় মা এমনভাবে চলছে যেনো গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে। আমি দূর থেকে মার পা ফেলা দেখে মার জন্যে দুঃখ পেতাম; মা যেনো একবার তার সম্পূর্ণ একটি পা তুলে বিশ্রাম নিচ্ছে, তারপর পা ফেলছে; আবার বিশ্রাম নিয়ে আরেকটি সম্পূর্ণ পা তুলছে, তুলে বিশ্রাম নিচ্ছে, তারপর পাটি ফেলছে। বাবাকে তখন বাড়িতে দেখতেই পেতাম না; তাঁর কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো তখন, অনেক রাতে তিনি বাড়ি ফিরতেন। বাড়িতে থাকতাম আমি আর মা। মাকে আমি দূর থেকে সারাক্ষণ দেখতাম। মা কলসি থেকে পানি ঢেলেও খেতে পারতো না; তাই আমাকে ডাকতো। পানি ঢেলে দিতে আমার ইচ্ছে করতো না, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে আমি পানি ঢেলে দিতাম; মা আমার দৌড়ে আসা দেখে খুব সুখ পেতো; আমার বলতে ইচ্ছে করতো, পানি ঢেলে দিতে আসতে আমার ইচ্ছে করে না; তবে আমি বলতে পারতাম না। মা খুব শব্দ করে পানি খেতো, শব্দ শুনে আমার ঘেন্না লাগতো–আগে

তো মা শব্দ করে পানি খেতো না; আবার আরেক গেলাশ পানি চাইতো, তার পানি খাওয়ার ঢকঢক শব্দ শুনে আমার শরীরে পিচ্ছিল শ্যাওলা ঘন হয়ে উঠতো।

মা একবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো–দূর থেকে আমি দেখতে পাই; আমার মনে হয় পড়ে যাক, আমি ধরতে পারবো না; কিন্তু আমি দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলি, মা পুরোপুরি পা পিছলে পড়ে না; আস্তে আস্তে বসে পড়ে। আমার অতো শক্তি ছিলো না যে মাকে উঁচু করে কাঁধে তুলে ধরি, বা ধরে আমার বুকের সাথে আটকে রাখি। ধরতে গিয়ে আমিই নিচে পড়ে গিয়েছিলাম, ব্যথাও পেয়েছিলাম; তবে আমি ব্যথা পেয়েছিলাম কি না মা জানতে চায় নি, তাতে আমার খুব ব্যথা লেগেছিলো। মার শরীরের গন্ধ আমার খুব খারাপ লেগেছিলো।

মা বলেছিলো, তুই না থাকলে আজ আমি মারা যেতাম।

আমি বলেছিলাম, তুমি খুব ব্যথা পেয়েছে।

মা বলেছিলো, মেয়েমানুষের ব্যথা পেতেই হয়, আরো কতো ব্যথা পাবো।

আমি বলেছিলাম, তোমাকে দেখতে আজকাল ভালো লাগে না।

মা বলেছিলো, কেনো রে?

আমি বলেছিলাম, তুমি কুৎসিত হয়ে গেছে।

মা বলেছিলো, আমাকে দেখতে কি খুব কুৎসিত লাগে?

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ; তুমি কি সুন্দর ছিলে, এখন তোমাকে ভালো লাগে না; এমন কুৎসিত মা ভালো লাগে না।

মা চমকে উঠেছিলো, কষ্টে ভরে-যাওয়া মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, এইজন্যই কি তুই আমার কাছে আসতে চাস না?

আমি কোনো কথা বলি নি, বলার মতো কথাই পাই নি, বলার ইচ্ছে হয় নি। তারপর থেকে মাকে খুব বিব্রত মনে হতে থাকে; আমি নই, মা-ই, আমার মনে হয়, দূরে থাকতে চায় আমার থেকে। কলসি থেকে পানি ঢালার সময় আমাকে ডাকতে গিয়ে মা থেমে যায়, নিজেই ঢালার চেষ্টা করে। আমি দূর থেকে দেখতে পাই মা বসতে পারছে না, কলসি কাৎ করতে পারছে না, তার হাত থেকে গেলাশ পড়ে যাচ্ছে; আমার ইচ্ছে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে আমি গেলাশ নিয়ে পানি ঢেলে মাকে দিই। মার মুখে আমি একটি সুন্দর হাসি দেখি, দেখে আমার বুক ভরে যায়, মাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে; কিন্তু জড়িয়ে ধরি না। মারও তখন আমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করেছিলো, কিন্তু আমাকে জড়িয়ে ধরতে মা ভয় পায়, মার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারি। মা কেনো কোনো পাখির কাছে থেকে কোনো পরীর কাছে থেকে আমার একটি ভাই বা বোন আনলো না, কেনো মা তার পেটের মধ্যে ভাই বা বোন আনলো? এমন কুৎসিত হয়ে উঠলো?

আমি একদিন জিজ্ঞেস করি, মা, তোমার পেটে কী?

মা একটু বিব্রত হয়; পেটটিকে আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলে, তোর ভাই, নইলে তোর বোন।

আমি বলি, তুমি কেনো পাখি আর পরীর কাছে থেকে ভাইবোন আনলে না?

মা হেসে ওঠে; বলে, পরী আর পাখি কি ভাইবোন দিতে পারে?

আমি বলি, তুমি বলেছিলে পাখি আর পরীর কাছ থেকে আমাকে পেয়েছে।

মা বলে, ছোটোদের তাই বলতে হয়।

আমি বলি, আমাকে পাখি আর পরীর কাছে থেকে পাও নি?

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, না রে না।

আমি বলি, তাহলে কোথায় পেয়েছিলে?

মা বলে, আমার পেটে, তুইও আমার পেটেই হয়েছিলি।

আমি অন্ধকার দেখতে পাই, কোনো কথা বলতে পারি না; শুধু মায়ের বাহু থেকে বেরোনোর চেষ্টা করি। মা আমাকে আদর করতে চায়, আমাকে বশ করতে চায়।

মা বলে, তুই আমার পেটে খুব লাথি মারতি, তোর লাথি আমার ভালো লাগতো।

আমি বলি, তখনও তুমি এমন কুৎসিত হয়েছিলে?

মা বলে, সবাই বলত আমি সুন্দর হয়েছিলাম।

আমার একটু ভালো লাগে; আমি বলি, তোমার পেটে আমি কীভাবে এসেছিলাম?

মা বলে, তোর বাবা জানে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো না, আমি তখনই বুঝতে পারি; বাবা আমাকে কখনো কোনো গল্প বলেন নি। কোনো পাখি আর পরী আনে নি আমাকে? আমি মার পেটে হয়েছিলাম? আমার খুব সুখ লেগেছিলো যখন মা বলেছিলো একটি পাখি আর পরী জ্যোৎস্নারাতে মার কোলে রেখে গিয়েছিলো আমাকে;–মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো একটি ফুলের, লাল রঙের ফুল, তার অনেক সুগন্ধ; আর জেগে দেখে মার কোলে আমি ফুটে আছি। মা খুশিতে ভরে গিয়েছিলো, আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলো। আমার মনে হয়েছিলো আমি পাখি আর পরীর উপহার, আমি আকাশে উড়তে পারবো; আকাশ থেকে আকাশে উড়ে যেতে পারবো, আমার শরীরে সব সময় জ্যোৎস্না থাকবে, আমি মেঘের ওপর দিয়ে ঝড়ের ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে পারবো। অনেক দিন আমি পাখি আর পরীর সাথে আকাশে আর মেঘে উড়েছি, ঝড়ে ছুটে চলেছি, জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছি। কিন্তু মার নতুন কথা শুনে আমি অন্ধকার দেখতে থাকি; আমি পাখি আর পরীর কেউ নই, আমি অন্ধকারের মার পেটে কোনো আলো আর আকাশ আর ঝড় থাকতে পারে না, সেখানে

অন্ধকার আছে বলেই মনে হয় আমার; ওই অন্ধকার থেকে আমি এসেছি। আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয় সব কিছু অন্ধকারে গঠিত।

মা এক বিকেলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়; আমার ইচ্ছে করে না। আমি মাকে বলি বিকেলে বেড়াতে যেতে আমার ভালো লাগে না, আমার খেলতে ইচ্ছে করে, খেলতে আমার ভালো লাগে। মা একলাই বেড়াতে যায়, আমি মাকে দূর থেকে দেখি; মা রিকশায় বসতে পারছে না, পড়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে আমি মাকে ধরি, যাতে মা পড়ে না যায়, কিন্তু আমি ছুটে যেতে পারি না। ওই বিকেলে আমার আর মাঠে যেতে ইচ্ছে করে না, আমি একা বারান্দায় বসে থাকি, বিকেলটা অন্ধকারের মতো আমার ওপর নামতে থাকে। আমার দুটি বন্ধু আমাকে খুঁজতে আসে, ওরা দরোজায় অনেকক্ষণ নাম ধরে ডাকে, আমি সাড়া দিই না। মা, তুমি ঠিকমতো রিকশায় বসতে পারছো তো, আমি মনে মনে বলি; তোমার সাথে বেড়াতে যেতে আমার ইচ্ছে করে না; কিন্তু আমি খেলতে যেতেও পারছি না, খেলতে গেলে সুখে, আমার বুক ভরে উঠবে, সেই সুখ আমার ভালো লাগবে না; তোমাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তোমাকে আমার কুৎসিত লাগে, তাই তোমার সাথে আমি যাই নি; নইলে খেলার থেকে তোমার সাথে বেড়াতে যেতেই আমার ভালো লাগে। মার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি বারান্দায় বসে থাকি, সন্ধ্যে হয়ে গেলেও পড়ার টেবিলে যাই না, একটা রিকশার ছায়া দেখার জন্যে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি; আর রিকশার ছায়া দেখার সাথে সাথেই পড়ার টেবিলে গিয়ে বসি।

একদিন আমি মাকে জিজ্ঞেস করি, বাবা আজকাল এতো দেরি করেন কেনো?

মা বলে, তার কাজ বেড়ে গেছে।

আমি বলি, কেনো কাজ বেড়ে গেছে?

মা বলে, তুই বুঝবি না।

তখন আমাকে বড়োরা মাঝেমাঝেই বলতো, তুই বুঝবি না, শুনে আমার সুখ লাগতো না; অনেক দুরূহ উত্তর পাওয়া খুব জরুরি মনে হতো, আমি জানতে চাইতাম, তারা বলতো, তুই বুঝবি না; শুনে আমি চুপ করে যেতাম, কিন্তু মার কাছে চুপ করে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার মনে হয় মা যা বুঝতে পারে আমিও তা পারবো। আমার তো মনে হতো মা-ই অনেক কিছু বুঝতে পারে না; তার বুঝতে সময় লাগে, কিন্তু আমি তার আগে বুঝে ফেলি।

আমি বলি, তুমি আমাকে বলল, দেখো আমি বুঝবো; আমি সব বুঝতে পারি।

মা একটু চুপ করে থেকে বলে, আসলে কাজ বাড়ে নি, কাজ আর কী বাড়বে; ঘরে ফিরতে তার ভালো লাগে না।

আমি বলি, কেনো ভালো লাগে না?

মা কোনো কথা বলে না। মাকে নিয়ে বেশ অসুবিধা হচ্ছে আজকাল; সহজে উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে।

আমি আবার জানতে চাই, কেনো ভালো লাগে না?

আমার ভয় হতে থাকে মা আবার বলবে, তুই বুঝবি না; মা তা বলে না; তবে এমন কথা বলে যে আমি ভয় পাই।

মা বলে, তোর বাবা তো তোর মতোই। আমি কুৎসিত হয়ে গেছি, আমাকে দেখতে যেমন তোর ভালো লাগে না, তোর বাবারও ভালো লাগে না। তাই দেরি করে ফিরে।

মার কথা শুনে আমি কেঁপে উঠি, একটা কষ্ট আমার মাথার ভেতর দিয়ে ঢুকে পা পর্যন্ত এসে গমগম করে ওঠে; আমার পায়ের নিচের মাটি আর মাথার ওপরের আকাশ ভেঙেচুরে যেতে থাকে। আমি মনে মনে বলতে থাকি-মা, তোমাকে আর কুৎসিত বলবো না, তোমাকে দেখতে আমার আর কুৎসিত লাগবে না, আমার সুন্দর লাগবে, সবচেয়ে সুন্দর; এবং আমি উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসি, বই খুলে আমি কিছু পড়তে পারি না; আমার মনে, আমি শুনতে পাই, কে যেনো ব'লে চলছে-মা, তোমাকে আমি সুন্দর দেখতে চাই, তোমার সাথে আমি বেড়াতে যেতে চাই, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হতে চাই। তখনই দেখি মা আমার জন্যে কোরানো নারকেল আর মুড়ি নিয়ে আসছে, মা হাঁটতে পাড়ছে না, তার পা দুটি দু-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আর পেটটি মার থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছে; এবং তখনই আমার ঘেন্না লাগে। একবার মনে হয় দৌড়ে গিয়ে মার হাত থেকে বাটি দুটি আমি নিয়ে আসি, মার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার কষ্ট হয়, আমি মার মুখের দিকে তাকাই; মা আমার টেবিলের ওপর বাটি দুটি রাখে। মুখ ঘুরিয়ে মার মুখে আমি একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পাই।

মা বলে, তোর জন্যে কুরিয়ে আনলাম।

আমি বলি, আমার তো খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

মা বলে, আমার মনে হলো তোর খিধে পেয়েছে।

আমি বলি, না, আমার খিধে পায় নি।

মা বলে, তবু পড়তে পড়তে খা।

আমি বলি, আচ্ছা।

মা চলে যায়, আমার খেতে ইচ্ছে করে না; আমার মনে হয় অন্য যে কেউ এনে দিলে আমার খেতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে না। জানালা দিয়ে ওগুলো ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, আর তখনই আমি কষ্ট পাই। ওগুলো আমি ফেলে দিই না, একপাশে সরিয়ে রাখি; অনেকক্ষণ পর মা আবার এসে আমার পাশে দাঁড়ায়।

মা বলে, তুই এখনো খাস নি?

আমি বলি, খাওয়ার কথা মনে ছিলো না।

মা বলে, এখন আমি মনে করিয়ে দিলাম, এখন খা।

মা আমার মুখে নারকেল আর মুড়ি তুলে দিতে থাকে, মার জন্যে আমার কষ্ট হয়, আমি খেতে শুরু করি।

মা বলে, খেতে কেমন লাগছে?

আমি বলি, ভালো।

মা বলে, তই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিস।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বলি, তুমি এমন হয়ে গেলে কেনো?

ডলিকে গর্ভবতী করতে আমার ইচ্ছে করে না। ওই মসৃণ বস্তু ছাড়া আজো আমি প্রবেশ করি নি, আমার ভয় করে, কোনোদিন পারবো না; ডলি আর আমার মধ্যে মসৃণ বস্তুর দূরত্ব রয়ে গেছে, ওই দূরত্বই আমাকে নির্ভয় রাখে, আমি আমাদের মধ্যে মসৃণ দুর্ভেদ্য দূরত্ব রাখতে চাই। মসৃণ বস্তু নেই, প্রবেশ করছি, ভাবতেই ভেতরে একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পাই। ডলির সর্বাঙ্গের স্পর্শ আমাকে উল্লসিত উত্তপ্ত কোমল কাতর সুখী করে, তবু মসৃণ বস্তু ছাড়া আমি প্রবেশ করছি, ভাবতেই মনে হয় আমি অন্ধকারতম। অন্ধকারে ঢুকছি, যেখানে কখনো আলোক ছিলো না, আলো জ্বলবে না, ওই অন্ধকার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারবো না; ওই অন্ধকারে আমি লুপ্ত হয়ে যাবো। আমি গভীর কৃষ্ণ অন্ধকার দেখতে পাই, অন্ধকারকে আমি বাল্যকাল থেকেই ভয় করি। ডলি বারবার বলে সে-ই ব্যবস্থা নেবে, বটিকা খাবে; আমার সম্পূর্ণ সংস্পর্শ সে পেতে চায়, সে অনুভব করতে

চায় মসৃণতাহীন আমার উপস্থিতি, সে বোধ করতে চায় বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড বর্ষণের স্বাদ। আমি তা পেতে চাই না; আমি তার মাংসের সাথে জড়িত হ'তে চাই না। আমার কি ঘেন্না লাগে? আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ডলি বারবার জানায় যখন সে প্লাবিত পলিমাটির মতো বোধ করতে চায়; যখন সে পদ্মার স্রোতে জন্মজন্মান্তর ধরে ভিজতে চায়, হারিয়ে যেতে চায় প্লাবনের তলে, প্লাবন থেকে জেগে উঠতে তার ইচ্ছে করে না, তখন সে, ওই মসৃণ বস্তুর জন্যে, মরুভূমির মতো শুষ্ক বোধ করতে থাকে; সে মরুভূমি হয়ে ওঠে। মরুভূমি হতে তার ভালো লাগে না, সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি খুব যত্নের সাথে মসৃণ বস্তুটি পরখ করি, কোথাও ফেড়ে গেছে কি না, দেখি; তার ভেতর নিরাপদে ঘোলামলিন শাদা বস্তু রয়েছে দেখে আমি স্বস্তি পাই। ডলি যখন প্লাবিত হওয়ার কথা বলে, আমার মনে পড়ে নর্দমার কথা; কখনো উর্বর জমির কথা। উর্বর জমিতে বীজ ছড়ানোর কথা ভাবলে আমি ভয় পাই, আবাদ করতে আমার সাহস হয় না; নর্দমাও আমাকে অসুস্থ করে তোলে, মলভাণ্ডে নিজেকে বিগলিত করে দিতে আমি ঘেন্না বোধ করি।

ডলি, দেখতে পাই, মৃদু রাজনীতিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে; মাকে দলে নিয়ে এসেছে। এতে তার কোনো কষ্ট হয় নি, বুঝতে পারি আমি; সবাই মানুষের পক্ষে; মানুষের কাজ মানুষ উৎপাদন করা, মাও তা বিশ্বাস করে।

মা এক সন্ধ্যায় জানতে চায়, তুমি না কি ছেলেমেয়ে চাও না?

আমি কোনো কথা বলি না। মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার একই কথা বলে। আমার কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না, তবে উত্তর ছাড়া মা নড়বে না আমি বুঝতে পারি।

আমি বলি, না।

মা বলে, এটা কেমন কথা?

আমি বলি, ছেলেমেয়ে আমার ভালো লাগে না।

আমার কথা শুনে মা ভয় পায়।

মা বলে, একটা বেড়ালের জন্যে তুমি অনেক দিন কেঁদেছিলে, যখন ছোটো ছিলে, আর এখন তোমার ছেলেমেয়ে ভালো লাগে না?

আমি বলি, বেড়াল আমার এখনো ভালো লাগে।

ডলি বলে, কিন্তু মানুষ তোমার ভালো লাগে না।

আমি বলি, মানুষও আমার কখনো কখনো ভালো লাগে।

মা বলে, আমরা নাতিনাতনি দেখতে চাই, নাতিনাতনি দেখার সখ তো আমাদের আছে।

আমি বলি, কিছু মনে কোরো না মা, ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি এসব কথা আমার ভালো লাগে না।

মা বলে, আমার আর তোমার বাবার যদি ছেলেমেয়ে ভালো না লাগতো তুমি হতে কোথা থেকে?

আমি বলি, আমি তো হতে চাই নি।

মা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, কোনো কথা বলে না।

ডলি বলে, কিন্তু তুমি হয়েছে আমি হয়েছি, আমাদের থেকে আরো মানুষ হবে। আমি মানুষ হওয়াতে চাই।

আমি বলি, মানুষ হওয়ানোর কথা ভেবে আমি কোনো সুখ পাই না।

ডলি চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু প্রত্যেক রাতেই তো করতে চাও, শুয়োরের মতো সুখ পাও।

আমি বলি, আমি হয়তো শুয়োর, আমার পক্ষে মানুষ জন্ম দেয়া সম্ভব নয়।

ডলি কাঁদে, আমাকে একটি শিশু দাও।

আমি বলি, হয়তো কোনো শুয়োর জন্ম দিয়ে ফেলবো।

ডলি চিৎকার করে, আমাকে একটা শুয়োরই দাও।

মা চলে গেছে, ডলিও চলে গেলে আমি স্বস্তি পেতাম; সে যায় না, তার যাওয়ার কথা নয়, এটা তারই কক্ষ। সে উঠে আলমারি খোলে, আমি বুঝতে পারি না কেনো হঠাৎ আলমারি খুলছে; তবে আলমারি খোলা আমার কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয় না। তার আলমারি সে খুলবে, তার যদি ইচ্ছে হয় রাত দুপুরে কাতান পরতে, পরবে। ডলি হঠাৎ মসৃণ বস্তুর প্যাকেটগুলো আমার সামনে ছুঁড়ে দেয়, আমি চমকে উঠি, বুঝতে পারি না আমার সামনে এগুলো কী এসে পড়ছে। পাঁচ-ছটি প্যাকেট সে ছুঁড়ে মেরেছে আমার সামনে; বস্তুগুলো মসৃণ হ'লেও মোড়কগুলো অতো মসৃণ নয়, সেগুলো বেশ শব্দ করে আমাকে চমকে দেয়। অল্প পরই আমি বস্তুগুলো চিনতে পারি। ডলি ছুটে এসে একটির পর একটি মোড়ক খুলতে থাকে, খুলে মসৃণ বস্তুগুলো ছেঁড়ার চেষ্টা করতে থাকে। এর আগে ডলি কখনো ওই বস্তু ধরে নি, মোড়ক খোলে নি; আমি শুরুতেই বুঝতে পারি ডলি যদি সবগুলো মোড়ক খুলে সবগুলো বস্তু ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তাহলে তার কয়েক সপ্তাহ লাগবে। সে প্রথম নখ দিয়ে মোড়ক খোলার চেষ্টা করে, তার নখ তা পেরে ওঠে না; সে দাঁত দিয়ে মোড়ক কাটার চেষ্টা করতে থাকে, তার দাঁত ওই মোড়ক কাটতে পারে না; তখন সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, একটির পর একটি প্যাকেট খুলে গুচ্ছগুচ্ছ মসৃণ বস্তু বের করতে থাকে, নখ দিয়ে ছেঁড়ার চেষ্টা করতে থাকে, দাঁত দিয়ে কাটতে চায়; কিন্তু একটি মসৃণ বস্তুও সে বের করতে পারে না। সবগুলো জড়ো করে সে পা দিয়ে পিষতে থাকে। ডলি জানে না ওই মসৃণ বস্তুগুলো অবিনশ্বর, মাটির নিচে পুঁতে রাখলে সৌরজগতের ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে; ওগুলোর ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই-এজন্যেই ওগুলোকে আমার ভালো লাগে; শুধু আগুনই ওগুলোকে ধ্বংস করতে পারে।

আমি বলি, আমি বের করে দিচ্ছি।

ডলি আমার দিকে তাকায় না।

আমি তার কাছে গিয়ে মোড়ক ছিঁড়ে একটি একটি করে গোলাপি মসৃণ বস্তু তার হাতে তুলে দিতে থাকি; সে টেনে সেগুলো ছেঁড়ার চেষ্টা করে। প্রথমটি ছিঁড়তে না পেরে সেটি ছুঁড়ে দিয়ে আরেকটি নেয়; সেটিও ছিঁড়তে না পেরে আরেকটি নেয়; সেটিও ছিঁড়তে না পেরে আরেকটি নেয়; সেটিও ছিঁড়তে না পেরে আরেকটি নেয়; সেটিও ছিঁড়তে না পেরে আরেকটি নেয়। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার ঘুম পায়; সে মেঝেতে এলিয়ে পড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি গোলাপি বস্তু আর মোড়কগুলো নিয়ে বাথরুমে ঢুকি; কমোডে গোলাপি বস্তুগুলো ছেড়ে দিয়ে ফ্লাশের পর ফ্লাশ টানতে থাকি। একেকবার হল্লা করে পানি আসতে থাকে; আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গোলাপি মসৃণ শাপলা ভাসছে কমোড়ে, পদ্ম ফুটে আছে কমোডে, তার রঙে কমোড রঙিন হয়ে গেছে;–আমি কি কখনো শাপলা দেখেছি, শুনেছি বিলে শাপলা ফোটে, আমি কি কখনো পদ্ম দেখেছি?–ওগুলোকে ফ্লাশ টেনে মাটির অতলে পৌঁছে দিতে হবে; আমি ফ্লাশ টানতে থাকি, হল্লা করে পানি আসে, আমি ফ্লাশ টানতে থাকি, আমার চোখের সামনে হাজার হাজার কুমুদ শাপলা ভাসতে থাকে, আমি ফ্লাশ টানতে থাকি, গোলাপি কুমুদের কোলাহলে আমার রক্ত বিবশ হয়ে যেতে থাকে; মনে হয় পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত ফ্লাশ টেনে যেতে হবে, নইলে এই শাপলাগুলো এভাবেই ভাসতে থাকবে কমোডের সরোবরে।

কয়েক দিন পর একটি ঘটনা

কয়েক দিন পর একটি ঘটনা ঘটে। অফিসের মাইক্রোবাসে অনেকের সাথে আমিও অফিসে যাই এবং ফিরি; সেদিনও মাইক্রোবাসটি আমাকে নামিয়ে দেয়, আমি নেমে বাসায় উঠে আসি। মাইক্রোবাস থেকে নেমে আমি পেছনের দিকেও তাকাই না, বাসায় ঢুকে কাপড় বদলিয়ে বাথরুমে ঢুকি। বাথরুমে ঢুকেই সেদিন আমি কোলাহল আর কান্না শুনতে পাই। কোলাহল নিয়মিত ব্যাপার, কান্নাটিকেই একটু নতুন সংযোজন মনে হয়। কারো কান্না শুনলেই আমি আর কাতর হয়ে উঠি না, কান্নাকে একটা সাংসারিক কর্তব্য বলেই আমার মনে হয়। আমি মগ দিয়ে মাথায় আর শরীরে পানি ঢেলে চলেছি, কল থেকে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে, কান্না আর কোলাহলও আমি শুনতে পাচ্ছি না। তখন বাথরুমের দরোজায় মা আর ডলি ফুঁ দিয়ে চিৎকার করে আমাকে ডাকতে থাকে; তাড়াতাড়ি বেরোতে বলে; আমি বেরিয়েই বাড়িভর্তি পাড়াবাসীদের দেখতে পাই। তাদের অনেককেই আমি চিনি, অর্থাৎ অনেককেই আমার চেনা মনে হয়; তবে অনেকের সাথে আমার কখনো কথা হয় নি।

চিৎকার করে তারা বলে, আপনি বাইরে চলেন, দেখেন আপনার ড্রাইভার কী করছে।

আমি বলি, আমার তো কোনো গাড়ি নেই, ড্রাইভারও নেই।

তারা বলে, আপনার ড্রাইভার না, আপনার অফিশের ড্রাইভার।

আমি জানতে চাই, ড্রাইভার কী করেছে?

তারা বলে, খুন করছে।

খুনের কথা শুনে আমি চমকে উঠি না, কোনো আর্তনাদও করি না; তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি তারা আমার মুখে একটা ভীষণ চমকানো ভাব দেখতে চেয়েছিলো, আমার কণ্ঠের একটা আর্তনাদ শুনতে চেয়েছিলো। তা না পেয়ে তারা হতাশ হয়। আমি যে চমকাই নি, আর্তনাদ করি নি, এতে আমারও বিস্ময় লাগে। আমার মনে হয় সংবাদপত্রের পাতার কয়েক শো খুনের খবরের মধ্যে এইমাত্র একটি আমি পড়লাম। খুনের খবর পড়ে সবার মতো আমিও কখনো ছুটে বেরোই না; কে কখন কীভাবে খুন হয়েছে দেখতে যাই না; বরং অন্য কোনো স্তম্ভে খুনের খবর থাকলে তা দ্রুত পড়ে ফেলি; এবং ভুলে যাই। অফিসের ড্রাইভার কাকে পথে খুন করেছে, আমি কেনো দেখতে যাবো? কেনো উত্তেজিত হবো? না, তবে আমাকে যেতে হবে; আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘোরানোর সময়ই ড্রাইভার কাজটি করেছে। তাই এই খুনের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি; তাই আমাকে তাদের সাথে বাইরে গিয়ে খুনের পরবর্তী দৃশ্য দেখতে হবে; তাই আমি তাদের সাথে বাইরে যাই। নেমেই দেখি একটি ছোটো শিশুর মাথা পিষে গেছে, তার মাথা থেকে ছোট্ট এক বাটি মগজ একদিকে ছিটকে পড়ে আছে, পাশে একটুকু লাল রক্ত ছড়ানো, শিশুটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরের আর কোথাও একটা দাগও নেই, শুধু তার মাথার ওপর দিয়ে মাইক্রোবাসের একটি চাকা চলে গেছে।

দৃশ্যটি আমার সুন্দর লাগে। শিশুটি বেশ সুন্দর ছিলো; তার গায়ে নতুন জামা, পায়ের জুতোও নতুন। সে নতুন জুতো আর জামা পরে সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে আছে। শুধু ঘুম থেকে আর জাগবে না; আর লুকোচুরি খেলবে না। দুটি নারী তার পাশে বসে কাঁদছে, কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; একটি নারী তাই ধারাবাহিকভাবে কাঁদতে পারছে না। থেমে থেমে

কাঁদছে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় তারা চাচ্ছে আমি একটুকু কাঁদি। আমি কাঁদলে তারা শান্তি পাবে, তাদের বুকে শক্ত অশান্তি জমে আছে, আমি কাঁদলে তাদের অশান্তিটা গলে যাবে। আমার কান্নার কথা মনে পড়ে না; আমার ভেতরে এমন কিছু ঘটে না, যাতে আমি ডুকরে উঠতে পারি। শিশুটির শুয়ে থাকাটা–আমার সুন্দর লাগে; আরেকবার তাকিয়ে আমি তাকে দেখি।

ঘটনা আর কাহিনী তারা বিস্তৃতভাবে, এলোমেলো ও চিৎকার করে, বিবৃত করতে থাকে। আমি তা নিজের ভেতরে সাজাতে থাকি।

ঘটনা পুনর্গঠন করলে দাঁড়ায় : মাইক্রোবাসটি যখন আমাকে নিয়ে আসে তখন কয়েকটি শিশু লুকোচুরি খেলছিলো, মাইক্রোবাসটি আমাকে নামানোর জন্যে থামলে শিশুটি মাইক্রোবাসের পেছনে লুকোয়; ড্রাইভার গাড়ি ঘোরানোর সময় তার মাথাটি গাড়ির পেছনের চাকার নিচে পড়ে যায়।

কাহিনী পুনর্গঠন করলে দাঁড়ায় : শিশুটি দিনাজপুর থেকে গতকাল নানার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তার বাবা সেখানে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তিনি আসতে পারেন নিঃ তার মা তাকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শিশুটি বাপমায়ের একমাত্র সন্তান; বয়স পাঁচ বছর। বেড়াতে আসার কোনো কথা ছিলো না, শিশুটিই ঢাকায় বেড়াতে আসার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, কয়েক মাস ধরেই সে আসার জন্যে কান্নাকাটি করছিলো; তাই তার মা টিকতে না পেরে গতকাল বাপের বাড়ি আসে। আজ সকালে তার নানা তাকে নতুন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন; নতুন জামা আর জুতো পরে সে তার মামাতো ভাইদের সঙ্গে

লুকোচুরি খেলছিলো, আর তখনই আমাদের অফিসের গাড়ি পেছনে ফিরতে গিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দেয়। সে আর খেলবে না।

আমার চোখে কোনো অশ্রু জমে না; বুকে কোনো কাঁপন লাগে না; রক্তে কোনো কষ্ট প্রবাহিত হয় না।

গাড়িতে পাঁচজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরা বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন। তাঁদের ঘিরে রেখেছে পাড়ার তরুণ সমাজসেবকগণ। একটু দূরে ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে হাত ও পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। তার হাত আর পা না বাধলেও চলতো; তার হাত আর পা দুটির এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ওগুলো সে আর কখনো ব্যবহার করতে পারবে বলে মনে হয় না।

গাড়িটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। পাড়ার সমাজসেবকেরা ভাঙার বিস্ময়কর বিজ্ঞান জানে; বোঝার কোনো উপায় নেই ওটি কিছুক্ষণ আগে গাড়ি ছিলো; দ্রুতবেগে চলতো।

আমি দুঃখ পাই গাড়িটির জন্যে, যেটিকে কখনো কখনো আমি অশ্ব ভাবতাম।

আমার বিধ্বস্ত সহকর্মীদের পাশে গিয়ে আমি বসি; তাদের জন্যে আমার কষ্ট লাগে না; যেমন আমি যদি তাদের বাসার সামনের পথে পাড়ার সমাজসেবকগণের উদ্যোগে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে থাকতাম তাদের কষ্ট লাগতো না। তারা সবাই মরে গেলেও আমার কষ্ট হতো না, এমন মনে হয়, যদিও তাদের অন্তত তিনজনকে আমি বেশ পছন্দ করি; আর অন্তত দুজন যদি দিনে একবার আমার ঘরে এসে না বসে আমার খারাপ লাগে, আমি খবর দিয়ে

আনি, চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ গল্প করি। একজনের স্ত্রীকে আমার খুব পছন্দ; তার স্ত্রী আমাকে দেখলে এতো চঞ্চল হয়ে ওঠে যে আমার মনে হয় অমন একটি কন্যা আমার থাকলে বেশ হতো, যদিও আমি আমার ঔরষে কোনো কন্যা বা পুত্র জন্ম দিতে চাই না। আমি তাদের জন্যে বাসা থেকে পানি আনাই। পাড়ার তরুণ সমাজসেবকেরা, যারা তাদের বিধ্বস্ত করেছে, আনন্দের সাথে পানি আনার দায়িত্ব পালন করতে থাকে; প্রমাণ দিতে থাকে যে তারা সমাজসেবক হিশেবে পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য। তারা বিধ্বস্তদের পানি খাওয়ায়, শরীরের এখানে সেখানে লেগে-থাকা ময়লা পরিষ্কার করে, তাদের কাছে মাফও চায়; এবং তাদের জন্যে বেবিট্যাক্সি ডেকে আনে। তারা আমার সাথে ড্রাইভারকে নিয়ে হাসপাতালে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার সময় একবার আমার মনে হয় ও মরে গেলে ওকে নিয়ে আমার হাসপাতালে যেতে হতো না।

আমার দুঃখ লাগে মাইক্রোবাসটির জন্যে। হঠাৎ মনে হয় মাইক্রোবাসটিকে আমি ভালোবাসি; এমন একটি মাইক্রোবাস আমি কখনো সৃষ্টি করতে পারবো না; আমার ঔরষে এমন একটি মাইক্রোবাস কখনো জন্ম নেবে না। আমার কোনো গাড়ি নেই; এমন একটি মাইক্রোবাস আমার কখনো হবে না। মাইক্রোবাসটি কখনো আমাকে সুখ ছাড়া দুঃখ দেয় নি। আমি সব সময়ই মাইক্রোবাসটির সামনের আসনে বসেছি; অন্যরা যে ওই আসনটি কখনো দখল করতো না, এটা আমাকে সুখ দিতো; পনেরো মিনিটের জন্যে আমি এ-সুখ উপভোগ করতাম। আমাকে সামনের আসনে বসিয়ে মাইক্রোবাসটি সুখ পাচ্ছে, আমার কি এমন মনে হতো? আর কখনো গাড়িটিকে দেখবো না; স্পর্শ পাবো না? মাইক্রোবাসটির স্পর্শের অনুভূতি আমাকে শিউরে দেয়, আমার ত্বকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হঠাৎ একটা বাতাস বয়ে যায়। আমার কি কাঁদতে ইচ্ছে করছে? আমার চোখে একবার একবিন্দু জল এসে গেছে বলে আমার মনে হয়; চোখের জল মোছর মতো করে আমি

চোখে আঙুল বোলাই। চোখের জল মুছছি দেখে বা ভেবে কয়েকজন সমাজসেবক আমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়।

সন্ধ্যার পর সমাজসেবকগণ, কয়েকজন বৃদ্ধ, আর শিশুটির মা আমাদের বাসায় আসে।

একজন সেবক বলে, আপনি যে জানাজায় গেলেন না?

আমি বিব্রত বোধ করি।

আরেক সেবক বলে, আপনার জন্যেই আমার ভাগনেটা মারা গেলো, আর আপনি একবারও আমাদের বাসায় গেলেন না, জানাজায়ও গেলেন না।

আমি বলি, যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ে নি।

তারা সবাই কেঁপে উঠলো বলে মনে হলো।

আরেক সেবক বলে, আপনারা আমলারা খুন করার পর খুনের কথাও মনে রাখতে পারেন না, এজন্যেই আপনারা আমলা। জীবনে আপনারা কতো খুন করেছেন।

আরেক সেবক বলে, আপনার চোখে একটু পানিও আসে নি।

এক বৃদ্ধ বলেন, তোমাকে আমরা ছোটোবেলা থেকেই চিনি, তোমাকে আমরা ভালো বলেই জানি, তুমি ভালো চাকুরি করো, এমন একটা খুন তুমি করবে আমরা ভাবি নি।

তাঁর কথা শুনে মনে হয় আমি সত্যিই খুন করেছি। শিশুটি পথে দাঁড়িয়েছিলো, দেখে আমার ঘেন্না লেগেছিলো, আমি একটি বন্দুক এনে তার মাথা লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি গুলি করেছিলাম। তার মগজ ছিটকে পড়ছে দেখে আমার ভালো লেগেছিলো।

কিন্তু আমি বলি, তখন তো আমি গাড়িতে ছিলাম না।

এক বৃদ্ধ বলেন, গাড়িটা তো তোমাকে নামানোর জন্যেই এসেছিলো।

এক তরুণ সেবক বলে, আপনার জন্যেই শিশুটি খুন হয়েছে।

শিশুটির মা চুপ করে বসে আছেন। তিনি কাঁদছেন না। তিনি কাঁদছেন না দেখে আমার খারাপ লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি যে কাঁদছেন না?

মা'টি একটু বিব্রত হয়; অন্যরাও নড়েচড়ে বসে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, আর কোনো বাচ্চা আপনার নেই।

তিনি বলেন, না।

আমি বলি, বাচ্চার জন্যে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন না?

সবাই চিৎকার করে ওঠে।

সেবকেরা বলে, এমন কথা বলার জন্যে আপনাকে মাফ চাইতে হবে। তার বাচ্চা মারা গেছে আর সে কষ্ট পাবে না? সে কি আপনার মতো?

আমি বলি, আমার ভুল হয়ে গেছে; তবে আপনারা আসার আগে শিশুটির মার কথা একবার আমার মনে হয়েছিলো, যদিও কে মা তা আমার জানা ছিলো না; আমি ভেবেছিলাম তিনি এখন শিশুটির কবরের পাশে বসে কাঁদছেন।

এক সেবক বলে, কষ্ট পেলে লাশের সাথে কি কবরে যেতে হবে?

আমি বলি, আমি কখনো কষ্ট পাই নি; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো কারো জন্যে কষ্ট পেলে আমি তার কবরে নেমে যেতাম, কবরে শুয়ে থাকতাম।

আরেক সেবক বলে, দেখেন, বন্ধুকে পানিতে ফেলে দিয়ে তার বউকে আপনি বিয়ে করেছেন সেই খবর আমরা রাখি।

আমি বলি, আমার বন্ধুর জন্যে আমি বোধ হয় কষ্ট পাই নি, আর তার লাশও পাওয়া যায় নি।

এক সেবক বলে, আপনারা আমলারা যাদের পানিতে ফেলেন, তাদের লাশ কখনো পাওয়া যায় না। আর বন্ধুর জন্যে কেনো কষ্ট পাবেন, তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে তো এখন সুখেই আছেন।

আমি বলি, আপনারা সব জানেন না।

এক বৃদ্ধ বলেন, তোমার কাছে আমরা কেনো এসেছি, তুমি কি বুঝতে পারছো?

আমি বলি, না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন, তোমাকে নামাতে এসেই ড্রাইভার শিশুটিকে খুন করেছে।

আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমরা ড্রাইভার আর তোমাদের নামে মামলা করেছি।

আমি বলি, নিয়মমতো কাজই করেছেন।

তিনি বলেন, শিশুটি রহিমার একমাত্র সন্তান ছিলো, বড়ো আদরের সন্তান।

আমি কোনো কথা বলি না।

তিনি বলেন, তবে মামলা আমরা করতে চাই না।

আমি বলি, তা আপনাদের ইচ্ছে।

তিনি বলেন, একটা কথা কী জানো রহিমার আর সন্তান হবে না, তার আর সন্তান ধারণের শক্তি নেই।

চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে; এবং রহিমা, শিশুটির মা, ডুকরে কেঁদে ওঠেন। তাঁর কান্না শুনে ডলি, বেলা, আর মা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে; তারা সবাই মিলে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। সমাজসেবক আর বৃদ্ধরাও অশ্রুভারাতুর হয়ে পড়ে; দুটি সেবক উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, তাদের কান্না আর অশ্রুতে বসার ঘরটি শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে। আমার একটি সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ ধরেই ইচ্ছে করছিলো; কিন্তু শোকাতুর মা আর বৃদ্ধদের সামনে আমি সিগারেট খেতে চাই নি, আমার দ্বিধা লাগছিলো; এবার আমি একটি সিগারেট বের করি; টান দিতেই আমার ভেতরটা সুখে ভরে ওঠে।

এক বৃদ্ধ বলেন, রহিমার যদি সন্তান ধারণের শক্তি থাকতো তাহলে কথাটা বলতাম না, সেই শক্তি নেই বলেই কথাটা বলছি।

আমি বলি, বলুন।

তিনি বলেন, রহিমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমি বলি, ক্ষতি? কার ক্ষতি? আর কিসের ক্ষতিপূরণ?

তিনি বলেন, এই যে রহিমার ছেলেটিকে তোমার ড্রাইভার খুন করেছে।

আমি বলি, একটি শিশু গাড়ির চাকার নিচে পড়ে মারা গেছে, একে কি আপনারা ক্ষতি বলছেন?

তারা সবাই চুপ করে যায়, তাদের মুখে আমি অপরাধবোধের আঁকাবাঁকা দাগ দেখতে পাই। তারা কেউ কথা বলে না।

এক বৃদ্ধ বলেন, হ্যাঁ, এটা তো ক্ষতিই।

আমি বলি, একমাত্র সন্তান মারা যাওয়াটা ক্ষতি?

বৃদ্ধ বলেন, আমাদের তো তাই মনে হয়।

ক্ষতি কাকে বলে? আমি আর ক্ষতি শব্দের অর্থ বুঝতে পারি না। আমার ইচ্ছে হয় অভিধান দেখি, কিন্তু কোনো অভিধানের নাম আমি মনে করতে পারি না।

আমি বলি, কীভাবে তার ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে?

এক বৃদ্ধ বলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে ওই ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

আমি একটা কষ্ট বোধ করি, আর পরমুহূর্তেই আমার কোনো কষ্ট লাগে না।

আমি রহিমাকে জিজ্ঞেস করি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে আপনি কি আপনার ছেলেকে ফিরে পাবেন?

তিনি বলেন, না।

আমি বলি, আপনি কি টাকা চান?

তিনি বলেন, হ্যাঁ।

আমি বলি, আপনি কি আপনার ছেলেকে ভালোবাসতেন না?

তিনি চুপ করে থাকেন।

আমি সবাইকে বলি, গাড়ির নিচে পড়ে কেউ মরলে তার জন্যে কে দায়ী তা আমি জানি না।

এক সেবক বলে, ড্রাইভার দায়ী, আপনারা দায়ী।

আমি বলি, আমি ঠিক জানি না, তবে যে মারা গেছে সেও তো দায়ী হতে পারে। সেবকেরা চিৎকার করে ওঠে, কেনো সে দায়ী হবে? তার কোনো অপরাধ নেই। সে ছোট্ট শিশু। সে কোনো অপরাধ করে নি। সে দায়ী হতে পারে না।

আমি বলি, শিশুরাও অপরাধ করতে পারে।

সেবকেরা আবার চিৎকার করে, শিশুরা অপরাধ করতে পারে না; শিশুরা নিষ্পাপ, তারা দেবতা, তারা ফেরেশতা, তারা কোনো অপরাধ করতে পারে না। অপরাধ করেন আপনারা।

পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে; উত্তপ্ত পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়, কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ারও সহায়ক নয়। তাই পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করে তোলার উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসে কেউ কেউ।

এক সেবক ধীরস্থিরভাবে বলে, আপনি আমলা বলেই এমন কথা বলতে পারলেন, দেখতে পাচ্ছি আমলাদের চোখে শিশুরাও অপরাধী।

পরিবেশ ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে না।

আরেকজন বলে, দায়ী আপনারাই।

আমি বলি, আমি আইন জানি না, যারা আইন জানে তারাই বলতে পারবে কে দায়ী।

সেবকেরা বলে, আইন আমরাও জানি। দরকার হলে আইন আমরা শিক্ষাও দিতে পারি।

আমি বলি, দয়া করে আমাকে একটি আইন শেখালে খুশি হবো।

তারা বলে, বলুন।

আমি বলি, আমি তো তখন গাড়িতে ছিলাম না।

তারা বলে, কিন্তু অপরাধটা আপনারই; আপনাকে নামিয়ে দেয়ার জন্যেই গাড়ি এসেছিলো।

আমার নিজেকে উদ্ধার করার ইচ্ছে করে না; ডলি আমাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নেয়; তাকে আমার বাধা দিতেও ইচ্ছে করে না।

ডলি শিশুটির মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আপনার ছেলে আমার ছেলেও হতে পারতো। তার জন্যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

শিশুটির মা ডলিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। বেদনায় তারা দুজন পরস্পরের ভগিনী হয়ে ওঠে।

ডলি হঠাৎ উঠে দৌড়ে আমাদের ঘরে যায়-তাকে অলৌকিক বাণীপ্রাপ্তর মতো অনুপ্রাণিত মনে হয়; আমি আলমারি খোলার শব্দ পাই। তারপরই দেখি ডলি অধিকতর অনুপ্রাণিতর মতো এসে ঢুকছে।

ডলি তার অলঙ্কারগুলো শিশুটির মার দিকে দু-হাতে তুলে ধরে বলে, আপা, আপনি এগুলো নিন, আমার আর নেই, থাকলে আপনাকে দিতাম।

শিশুটির মা অলঙ্কারগুলোর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকায়।

আমি বলি, ডলি, তুমি এগুলো তাকে দেবে না।

ডলি বলে, না, এগুলো আমি তাকে দেব, এগুলোতে আমার কোনো দরকার নেই।

এক বৃদ্ধ বলেন, এতোগুলোর দরকার নেই, অর্ধেক দিলেই চলবে; এগুলোর দাম লাখ টাকার বেশি হবে।

ডলি বলে, শিশুটির দাম লাখ টাকার অনেক বেশি, থাকলে আমি আপাকে কোটি কোটি টাকা দিতাম।

শিশুটির মার মুখ প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

আমি শিশুটির মাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি এগুলো চান?

শিশুটির মা কথা বলে না।

আমি বলি, এগুলো নিতে হলে একটা কথা আপনাকে বলতে হবে।

সবাই আমার দিকে তাকায়। আমার মনে হয় তারা কথাটি বুঝে ফেলেছে, তাই আমার আর কথাটির কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমি দেখতে পাই তারা কী কথা বলতে হবে জানার জন্যে অধীর হয়ে আছে; আমি বলছি না দেখে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে। তবু আমি কথাটি বলতে পারি না।

এক সেবক বলে, বলুন, রহিমা আপাকে কী কথা বলতে হবে।

আমি বলি, না, থাক।

এক বৃদ্ধ বলেন, তুমি বলো, রহিমা কথাটি বলেই এগুলো নেবে।

আমি কথাটি বলতে পারি না।

সেবকেরা বলে, বলুন, কী কথা বলতে হবে?

আমি বলি, আপনি বলুন যে আপনি আপনার ছেলেকে ভালোবাসতেন না, তার মৃত্যুতে আপনি সুখী হয়েছেন।

আমার কথা শুনে সবাই কেঁপে ওঠে, শিশুটির মা ডুকরে ওঠে; আর ডলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, তাকে আমার সব অলঙ্কার নিতে দাও, কিন্তু তাঁকে তুমি একথা বলতে বোলো না।

পরদিন অফিসে গিয়েই দেখি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়ে গেছে; এবং এগোরাটায় আমাকে অতিরিক্তর কক্ষে সাক্ষী দিতে যেতে হবে। সাক্ষী নয়, যেতে হবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে; কমিটি অনেকখানি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে আমাকে নামাতে গিয়েই রাষ্ট্রের একটি দামি যানবাহন সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং ওই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষার জন্যে আমি কোনো চেষ্টা করি নি। ঠিক সময়ে আমি তিন সদস্যের কমিটির মুখোমুখি হই।

১ম যুগ্ম জিজ্ঞেস করেন, গাড়িটি আপনাকে নামাতে গিয়েই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা কি সত্য?

আমি বলি, জি, স্যার।

২য় যুগ্ম জিজ্ঞেস করেন, মাইক্রোবাসটি রক্ষা করার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করেন নি, এটা কি সত্য?

আমি বলি, জি, স্যার।

অতিরিক্ত বলেন, তাহলে আমাদের তদন্ত এখানেই শেষ হলো।

আমি বলি, স্যার, আমার কিছু কথা ছিলো।

অতিরিক্ত বলেন, বলুন।

আমি বলি, ড্রাইভার একটি শিশুকে চাপা দিয়েছিলো, শিশুটি মারা গেছে।

১ম যুগ্ম বলেন, শিশুর মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমি বলি, আমি তখন গাড়িতে ছিলাম না।

২য় যুগ্ম বলেন, আপনি গাড়িতে ছিলেন না, তাও গুরুত্বপূর্ণ নয়; কথা হচ্ছে গাড়িটি আপনাকে নামাতে গিয়েছিলো।

আমি বলি, শিশুটি খুব সুন্দর ছিলো, স্যার।

১ম যুগ্ম বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না।

আমি বলি, সুন্দর মানুষ আজকাল বেশি দেখা যায় না, স্যার।

তিনি বলেন, সৌন্দর্য এবং মানুষ আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়।

আমি বলি, শিশুটি তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলো, স্যার।

২য় যুগ্ম বলেন, মাস দশেকেই আরেকটি শিশু তারা উৎপাদন করতে পারবে, কোনো নিষেধ নেই।

অতিরিক্ত বলেন, কিন্তু স্ত্রীদের গর্ভে আমরা মাইক্রোবাস উৎপাদন করতে পারি না।

আমি উঠে আসি। ডলি কি একটা মাইক্রোবাস গর্ভধারণ করতে পারবে? ডলিকে আজ বলবো, আমি একটা সন্তান চাই, মানুষ নয়; একটা মাইক্রোবাস। শুধু মাইক্রোবাস কেনো? ডলির গর্ভে আমি রেলগাড়ি জাহাজ উড়োজাহাজ হেলিকপ্টার উৎপাদন করতে চাই। ডলির গর্ভকে, আমার সাধ হয়, একটা শক্তিশালী কারখানায় পরিণত করতে, যেখানে উৎপাদিত হবে ট্যাংক, ট্যাংকার, বোমারু বিমান, মিসাইল, আণবিক বোমা। ডলির গর্ভকে একটা তেলের খনিতে পরিণত করতে চাই আমি, আমাদের সঙ্গমে প্রতিদিন যা প্রসব করবে লাখ লাখ ব্যারেল পেট্রোলিয়ম। ডলির গর্ভে আমি উৎপাদন করতে চাই টমোটা, টাটা, ফোক্সওয়াগন, মার্সিডিজ; রক্তমাংসের ঘিনঘিনে মানুষ নয়, আমাদের সঙ্গমে আমার ঔরসে ডলির গর্ভে উৎপাদিত হবে সুপারসোনিক বিমান, আণবিক সাবমেরিন, জগন্নাথ ট্রাক, শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাস, রঙিন টেলিভিশন, দশতলা দালান, নদীর ওপর সাড়ে তিন কিলোমিটার ব্রিজ।

কিন্তু শিশুটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় আমার, এবং আমার হাসি পায় যে শিশুটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। শিশুর অভাব নেই চারপাশে, রাস্তায় নামলেই একটার পর একটা শিশু আমি দেখতে পারি। কিন্তু আবার আমার ওই ইচ্ছেটা হয়। কেনো আরেকটুকু ভালো করে দেখলাম না? এখন ও কোথায় কতোটা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। ওর মা কি কবরের পাশে বসে কাঁদছে? ওর জানাজায় কি আমি গিয়েছিলাম? না, যাই নি; যাওয়ার কথা মনে পড়ে নি; পড়লেও যেতাম না। আমি কখনো কোনো জানাজায় যাই নি; সেখানে দাঁড়িয়ে কী বলতে হয় জানি না; বললে কী হয় জানি না। ওর মতো ছেলেবেলায়

যদি আমি কোনো মাইক্রোবাসের পেছনে লুকোতাম তাহলে এখন আমি এখানে থাকতাম না। ও নিশ্চয়ই কোনো গোরস্থানে শুয়ে আছে। ঢাকায় কততগুলো গোরস্থান আছে? শুধু একটি গোরস্থানই আমি চিনি। সেটা দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি। ও কি সেখানকার মাটির নিচেই পড়ে আছে? ওর জন্যে আমার মায়া হয়। ও কি জানে ওর মার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে? আমি বেরিয়ে পড়ি, নোংরা গোরস্থানটির গেইটে নামি। যতোই ভেতরে ঢুকতে থাকি, ততোই আমার নোংরা লাগতে থাকে। আমি ভেবেছিলাম ভেতরে শান্তি বিরাজ করবে, যা মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেবে; কিন্তু যতোই এগোতে থাকি ততোই চারপাশ আমাকে নোংরা জীবনকে মনে করিয়ে দিতে থাকে। এখানে যারা শুয়ে আছে মৃত্যুর পরও তারা সুখ পাচ্ছে না; জীবনের অসুখ তাদের ঘিরে আছে। তারা জীবনকে অসুস্থ করে রেখেছিলো, এখন মৃত্যুকেও অসুস্থ করে রাখছে। গোরস্থানটিকে করে তুলেছে কবরের বস্তি। আমি নতুন কবরগুলোর দিকে এগোতে থাকি; একটি লোকের থেকে জেনে নিই গতকালের শিশুদের কবরগুলো কোথায়। একটি নয়, দশবারোটি শিশুদের কবর; প্রায় পাশাপাশি তারা মাটির নিচে লুকিয়ে আছে, ওপরে বাঁশের বেড়া ঝকঝক করছে-ওগুলো হয়তো। জানে না ওদের নিচে ঘুমিয়ে আছে শিশুরা। কিন্তু কোন কবরের খোঁজে আমি এসেছি?

কোন কবরটি ওর? কোন কবরে ও মাইক্রোবাসের পেছনে লুকিয়ে আছে? আমি এক কবর থেকে আরেক কবরে যেতে থাকি। আমার মনে হয় এখনি কবরের মাটিতে ওর মুখের ছাপ দেখতে পাবো। তবে ওর মুখটি কি আমার মনে আছে? মুখ দেখে কি চিনতে পারবো ওকে? বহু দিন আমি ভালো করে কোনো শিশুর মুখ দেখি নি। শিশুর মুখ কেমন? আমি শুধু ছিটকে পড়া একবাটি মগজ দেখতে পাই, পাশে একদাগ রক্ত; ওর মুখ আমার মনে পড়ে না। আমি ওর মুখটি খুঁজতে থাকি, আমার ভেতরে ওর মুখ খুঁজে পাই না।

আমার ভেতরে কতো মাটি জমেছে যে মুখটি আমি দেখতে পাচ্ছি না? আমি কোনো শিশুর মুখই মনে করতে পারি না; আমার চোখে শুধু মড়ার খুলি ভেসে উঠতে থাকে। প্রত্যেকটি কবরই কি ওর? প্রত্যেকটি কবরের মাটির নিচে, বাঁশের বেড়ার তলে, ও মাইক্রোবাসের পেছনে লুকানোর চেষ্টা করছে? কবরের পাশে এলে প্রার্থনা করতে হয়? আমি কোনো প্রার্থনা জানি না; আমার ভেতরে কোনো প্রার্থনা জাগছে না। ও কি জানে ওর মার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে? একটি লোক পাশে এসে দাঁড়ায়, সে বলছে সে প্রার্থনা করতে জানে; পাঁচ টাকা লাগবে। আমি তাকে পাঁচটি টাকা দিই; লোকটি জানতে চায় কোন কবরের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে; আমি বলি আমি জানি না।

ডলি বলে, আমাদের এই পাশাপাশি শোয়া নিরর্থক, কী হবে পাশাপাশি শুয়ে, আমার আর ইচ্ছে করে না।

আমি বলি, পাশাপাশি শোয়ার মধ্যে কোনো অর্থ আছে বলে তো আমি জানি না।

ডলি বলে, তাহলে শোও কেনো?

প্রশ্নটিকেই নিরর্থক মনে হয় আমার; তাই বলি, আমি জানি না।

ডলি বলে, এও জানো না? তাহলে কী জানো?

আমি বলি, বেশি কিছু না।

ডলি বলে, আমি তো পাশের বাসার লোকটির সাথে এক বিছানায় শুতে পারি না, এটা জানো?

আমি বলি, জানি; তবে ইচ্ছে হলে তুমি শুতে পারো।

ডলি বলে, এমন করলে এরপর আমার ইচ্ছে হবে।

আমি বলি, কী করছি?

ডলি বলে, তাও বুঝতে পারছো না?

আমি বলি, না তো।

ডলি বলে, পাশাপাশি শুয়ে থাকলেই দেহ জুড়িয়ে যায় না, আমার একটি দেহ আছে, তার ক্ষুধা আছে।

আমি বলি, ক্ষুধা?

ডলি বলে, তোমার মনে আছে ক-মাস ধরে আমরা কিছু করি নি?

আমি বলি, না, হিশেব করি নি।

ডলি বলে, তুমি হয়তো বাইরে কিছু করো, তাই তোমার মনে নেই; আমার মনে আছে, আমি তো বাইরে কিছু করতে পারি না।

আমি বলি, করতে পারো।

ডলি বলে, করতে পারো বললেই মেয়েমানুষ করতে পারে না।

আমি বলি, তুমি ঘুমোও, আমি একটু পড়ি।

ডলি বইটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়; বলে, বিছানা শোয়ার জন্যে, পড়ার ইচ্ছে হলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে কোনো হলে গিয়ে ওঠো।

আমি বইটি কুড়িয়ে বসার ঘরে গিয়ে বসি। বইটি পড়তে শুরু করেই আমার ভেতরে অদ্ভুত শান্তি নামে; শব্দটি ঠিক হলো না, ওই অনুভূতির জন্যে আমি কোনো শব্দ জানি না; ওই বোধকে সুখও বলা ঠিক হবে না। শান্তি বা সুখ ওই অনুভূতির কাছে খুব গরিব শব্দ। তা সুখের থেকে, জীবনের থেকে বেশি; শিশুর মৃত্যুর থেকে, নারীর সাথে পাশাপাশি শোয়া আর কিছু করার থেকে বেশি। লোকটি বড়ো কিছু করতে চায় নি, শুধু তার ছেলেবেলার কথা বলেছে; নিজের কথা বলেই নি, বলেছে গাছপালা নদী জল পুকুর মাছ মেঘ খেজুরগাছ শিশির কুয়াশা ধান বৃষ্টির কথা। লোকটি কী করে তার ছেলেবেলাকে এমনভাবে মনে রেখেছে? তার মনে ছেলেবেলা এমনভাবে ঢুকে আছে কীভাবে? আমি আমার ছেলেবেলাকে মনে করতে চাই, পারি না; তাতে কোনো বৃষ্টি নেই গাছ নেই জল নেই সবুজ নেই মেঘ নেই কুয়াশা নেই শিশির নেই। আমার কোনো বন্ধু ছিলো? মনে করতে পারি না। কোনো

কিশোরীকে দেখে কোনো সন্ধ্যায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমি? মনে পড়ে না। একরাশ জোনাকিপোকার পেছনে পেছনে ছুটেছিলাম? জোনাকিপোকা আমি কখনো দেখিই নি, শুধু নামটি জানি। শীতে কুয়াশার ভেতর দিয়ে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে আমি কখনো ছুটেছিলাম? শিশির কাকে বলে? ঘাস কেনো শিশিরে ভেজে? কুয়াশা কাকে বলে? ঘাস কী? আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু লোকটির সাথে আমি শিশিরে ভিজতে থাকি, কুয়াশায় ভিজতে থাকি, জোনাকিপোকার পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকি; দেখতে পাই বাঁশবাগানের মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর চাঁদ উঠেছে।

বই পড়তে পড়তে আমার কখনো ঘুম আসে না; কখনো আমি পাশে বই খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি নি। যখন আমি ঘুমোতে চাই তখন খুব যত্নের সাথে আমি বই বন্ধ করি, ঠিক জায়গায় রাখি; আজো যত্নের সাথে বইটি বন্ধ করে ঠিক জায়গায় রাখার কথা মনে হয়; তবে রাখতে পারি না। ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু আমি কোথায় ঘুমোবো? ডলি কি জেগে আছে? জেগে থাকলে তার পাশে গিয়ে আমি ঘুমোতে পারবো না, আমার ইচ্ছে করছে না। ডলি কি ঘুমিয়ে আছে? ঘুমিয়ে থাকলে ঘুমন্ত একটি নারীর পাশে গিয়ে চুপচাপ আমি শুয়ে পড়তে পারবো না, আমার ইচ্ছে করছে না। তাহলে আমি বসার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়বো? শয্যার বাইরে আমি কখনো ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না; আমি মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়তে পারবো না। ডলি ক্ষুধার কথা বলছিলো? শরীর না-জুড়োনোর কথা? আমি কি ক্ষুধা বোধ করছি, আমার শরীর কি উত্তপ্ত হয়ে থাকছেঃ আমি কি বাইরে জুড়োই? আমার ঘুম পাচ্ছে; মেঝেতেই আমি শুয়ে পড়বো? মেঝেতে আমি শুতে পারি না। বসে থাকবো? বসেও থাকতে পারি না। গিয়ে দেখি ডাল ঘুমিয়ে পড়েছে; বিছানায় উঠতে আমার ভয় হয়। অচেনা কেউ ভেবে ডলি চিৎকার করে উঠতে পারে। আমি নিঃশব্দে পাশে শুই, ডলি চিৎকার করে ওঠে না। কিছুক্ষণ আগেই ঘুম পাচ্ছিলো, এখন পাচ্ছে না; অদ্ভুত লাগে শরীরটাকে। ঘুম

আসে না; টের পাই শরীরে একটা ক্ষুধা জেগে উঠছে, হঠাৎ শরীরের ভেতরে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠলো; তার আগুন গিয়ে লাগলো খড়কুটোতে, খড়কুটো পুড়তে শুরু করলো। ডলির ভেতরও এমন খড়কুটো পোড়ে, এমনভাবে দেশলাই জ্বলে ওঠে; আগুনের দুর্দান্ত ক্ষুধা জ্বলে? ডলিকে জাগাবো? ডলিকে আমি জাগাতে পারবো না; বলতে পারবো না তোমার মতো একটা ক্ষুধা আমার দেহেও জ্বলছে। এ-আগুন আমার ব্যক্তিগত, এ-ক্ষুধা আমার ব্যক্তিগত; কারো সাথে আমি তা ভাগ করে নিতে পারি না; এবং তখনি আমার মনে পড়ে দিগন্তের ওপারে ফেলে-আসা আমার সেই ক্ষুধাঝলকিত আগুনউজ্জ্বল বজ্রবিদ্যুৎচৌচির বিস্ময়কর দিনগুলোকে। আমি সেই বজ্রে ফিরে যাই সেই বিদ্যুতে ফিরে যাই, ডলি জানতে পারে না, বজ্র আমাকে ফাড়তে থাকে বিদ্যুৎ আমাকে ছিঁড়তে থাকে ক্ষুধা আমাকে ঝলসাতে থাকে আগুন আমাকে পুড়ে পুড়ে সোনার মতো গলাতে থাকে;– আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

হাফিজুদ্দিন একদিন হঠাই এসে উপস্থিত হয়; তার চেহারাটি কিছুটা চেনা লাগেলেও আমি আর কিছু মনে করতে পারি না। হাফিজুদ্দিন ঢুকে বসার ঘরে বসার সাথে সাথেই আমি বসার ঘরে যাই; দেখি আমার দ্বিগুণ মোটা গোলগাল বেঁটে কালো একটি লোক বসে আছে। আমাকে দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে, তার মাংসল মুখমণ্ডল থেকে একরাশ কালো উজ্জ্বল হাসি উপচে পড়ে।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, আমারে চিনতে পারছো ত?

আমি বলি, চেনা চেনা লাগছে, ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না, তবে এখনি পারবো।

হাফিজুদ্দিন বলে, পরিচয়টা পরে দিতেছি, তবে তুমি আমারে তাজ্জব কইরা দিছো।

আমি বলি, অবাক হওয়ার কী আছে?

হাফিজুদ্দিন বলে, আসনের সময় বুকটা কাঁপতেছিলো তোমার মতন অফিসারের বাসায় ঢোকতে পারুম কি না।

আমি বলি, কেনো, পারবে না কেনো?

হাফিজুদ্দিন বলে, আরে, তোমার মতন অফিসারের বাসায় ঢোকতে হইলে প্রথম আধঘণ্টা বেল বাজাইতে হয়, তিনচাইরটা কামের লোকের কাছে পরিচয় দিতে হয়, তারপর দেখা করনের জইন্য ড্রয়িংরুমে দুই ঘণ্টা বসে থাকতে হয়।

আমি বলে, না, না, আমি অতো বড়ো অফিসার নই।

হাফিজুদ্দিন বলে, তুমি কতো বড়ো অফিসার তা আমি জানি, তাই তো তোমার কাছে আইলাম, দোস। তবে আমারে তোমার মনে হয় ভাল কইরা মনে নাই।

আমি বলি, তোমার চেহারাটা মনে পড়ছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, আমি হইলাম হাফিজুদ্দিন, তোমার লগে এইট পর্যন্ত পড়ছিলাম, বাবায় মইরা গেল বইল্যা আর পড়তে পারি নাই। তবে তোমার লগে আমার খাতির আছিল, তোমারে আমি ভালবাসতাম।

আমি বলি, এখন কোথায় আছো?

হাফিজুদ্দিন বলে, নিজের পরিচয়টা আগে দিয়া লই, তারপর সব কই। তোমার কি মনে আছে পড়ায় না পারলে এক ছার কান মলাইতো?

আমি বলি, হ্যাঁ, বেশ মনে আছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, তুমি যার কান বেশি মলতা তার কথা মনে আছে?

আমি বলি, দেখি, ভেবে দেখি।

হামিদ স্যারকে মনে পড়ে। তিনি আমাদের ইস্কুলে কয়েক মাস ছিলেন; এসেই নিয়ম করেছিলেন যে পড়ায় পারবে সে যারা পড়ায় পারবে না তাদের কান মলবে। তিনি নিজে কান মলতে আর বেত মারতে পছন্দ করেন না, তবে কান মলা দেখতে পছন্দ করেন। তিনি আমাদের উত্তমভাবে কানমলার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন : কানের লতি দু-ভাঁজ করে জোরে ঘষা দিতে হবে, তাতে কান আর সারা শরীর আগুনের মতো জ্বলে উঠবে; কিন্তু আগুন দেখা যাবে না।

হাফিজুদ্দিন বলে, আর ভাবো কী দোস, আমার কানই বেশি মলতা; তবে আমার কানটা তুমি একটু আস্তে মলতা।

আমি বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কান মলার জন্যে আমি খুব দুঃখিত।

হাফিজুদ্দিন বলে, দুঃখ পাওনের কিছু নাই, দোস, এখন মনে পড়লে মজাই লাগে; তারপর সে খুব আস্তে করে বলে, তোমারে আমি জীবনে প্রথম মাইয়ামাইনষের বুক দেখাইছিলাম, দোস্ত মনে আছে?

আমি বলি, ওহ, তুমি সেই হাফিজ, সেই হাফিজুদ্দিন!

হাফিজুদ্দিন আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমিও জড়িয়ে ধরে সুখ পাই।

সেদিন আমি হাফিজুদ্দিনের কান খুব জোরে মলেছিলাম; হাফিজুদ্দিনের কানের লতি বেশ শক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যথা লেগেছিলো।

ছুটির পর হাফিজুদ্দিন আমাকে বলেছিলো, দোস, তর লগে একটা কথা আছে।

আমি বলেছিলাম, বলো।

হাফিজুদ্দিন বলেছিলো, এখানে বলন যাইব না, একটু অই দিকে ল।

আমরা মাঠের এককোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হাফিজুদ্দিন বলেছিলো, দোস, পড়ায় আমি পারি না, তুই পারছ, তুই আমার কানটা একটু আস্তে মলিছ, তাইলে তরে আমি একটা জিনিশ দেখামু।

আমি বলেছিলাম, কী জিনিশ?

হাফিজুদ্দিন বলেছিলো, এমন জিনিশ যা তুই জীবনেও দেখছ নাই, দেখলে আর ভুলতে পারবি না, এমন সোন্দর জিনিশ আর অয় না।

আমি বলেছিলাম, কখন দেখাবে?

হাফিজুদ্দিন বলেছিলো, কাইল ছুটি আছে, তোমারে আমি সকাল আটটার সময় গিয়া লইয়া আসুম, তারপর দেখামু।

পরদিন আটটায় হাফিজুদ্দিন আসে; কিন্তু ছুটির দিনে অতো ভোরে আমি বেরোবে কীভাবে? আমরা একটি বুদ্ধি বের করি।

আমি মাকে বলি, রহমান স্যার আজ আমাদের তার বাসায় যেতে বলেছেন।

মা বলে, স্যাররা আজকাল তো ছাত্রদের বাসায় যেতে বলে না।

আমি বলি, রহমান স্যার বলেছেন এখন থেকে ছুটির দিনে তার বাসায় যেতে হবে। তিনি আমাদের পড়াবেন।

মা বলে, স্যারদের মাথা খারাপ হলো না কি?

আমরা দুজন বেরিয়ে যাই। হাফিজুদ্দিন আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যায় :

পুরোনো শহরের একটি খুব পুরোনো দালান, কয়েক শো বছরের পুরোনো গন্ধ আর অন্ধকার জমে আছে ভেতরে, ওই গন্ধ আর অন্ধকার আমার ভালো লাগতে থাকে, ভেতরে পা দিয়েই আমি গভীরতর অন্ধকারে পড়ি; একটু দাঁড়াই, একটু গন্ধ আর একটু অন্ধকার আমি ভেতরে টেনে নিই: তারপর আবছা আলো দেখতে পাই। হাফিজুদ্দিন আমাকে আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দু-তিনটি ঘর পেরিয়ে একটি বাকানো লোহার সিঁড়ির কাছে এনে সাবধানে ওপরে উঠতে বলে, সে না বললেও আমার সাবধানতার কোনো অভাব ঘটতো না; আমি সিঁড়ির রেইলিং ধরে আস্তে আস্তে পা ফেলে মাথা নিচু করে তার পেছনে পেছনে উঠতে থাকি; এবং সিঁড়ির পর মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ হেঁটে একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকি। খুব ছোটো ঘর; আমার মনে হয় অন্ধকার জমিয়ে রাখার জন্যে এ-ঘরটি তৈরি করা হয়েছিলো; হাফিজুদ্দিন আমাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখে তারপর চোখ খুলতে বলে। আমি অনেকক্ষণ বন্ধ করে রেখে চোখ খুলে একটু আবছা আলো, মেঝেতে বিছানো হাফিজুদ্দিনের ছেঁড়া ময়লা বিছানা, বালিশ, ছেঁড়া কাঁথা, এদিকে সেদিকে ছড়ানো কয়েকটি বইখাতা, একটা হারিকেন, কয়েকটি ভাঙা মোম দেখতে পাই। ঘরটির দেয়ালে একটা বড়ো ছিদ্রও দেখতে পাই, যা দিয়ে গলগল করে বাইরের আলো ঢুকছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, আন্ধারে ভয় পাইছ না দোস, বাইরে আলো আছে।

আমি বলি, না, না, ভয় পাচ্ছি না।

হাফিজুদ্দিন দেয়ালের ছিদ্রে চোখ দেয়, এবং আমাকে বলে, দোস, আয়, দেখ, এমন জিনিশ তুই আর দেখছ নাই, তর সারাদিন দেখতে ইচ্ছা করবো।

আমি ছিদ্রে চোখ দিতেই আমার চোখ অপূর্ব আলোর আক্রমণে অন্ধ হয়ে যায়। আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবং চোখ সরিয়ে নিয়ে দু-হাতে চোখ চেপে ধরি।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, চোখ সরাইছ না, ভালো কইর‍্যা দেখ, এই জিনিশ দেখতে দেখতেই ত আমার আর বই খোলতে ইচ্ছা করে না।

আমি আবার ছিদ্রে চোখ দিই। ছিদ্রটা ছোটো, একসাথে দু-চোখ দেয়া যায় না; একবার এক চোখ দিয়ে দেখতে হয়, আরেকবার আরেক চোখ দিয়ে। আমি দেখতে থাকি।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, দেখতে পাইতাছছ?

আমি কথা বলি না, দেখতে থাকি; আমি অন্ধ হয়ে যাই, আমার দু-চোখে অজস্র চোখ জন্ম নিতে থাকে, অজস্র চোখ দিয়ে আমি দেখতে থাকি; এতো আলো, এতো জ্যোৎসা, এতো সৌন্দর্য আমি কখনো দেখি নি।

গোশলখানায় তিনটি মেয়ে গোশল করছে। তাদের বুকের তিন জোড়া স্ফীত আলোকিত গলিত চাঁদ থেকে জ্যোৎসা ঝরে পড়ছে। জ্যোৎস্নার কম্পনে আমার চোখ অন্ধ হয়ে যেতে থাকে, মাংস খসে পড়তে থাকে, রক্ত সমস্ত নালি ভেঙে ফিনকি দিয়ে ছুটতে থাকে। আমি দেয়ালের ছিদ্র থেকে চোখ সরিয়ে চোখ বন্ধ করে জোড়ায় জোড়ায় জ্যোৎস্না দেখতে থাকি।

হাফিজুদ্দিন বলে, তোমার লগে অনেক বছর দেখা নাই, পড়ালেখা আর করতে পারি নাই, তবে ভালই আছি।

আমি বলি, কী করছো তুমি আজকাল?

হাফিজুদ্দিন বলে, ব্যবসাপাতি করছি, ভালই করতাছি; গাড়িবাড়িও কইর‍্যা ফালাইছি। আইজ তোমারে সন্ধ্যায় আমি একটু খাওয়াইতে চাই।

আমি বলি, খাওয়ানোর কী হলো? কিছু বলতে চাইলে এখানেই বলো।

হাফিজুদ্দিন বলে, না, দোস, এইখানে বলুম না; খাইতে খাইতে বলুম। তুমি সন্ধ্যায় বাসায় থাইক।

সন্ধ্যায় হাফিজুদ্দিন আসে; তাকে আমার বেশ ভালো লাগে, যেমন লাগতো এইটে পড়ার সময়; আমার মনে হতে থাকে সে হয়তো আমাকে এমন কিছু দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে যা আমি আগে দেখি নি। তার সাথে আমি হেসে হেসে কথা বলতে বলতে গাড়িতে উঠি; এবং উঠেই খুব গোপনে খুব মসৃণভাবে হাফিজুদ্দিনকে ঈর্ষা করতে থাকি। তাকে ঈর্ষা করতে

আমি চাই না; বারবার সুখী হতে চাই ছেলেবেলার বন্ধুকে পেয়ে; নিজেকে বোঝাতে চাই যে হাফিজুদ্দিন আমার বন্ধু, সে জীবনে সফল হয়েছে। এটা আমার জন্যে অত্যন্ত সুখের; ইচ্ছে করলেই আমি তার মতো সফল হতে পারতাম, সে আমার মতো সফল হতে পারতো না। আমি নিজেকে বোঝাই যে হাফিজুদ্দিনের কাছে কোনোদিন আমার যাওয়ার দরকার হবে না, কিন্তু আমার কাছে তাকে আসতে হয়েছে, হয়তো আরো আসতে হবে; হাফিজুদ্দিন যতোগুলো গাড়িই করুক, সে আমার নিচেই আছে, এবং থাকবে। কিন্তু আমি আর আগের মতো হাসতে পারি না যদিও হাসতে চাই, হাফিজুদ্দিনের 'দোস' সম্বোধন আমার ভালোই লাগছিলো, কিন্তু এখন আর ভালো লাগছে না; মনে হতে থাকে গাড়িটা আমার নয়, হাফিজুদ্দিনের; এমন একটি গাড়ি কখনো আমার হবে না। হাফিজুদ্দিন এইটের পর আর পড়তে পারে নি; আমি তার কান মলতাম, এখন আমি তার গাড়িতে চলছি; এর আগে এমন একটা সুখকর গাড়িতে আমি চড়ি নি; আর তখনি হাফিজুদ্দিন গাড়ি নিয়েই কথা বলতে শুরু করে।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, গাড়িটা নতুন কিনলাম; আমার অন্য গাড়িটায় এসি নাই, এসি ছাড়া আমি টিকতে পারি না।

আমি শুনতে পাই নি এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি।

হাফিজুদ্দিন বলে, সেইজন্য বেডরুমেও আমি এসি লাগাইছি।

এবার আমাকে শুনতেই হয়, বেশিক্ষণ আমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না; অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার অস্বস্তি লাগে।

আমি বলি, তুমি বেশ সফল হয়েছে হাফিজুদ্দিন।

হাফিজুদ্দিন বলে, কী বলো, দোস?

আমি বলি, তুমি বেশ সফল হয়েছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, ট্যাকাপয়সা করছি কি না তা বলতাছো?

আমি বলি, হ্যাঁ।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, ল্যাখাপড়া জানি না, তোমাগো মতন অফিসারদের লগে সহজে খাতির জমাইতে পারি না, তাগো লগে ট্যাকাপয়সা দিয়াই খাতির জমাইতে হয়, তবে আল্লার রহমতে কিছু টাকাপয়সা করছি।

আমি বলি, আমাকে তোমার এতোদিন পর কেনো মনে পড়লো?

হাফিজুদ্দিন বলে, খাইতে খাইতে তা তোমারে বলবো; এখন তুমি কও গুলশান বনানীতে কয়টা বাড়ি বানাইছো, ব্যাংকে কয় কোটি জমাইছো, আর গাড়ি কয়টা করছো?

আমি বলি, এসব আমি কিছুই করতে পারি নি হাফিজুদ্দিন।

হাফিজুদ্দিন চিৎকার করে বলে, এইটা কী শুনাইলা দোস, তোমার মতন অফিসারগো নিউইয়র্কেও বাড়ি আছে, আর তোমার একটা গাড়িও নাই?

আমি বলি, না, সত্যিই নেই।

হাফিজুদ্দিন বলে, শুনছি তুমি খাওটাও না; আমাগো কাছে সব অফিসারগো লিস্টি আছে, তারা কত খায় তার হিশাব আছে, আমরা জানি তুমি খাও না; না খাইলে বাড়িগাড়ি কেমনে হইবো, দোস?

আমি বলি, আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা খুব খারাপ, তাই না?

হাফিজুদ্দিন বলে, খোঁজ নিয়া দেখলাম তুমি আর আমি ইস্কুলে ক্লাশমেট আছিলাম, তুমি আমার কান মলতা, আর আমি তোমারে এমন জিনিশ দেখাইছিলাম যা তুমি আগে দেখো নাই।

গাড়ি একটি পাঁচতারা হোটেলের ভেতরের এলাকায় এসে থামে।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, এই হোটেলে আমি আইজকাইল প্রত্যেক সন্ধ্যায় খাই। আর গিলি, কিন্তু অই স্বাধীনতাটা না হইলে এইডার দারোয়ানও হইতে পারতাম না।

হাফিজুদ্দিনের ভেতর থেকে খলখল খিলখিল হাসি উপচে পড়তে থাকে। ওই স্বাধীনতাটিকে আমারও একবার মনে পড়ে; ওই স্বাধীনতা হাফিজুদ্দিনকে পাঁচতারায় খাওয়াচ্ছে আর

গেলাচ্ছে, এবং আমাকে কী করাচ্ছে? এ-পাঁচতারায় আগে কখনো আসি নি, তা নয়; তবে কখনো খেতে বা পান করতে আসি নি, এসেছি সরকারি অনুষ্ঠানে। ইংরেজিতে দু-তিনবার ক্ষুধার ওপর সভাপতিত্বও করেছি। হাফিজুদ্দিন আমাকে সরোবরের পাশে এক চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন স্থানের দিকে নিয়ে যায়-সে কি আজো আমাকে দেয়ালের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বিস্ময়কর কিছু দেখাবে?–পথে পথে সে সালামের পর সালাম পেতে থাকে; আমার মনে হয় হাফিজুদ্দিন তার অফিসে ঢুকছে। আমি কি এই হাফিজুদ্দিনেরই কান মলতাম, এই হাফিজুদ্দিনই কি পড়া পারতো না? আমার ভেতরটা একটু শক্ত হয়ে উঠতে থাকে; মনে হতে থাকে এই কুৎসিত লোকটিকে আমি চিনি না, এই লোকটি কখনো আমার সহপাঠী ছিলো না; সে আমার অন্তরঙ্গ কেউ নয়। আমরা বসার সাথে সাথেই হাফিজুদ্দিন খাবার ও পানীয়র বিপুল নির্দেশ দিতে থাকে; আর আমি বোধ করতে থাকি যে লোকটির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই;–এই লোকটি একটি হাফিজদ্দি, যার সাথে আমি বসতে পারি না।

হাফিজুদ্দিন বলে, দোস, তুমি তো দুনিয়ার অনেক পাঁচতারা দেখছো।

আমি বলি, হাফিজুদ্দিন সাহেব, আপনি আমাকে ‘দোস’ বলবেন না।

হাফিজুদ্দিন আমার কথা শুনে চমকে ওঠে, অনেকটা ভয় পেয়ে যায়।

হাফিজুদ্দিন বলে, জি ছার, আমার ভুল হইয়া গেছে, এখন থিকা ছারই বলবো।

প্রচুর খাবার ও পানীয় এসেছে; হাফিজুদ্দিন আমার জন্যে পানীয় ঢালতে শুরু করে; এবং একটি পানপাত্র এগিয়ে দিয়ে বলে, ছার, একটু খান।

হাফিজুদ্দিন তার পানপাত্রটি ধ'রে আছে, আমি শুরু করলে সে শুরু করতে পারে; তাই আমি শুরু করি না। পান করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই; অনেকক্ষণ পর আমার ইচ্ছে হয়, আমি পাত্র তুলে পান করি, কোনো কথা বলি না। হাফিজুদ্দিন পান করার মুহূর্তের আনন্দব্যঞ্জক শব্দটি করতে গিয়ে থেমে যায়, আর তার উদ্দেশে ওই শব্দটি উচ্চারণ করতে আমার ঘেন্না লাগে।

হাফিজুদ্দিন বলে, ছার, আপনে আমার লগে আসছেন, এইটা আমার ভাইগ্য, এত সম্মান আমি আর পাই নাই।

আমি বলি, কিন্তু আপনি আমাকে কেনো এখানে নিয়ে এসেছেন?

হাফিজুদ্দিন বলে, ছার, বলার সাহস দিলে বলতে পারি, অইটা বলার জইন্যই তো আসছি।

আমি বলি, বলুন।

হাফিজুদ্দিন বলে, ছার, সরকার এক লাখ টান চাউল আনবো থাইল্যান্ড থিকা, কাজটা আপনারই হাতে, আমরা কামটা পাইতে চাই।

আমি কোনো কথা বলি না।

হাফিজুদ্দিন বলে, বারো পার্সেন্ট আমরা দিতে রাজি আছি, ছার, আপনে রাজি হইলে আইজই লাখ পাঁচেক দিতে পারি, গাড়িতে আছে।

আমি পান করতে থাকি, কোনো কথা বলি না।

হাফিজুদ্দিন বলে, খাইতে থাকেন ছার, খাইতে খাইতে ভাবেন ছার, কয়েক গেলাশ খাইলেই ডিসিশন নিতে পারবেন, খান ছার।

আমি পান করতে থাকি। হাফিজুদ্দিন গেলাশের পর গেলাশ শেষ করছে, আমি অতো পেরে উঠছি না, আমার ভালো লাগছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, খাইলে মনডা ঠাণ্ডা হয়, দুনিয়ার সব মাইনষেরে ভাল লাগে, আমি সেইজন্য সন্ধ্যা হইলেই খাইতে আসি, খান ছার, আমারে আপনার ভাল লাগবো।

আমি বলি, আপনাকে আমার খারাপ লাগছে না।

হাফিজুদ্দিন বলে, কথাটা শুইন্যা বুকটা ভইরা গেল, খান ছার, কামটা তাইলে আমরাই পামু।

আমি পান করতে থাকি, কথা বলি না, ভাষা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়।

হাফিজুদ্দিন বলে, চাইলে আপনে ছার এই হোটেলেই আইজ রাইত থাকতে পারেন, আমি এখনই সব ব্যবস্থা কইর‍্যা দিমু।

আমি কোনো কথা বলি না, মানুষকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে।

হাফিজুদ্দিন বলে, তাইলে একটা সুটের ব্যবস্থা করি, ছার?

আমি বলি, না, দরকার নেই।

হাফিজুদ্দিন বলে, আপনে চাইলে দুই-একটা হিরোইনেরও ব্যবস্থা করতে পারি, ছার, দুই-তিনটা হিরোইনও আমাগো কারবারে আছে; কইলজার টুকরা, আর জানের দুশমনের হিরোইন দুইটার মধ্যে কোনটা আপনার পছন্দ?

আমি কোনো কথা বলি না, পান করতে আমার বেশ লাগছে, হিরোইন ভালো লাগছে না।

হাফিজুদ্দিন বলে, বুক ত আপনার পছন্দ, আমার মনে আছে, ছার, কইলজার টুকরার হিরোইনটার বুক দুইডা পাহাড়ের মতন; অই দুইডা লইয়া হিরোইনটা হাঁটতে পারে না, অই দুইডা অর বুকে না হইয়া পিঠে হইলেই অর সুবিধা হইত।

আমি পান করতে থাকি, পাঁচ লাখ এক সাথে দেখতে কেমন ভাবতে থাকি।

হাফিজুদ্দিন বলে, জানের দুশমনের হিরোইনটা খ্যালে ভাল, ছার, তারে আমরা কই বেডকুইন, এগারোজনের লগে একলাই খ্যালতে পারে, ছার।

আমি পান করতে থাকি; পাহাড় আর কুইনের কথা ভাবতে আমার ভয় হয়।

আমি বলি, হাফিজুদ্দিন সাহেব, এখন আমি উঠবো।

হাফিজুদ্দিন বলে, ডিসিশনটা লইতে পারছেন, ছার? কামটা আমরা পামু ত?

আমি উঠে দাঁড়াই; হাফিজুদ্দিন আমার সাথে সাথে ওঠে, পেছনে পেছনে আসতে থাকে; পাঁচতারার কর্মচারী কমে গেছে, তবু সে দু-তিনটি সালাম পায়, সে ওইসব সালাম নেয় না, নিতে ভয় পায়।

গাড়িতে ওঠার আগে হাফিজুদ্দিন বলে, ছার, এইখানে ঢোকনের আর বাইর হওনের সময় আমার অই স্বাধীনতাটার কথা মনে পড়ে, অই স্বাধীনতাটা না হইলে এইডার দারোয়ানও হইতে পারতাম না।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

আমার বাসার সামনে গাড়ি থামলে হাফিজুদ্দিন জিজ্ঞেস করে, ডিসিশনটা লইতে পারছেন, ছার?

আমি বলি, আসুন।

হাফিজুদ্দিন একটা কাপড়ের ব্যাগ খুঁজে বের করে আমার পেছনে পেছনে আসতে থাকে। আমি তাকে সরাসরি শয্যাকক্ষে নিয়ে আসি, সে বেশ অবাক হয়।

আমি বলি, ব্যাগটা খাটের নিচে রাখুন, ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন।

হাফিজুদ্দিন মেঝেতে শুয়ে পড়ে খাটের নিচে ব্যাগটা রাখে, ঠেলে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়; তার মাথাটা বেশ ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলো, মাথাটা বের করলে দেখা যায় কিছু মাকড়সার জাল তার চুলে ঝুলে আছে।

তার বয়স বাড়ছে

ডলি বারবার আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে তার বয়স বাড়ছে, তার বয়স বেড়ে গেছে, তার আর সময় নেই; আমার সময় থাকতে পারে, তার সময় নেই, সে এক হাজার বছর বাঁচার জন্যে আসে নি। আমার সঙ্গে দশ বছরে তার বিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে; তার যে বয়স বাড়ছে, তা আমি দেখতে পাই। ডলি গোশল করে কম, তার বিশেষ কোনো সময় নেই গোশলের; ভোরেও সে গোশল করতে পারে, রাতেও পারে, দুপুরেও পারে; অনেক দিন করেই না। আমি তাকে গোশল করার কথা জিজ্ঞেস করি না, করাটা আপত্তিকর মনে হয়; কে কখন কী করবে বা করবে না তা তার নিজের ব্যাপার। সে সাজে, বা সাজার চেষ্টা করে; যখন তখন শরীরে সেন্ট ছড়িয়ে দেয়, শা শা শব্দ ওঠে, শব্দটা শুনলে আমার শরীর একবার শিউরে ওঠে; শা শা শব্দ করে সে আমাকে জানিয়ে দেয় যারা সুগন্ধ পছন্দ করে, তারা উন্নত রুচির মানুষ, আর যেহেতু সে সুগন্ধ পছন্দ করে, সে উন্নত রুচির অধিকারী, আমার থেকে। একদিন আমি তাকে গোশল করা সম্পর্কে খুব সরল পরোক্ষ একটা প্রশ্ন করে ফেলি; করে বিব্রত হই।

আমি বলি, আজ মনে হয় তুমি গোশল করো নি।

ডলি বলে, কেনো করবো? করার কী দরকার?

আমি বলি, গোশল তো করতেই হয়।

ডলি বলে, কেনো করবো? রাতে কিছু করো না কি যে গোশল করবো?

আমি বলি, রাতে কিছু করার সাথে গোশলের কী সম্পর্ক?

ডলি বলে, নাপাক হলে গোশল করতে হয়, আমি নাপাক না।

আমি বলি, আমি কোনো দিনই তোমাকে নাপাক করি নি।

ডলি বলে, নাপাক করার মুরোদ তোমার নেই।

ডলি সম্ভবত ধর্মে মন দিয়েছে, আমি চুপ করে থাকি। পাক-নাপাকের ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম; ইস্কুলের মওলানা সাহেব শব্দ দুটি বলতেন, শুনে মনে হতো আমার শরীরের ছিদ্রে ছিদ্রে ময়লা জমে আছে। ডলি ঘুমোনোর জন্যে চেষ্টা করছিলো, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে; দেখতে পাই সে ঘুমোয় নি, বরং প্রখরভাবে জেগে আছে।

ডলি বলে, শুনলাম তোমার সেক্রেটারির বউটা খুব রূপসী।

আমি বলি, আমিও তাই শুনেছি।

ডলি বলে, তুমি কি শুধু শুনেছেই, এখনো দেখো নি?

আমি বলি, না, দেখি নি।

ডলি বলে, আমার কাছে মিথ্যে বোলো না, তুমি অনেকবারই তাকে দেখেছো। সেক্রেটারি কি তোমাকে না দেখিয়ে শোয়ার সাহস করেছে?

আমি বলি, তার বউর সাথে সে শোবে, তাতে সাহসের দরকার হবে কেনো, আমাকেই বা দেখিয়ে নিতে হবে কেনো?

ডলি বলে, তোমাদের আমলাদের মধ্যে না কি এখনো পুরোনো কালের নিয়মকানুন টিকে আছে, শুনতে পাই বসকে না দেখিয়ে স্ত্রীগমন নিষেধ।

আমি বলি, এতো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তুমি কোথায় পাচ্ছো, ডলি?

ডলি বলে, তোমাদের আমলাদের সম্পর্কে সবারই ধারণা আছে, তাই আমলাদের বউদের সব সংবাদ রাখতেই হয়; কোন দিন সেক্রেটারির বউকে ভাগাও কে জানে?

আমি বলি, তুমি কি সেজন্যে দুশ্চিন্তায় আছো?

ডলি বলে, দুশ্চিন্তার কী আছে? আমিও কাউকে ধরবো, অনেকেই ঘুরঘুর করে; এখনো বুড়ী হয়ে যাই নি।

আমি আর কথা বলি না, ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

ডলি বলে, শুনলাম তোমার সেক্রেটারিকে তুমি কয়েক সপ্তাহের জন্যে বাইরে পাঠাচ্ছো?

আমি বলি, হ্যাঁ, আমেরিকায় যাওয়ার একটা সুযোগ ও পেয়েছে।

ডলি বলে, সুযোগ ও আসলে পায় নি, তুমিই সুযোগ করে দিয়েছে।

আমি বলি, হ্যাঁ, ও খুব চমৎকার ছেলে, আমি রিকমেন্ড করেছিলাম।

ডলি বলে, তাহলে যা শুনেছি তা সত্য।

আমি বলি, কী শুনেছো?

ডলি বলে, ও কয়েক সপ্তাহ বাইরে থাকবে, তখন তুমি ওর বউকে নিয়ে সময় কাটাবে। তোমাদের মধ্যে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে।

আমি বলি, বউটি তা মানবে কেনো?

ডলি বলে, বড়ো স্যারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ কি সে ছাড়বে?

আমি বলি, আমি যদি চার মাসের জন্যে বিদেশ যাই, তখন প্রধান মন্ত্রী তোমার সাথে সময় কাটাতে চাইলে কি তুমি রাজি হবে?

ডলি কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, ডলি, তুমি কি একটি কথা বুঝতে পারছো?

ডলি বলে, কী কথা?

আমি বলি, আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত?

ডলি বলে, তোমার কাছে আমি অপরিচিত হতে পারি, কিন্তু তুমি আমার কাছে অপরিচিত নও।

আমি বলি, আমার কতোটুকু পরিচয় তুমি জানো?

ডলি বলে, সবটাই জানি।

আমি বলি, আসলে আমরা কেউ কাউকে জানি না; জানার জন্যেও কোনো। ব্যাকুলতা বোধ করি নি।

ডলি বলে, আমরা বিয়ে করেছি, তুমি আমার দেহ সবটা দেখেছো, আমি তোমার দেহ দেখেছি, আমরা একসাথে বসে খাই, একসাথে থাকি, তুমি বড়ো চাকুরি করো; এর বেশি জানার কী আছে?

আমি বলি, তুমি কি জানো আমি কোন ঋতু পছন্দ করি?

ডলি বলে, আমাকে হাসালে। তুমি কোন ঋতু পছন্দ করো, তা জেনে আমার কী লাভ?

আমি বলি, আমি কি জানি তুমি কোন ঋতু পছন্দ করো?

ডলি বলে, তা তোমার জানতে হবে না।

আমি বলি, তুমি কি জানো আমার শরীরের কোনখানে মাঝেমাঝে ব্যথা করে?

ডলি বলে, তোমার শরীরে আবার ব্যথা আছে না কি; আমার তো মনে হয় লোহা দিয়ে তৈরি।

আমি বলি, আমি কি জানি তোমার শরীরের কোনখানে ব্যথা করে?

ডলি বলে, এসব কথা রাখো, স্বামীস্ত্রীর এসব জানার দরকার নেই।

আমি বলি, তুমি কি জানো তুমি আমার কোনখানে চুমো খেলে আমার ভালো লাগে?

ডলি বলে, তোমার ইতর কথা রাখো।

আমি বলি, তোমার কোন আসনে বেশি সুখ হয় আমি কি জানি?

ডলি বলে, রাখো তোমার আসনটাসন, আমাকে ঘুমোতে দাও।

ডলি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি আর কথা বলি না।

অনেক দিন ধরেই একটা অবর্ণনীয় অদ্ভুত ইচ্ছে হচ্ছে আমার, ইচ্ছেটাকে কখনো আমি বাস্তবায়িত করতে পেরে উঠবো না, কিন্তু ইচ্ছেটা হচ্ছে; আমার ভালো লাগছে–ইচ্ছেটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ইচ্ছেটাকে আমি দেখি, দেখে আমার সুখ লাগে। অনেক বছর আগে একটি চাষীকে আমি দেখেছিলাম, সে মাঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে; সেই চাষীটিকে আর গরুগুলোকে আমি দেখতে পাই-একটি স্বচ্ছ পর্দার ওপারের ছায়ার মতো তারা আমার কাছে। আমি কি ওই চাষীটি হতে, পারতাম? আমি কি ওই চাষীটি হতে পারতাম না? ওই গরুগুলো নিয়ে কি আমি মাঠে যেতে পারতাম না? আমি জানি চাষী হয়ে গরু নিয়ে মাঠে যাওয়া খুব মধুর নয়; কিন্তু তাকে যেভাবে আমি যেতে দেখেছিলাম, তা মধুর। অমন ঘাসের ওপর আমি কখনো পা ফেলি নি; আমি ঘাস আর মাটির ছোঁয়া কেমন তা জানিই না;–অনেক বছর ধরেই আমার পা ঘাস আর মাটির ছোঁয়া পাওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছে; ঘাস দেখলেই আমার ইচ্ছে করে জুতো খুলে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোথাও চলে যাই; কিন্তু আজো যেতে পারি নি; কোনো দিন যেতে পারবো না হয়তো। একবার এক দুপুরে দুর থেকে একটি ছোটো নদীতে এক মাঝিকে নৌকো বেয়ে যেতে দেখেছিলাম; সে গান গাইছিলো না, নৌকো বেয়ে যাচ্ছিলো; আমি আজো তাকে দেখতে পাই। আমি কি ওই মাঝিটি হতে পারতাম? আমি কি ওই মাঝিটি হতে পারতাম না? মাঝি হওয়া সুখকর নয়, আমি জানি, কিন্তু ওই মাঝিটিকে, তার নৌকোটিকে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি দেখতে পাই-স্বচ্ছ পর্দার আড়ালে তার নৌকো ভাসছে। কেনো দেখতে পাই। একবার দূর থেকে জঙ্গলের ভেতর আমি একটি বাঁশের ঘর

দেখেছিলাম, কোনো মানুষ দেখি নি; ওই ঘরটিকে আমার মনে পড়ে। আমি কি ওই ঘরে থাকতে পারতাম না? ওই গরুগুলো, ওই নৌকো, ওই বাঁশের ঘরের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু ওগুলোকে আমি হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাই; কোনো কালে ওগুলোর সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিলো; ওগুলোকে আমি ভুলে গেছি; আমার ভুলে যাওয়ার অতল গভীরতা থেকে মাঝেমাঝে ওগুলো জেগে উঠে আমাকে সুখে ভরে দিচ্ছে। আমার জীবন একটা ছকের ভেতর বাধা পড়ে গেছে, আমি খুব প্রচণ্ডভাবেই তা টের পাই; অনেকের কাছেই ওই ছক খুব আকর্ষণীয়, আমার কাছেও; কিন্তু ছকের বাইরের নৌকো আর ঘাস আর বাঁশের ঘর আমাকে কেনো বিহ্বল করে তোলে?

আমার দিকে তাকিয়ে কেউ বুঝে উঠতে পারে না আমার ভেতরে একটি মেঠোপথ আছে, যে-পথ দিয়ে ভোরবেলা একটি চাষী তার গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়; একটি নদী আছে, ছোট্ট, তাতে একটি মাঝি নৌকো বায়; বনের ভেতরে একটি বাঁশের ঘর আছে, তার চারপাশে কাউকে দেখা যায় না। আমি চাই না কেউ বুঝে উঠুক; কেউ আমার ভেতরের চাষীটিকে, মাঝিটিকে, ঘরটিকে দেখে ফেলুক। আমি চাই, হয়তো চাই, আমি চাই কি না আমি জানি না, সবাই বাইরের আমাকে দেখুক, আমার বাইরটাকে দেখুক; আমার ভেতরটাকে দেখে ফেললে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়বো, যারা দেখবে তারা খুব বিচলিত হয়ে পড়বে। দক্ষ আমলা বলে আমার সুনাম রয়েছে (আমলা শব্দটিই আমরা কেউ পছন্দ করি না, আমাদের সামনে কেউ বলে না, পেছনে সবাই'বলে), যা অনেকের কাছে দুর্নাম; পেশায় আমি খারাপ উন্নতি করি নি, সবচেয়ে উঁচু পদটিতে আমার বয়সের অনেকের আগেই আমি পৌঁছে যাবো মনে হচ্ছে; আমি অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র; তবে এ-সবই আমার কাছে হাস্যকর, তুচ্ছ, যদিও তা আমি কখনোই কাউকে বুঝতে দিই নি, অর্থাৎ এমন কিছু করি না যাতে তারা বুঝে উঠতে পারে। কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয় আমার কাছে, যদিও

ধুলোকণাটিকেও আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি; মানুষও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও অন্যরা মানুষকে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারচেয়ে আমি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি মানুষকে। একটি মানুষ সৃষ্টি করি নি বলে ডলির হাহাকারের শেষ নেই, তার হাহাকারকে আমার নিরর্থক মনে হয়; ওই হাহাকার, আমার মনে হয়, আন্তরিক নয়, তা দুর্মর প্রথার চিৎকার ও আড়ম্বর। কী হতো যদি আমার দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, বা তিনটি মেয়ে, বা চারটি ছেলে, বা দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে, বা শুধুই একটি মেয়ে, বা একটি ছেলে থাকতো? কী সুখ পেতাম আমি তাদের ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে? ইস্কুল থেকে এনে? বুকে জড়িয়ে ধরে? তারা হয়তো এখন দেশেও থাকতো না; তাদের বিদেশে পাঠিয়ে গৌরব উপভোগ করে কী সুখ পেতাম? সুখের কথাই আমার কখনো মনে পড়ে না।

ডলি একদিন বলে, একটা দুর্ঘটনাই আমার জীবনটাকে বদলে দিলো; নইলে অন্য রকম হতো।

আমি বলি, দুর্ঘটনার কাজই হঠাৎ বদলে দেয়া, সুন্দরকে অসুন্দর করে তোলা, স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা।

ডলি বলে, তোমার দর্শন রাখো, এসব আমার শুনতে ইচ্ছে করে না।

আমি বলি, দেলোয়ারকে তোমার মনে আছে?

ডলি বলে, মনে থাকবে না কেনো? আমি তো পশু নই; সে আমার স্বামী ছিলো।

আমি বলি, কোনোদিন তো বুঝতে দাও নি।

ডলি বলে, তোমাকে বুঝতে দিয়ে কী হবে?

আমি বলি, একজনের সাথে থেকে আরেকজনের কথা বলতে হয়তো তোমার বেঁধেছে।

ডলি বলে, তোমার কি দেলোয়ারকে মনে পড়ে না?

আমি বলি, না।

ডলি বলে, আজকাল আমার মনে হয় তুমি আমাকে ভাগিয়ে এনেছে।

আমি বলি, আমি খুব খারাপ কাজ করেছি।

ডলি বলে, হ্যাঁ, খারাপই করেছে।

আমি বলি, তুমি নাও ভাগলে পারতে।

ডলি বলে, তখন তোমাকে বিশ্বাস করার মতো মনে হয়েছিলো।

আমি বলি, আমি কি অবিশ্বাসের কোনো কাজ করেছি?

ডলি বলে, তোমার সাথে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমি বলি, যে-কোনো মানুষের সাথেই দীর্ঘকাল থাকা ক্লান্তিকর।

ডলি বলে, ক্লান্তি থেকে আমি একটু মুক্তি চাই।

আমি বলি, তুমি কি আমাকে ছেড়ে অক্লান্তিকর কারো কাছে যেতে চাচ্ছো?

ডলি বলে, না, এই বয়সে তোমাকে ছেড়ে গিয়ে কী হবে? আমার কোনো নতুন জীবন হবে না, বরং কলঙ্ক হবে।

আমি বলি, কলঙ্কের ভয় করছো কেনো?

ডলি বলে, কলঙ্কের ভয়েই তো কিছু করে উঠতে পারলাম না, তোমার সাথে পড়ে রইলাম।

আমি বলি, খুব ভুল করেছে; আমার যদি মনে হতো তোমার সাথে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাহলে ছাড়াছাড়ি করে ফেলতাম, কলঙ্কের ভয় করতাম না।

ডলি বলে, তোমরা আমলারা তো এমনই।

আমি বলি, তাহলে কী করতে চাও?

ডলি বলে, আমি কয়েক মাসের জন্যে লন্ডন যেতে চাই।

আমি বলি, তাতে কি ক্লান্তি কাটবে?

ডলি বলে, গিয়ে দেখি।

ডলি লন্ডনে তার বোনের বাসায় বেড়াতে চলে যায়। সে-সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে আমাকে থাকতে হয়, আমি তাকে বিদায় দিতে যেতে পারি নি। ডলিকে বিদায় দিতে যাওয়ার জন্যে আমার মনে কি কোনো আবেগ ছিলো? আমি তেমন কোনো আবেগ বোধ করি নি; মনে হয় নি যে তাকে অনেক দিন দেখবো না, না দেখে কষ্ট হবে। ডলিরও কি কোনো আবেগ বোধ হয়েছিলো? ওই সন্ধ্যায় বৈঠক ছিলো বলে আমার ভালোই লেগেছে। আর সে যে লন্ডন যাচ্ছে দুপুরবেলাও তার আচরণ দেখে কেউ বুঝে উঠতে পারে নি; এমন কি আমারও মনে হচ্ছিলো সে হয়তো যাওয়া বাতিল করে দিয়েছে। শুধু দুপুরে যখন আমি বেরোতে যাচ্ছি সে সন্ধ্যায় গাড়িটি পাঠিয়ে দিতে বলে, বিমানবন্দরে যাবে বলে। আমি ড্রাইভারকে একবার বলি, এবং তারপর ভুলে যাই; সন্ধ্যার বেশ পর বৈঠক থেকে বেরিয়ে গাড়ি খুঁজি, না পেয়ে খুব উত্তেজিত বোধ করি। আমি হেঁটে হেঁটে বেইলি রোডে ফিরি, এবং বাসায় ঢুকতেই মনে পড়ে যে ড্রাইভার হয়তো ডলিকে নিয়ে বিমানবন্দরে গেছে। নিজেকে আমার খুব হাল্কা লাগে।

অনেক দিন পর আমার ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করে; ক্লাবে গিয়ে আমি সোজা দোতলায় উঠে যাই, নতুন কার্পেটের গন্ধটা আমার ভালো লাগে, একটি তাসের টেবিলে বসে পড়ি, পাঁচশো টাকার চাকতি কিনি। চাকতিগুলো ধরতে আমার সব সময়ই শিশুর অনুভূতি হয়, নিজেকে

বয়স্ক মনে হয় না, একরাশ খেলনা নিয়ে খেলছি মনে হয়। বেশ ভালো তাস পেতে থাকি, ভালো তাস পেতে পেতে আমার ঘেন্না লাগতে থাকে; উঠে পড়তে ইচ্ছে হয়, তবে উঠে পড়াটা রীতির মধ্যে পড়ে না, কয়েক হাজার টাকা আমি জিতে ফেলেছি, কিন্তু উঠে পড়ার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠি। উঠে পড়ার ভালো উপায় হচ্ছে হারতে থাকা; আমি হারতে শুরু করি, আমার সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে, শেষ চাকতিটি পর্যন্ত আর আমার থাকে না। আমি আবার পাঁচশো টাকার চাকতি কিনি, পৃথিবীর সব বিমান ও বিমানবন্দরের কথা ভুলে যাই; আবার জিততে শুরু করি। এবার আর আমার উঠতে ইচ্ছে করে না, অজস্র চাকতি জমতে থাকে আমার সামনে; চাকতির লাল নীল রঙে আমার চোখ ঝলমল করে উঠতে থাকে। চাকতিগুলোর বিনিময়ে আমি যে-টাকা পাবো, তা আমার কাছে নোংরা লাগতে থাকে; ওই নোংরা নোটগুলো আমি নিতে পারবো না, আমি যখন উঠবো চাকতিগুলো নিয়েই উঠবো। কিন্তু চাকতিগুলো নিয়ে কি ওঠা যাবে, চাকতি নিয়ে যাওয়ার কি নিয়ম আছে? আমি উঠে পড়তে চাই। আমার আবার ঘেন্না লাগতে শুরু করেছে। ডলির বিমান কি উড়েছে; এখন সেটা আকাশের কোথায় আছে? আমার মনে হয় ডলির বিমানটি ভেঙে পড়বে, মনে হয় ভেঙে পড়ুক; একবার আমি মনে মনে বলে ফেলি বিমানটি ভেঙে পড়ুক; আরেকবার আমি বলি বিমানটি ভেঙে পড়ুক। এটা ভাবতে আমার খারাপ লাগে না; আমি নিজেকে বোঝাই এটা ভাবা আমার ঠিক হচ্ছে না, মনে মনে আমি যা বলেছি, তাতে আমি অপরাধ করেছি, আমার ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত; আমার দুঃখিত হওয়া উচিত; কিন্তু আমার কোনো দুঃখ লাগে না, মনে কোনো অপরাধবোধ জমে না।

বাসায় ফিরে গিয়েই শুনি টেলিফোন বাজছে; টেলিফোন ধরতে আমার ইচ্ছে করে না। আমি কাপড় বদলাই, তখনও টেলিফোন বাজছে; আমি বাথরুমে যাই, তখনও টেলিফোন বাজছে; আমি চুল আঁচড়াই, তখনও টেলিফোন বাজছে; আমি টেলিভিশন খুলি, তখনও

টেলিফোন বাজছে। কোথাও হয়তো আগুন লেগেছে। কোথাও হয়তো সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোথাও হয়তো সব কিছু প্লাবিত হয়ে গেছে। কোথাও আগুন লাগলে আমার কী, আমি কী করতে পারি? সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে আমার কী করার আছে? আমার কী যদি মহাজগত প্লাবিত হয়ে যায়; একটির পর একটি গ্রহ আর সূর্য যদি প্লাবনের তলে লুপ্ত হয়ে যায়? ওই আগুনের সাথে আমার কি কোনো সম্পর্ক আছে? ওই ধ্বংসের সাথে আমি কি সম্পর্কিত? কী সম্পর্ক আমার প্লাবনের সাথে?

টেলিফোন ধরেই ডলির গলা শুনতে পাই।

ডলি বলে, প্লেন ছাড়তে আরো তিন ঘণ্টা বাকি, এক ঘণ্টা ধরে রিং করছি।

আমি বলি, এইমাত্র বাসায় ফিরলাম।

ডলি বলে, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

আমি বলি, ক্লাবে।

ডলি বলে, আজই ক্লাবে চলে গেছো!

আমি বলি, অনেক টাকা জিতলাম।

ডলি বলে, এয়ারপোর্টে আসো না, আমাকে বিদায় দিয়ে যাও।

আমি বলি, এখন বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

ডলি বলে, অন্য কোনো মেয়েলোক ডাকলে তুমি হয়তো চলে আসতে।

আমি বলি, আমি কি টেলিফোন রেখে দেবো?

ডলি বলে, তাতো দেবেই, আমার কথা শুনতে তোমার ভালো লাগবে কেনো?

আমি বলি, সত্যিই ভালো লাগছে না।

ডলি বলে, তোমার সঙ্গে যেনো আমার আর দেখা না হয়।

আমি বলি, তা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

ডলি বলে, আমি না ফিরলে আমাকে তুমি আর ফিরিয়ে নেবে না?

আমি বলি, এসব আমি এখন ভাবছি না।

ডলি বলে, আজ থেকে ভাবার অবসর পাবে।

ডলি টেলিফোন রেখে দেয়। আবার কিছুক্ষণ পর টেলিফোন বেজে ওঠে।

ডলি বলে, তুমি চিরকাল আমাকে একলা রেখে দিলে।

আমি বলি, তার জন্যে আমি দুঃখিত।

ডলি বলে, এয়ারপোর্টেও আমি একলা।

আমি চুপ করে থাকি। আমার বলতে ইচ্ছে হয়, এয়ারপোর্টে একলাই আমার ভালো লাগে, কিন্তু বলি না। সবার ভালো লাগার প্রকৃতি একরকম নয়।

ডলি বলে, আমার ইচ্ছে হয় প্লেনটা যেনো ভেঙে পড়ে।

আমি বলি, ভেঙে পড়বে কেনো?

ডলি বলে, তাহলে আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না।

ডলি ফোন রেখে দেয়।

ডলির প্লেন যদি সত্যিই ভেঙে পড়ে? তাহলে ওই ভেঙে পড়ায় আমার কি কোনো হাত থাকবে; আমি কি মনে করবো যে ভেঙে পড়ায় আমার একটি মানসিক ভূমিকা ছিলো? যদি তখন সবাইকে আমি বলি বা বিবৃতি দিই যে প্লেনটা ভেঙে পড়ুক এমন কামনা আমি করেছিলাম, ওই কামনা আমার ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছিলো, সবাই আমাকে

কি পাগল না অপরাধী ভাববে? অনেক রাতে আমি আকাশে প্লেনের গম্ভীর আকাশ-ফাড়া শব্দ শুনতে পাই, এমন শব্দ যেনো প্লেনটি পাথর ভেঙে ভেঙে এগোচ্ছে, আর বলে যাচ্ছে ভেঙে পড়বো, ভেঙে পড়বো। ছেলেবেলায় কোনো একটানা শব্দ শুনলেই আমার ভালো লাগে এমন কোনো শব্দ শুনতে শুরু করতাম : রেলগাড়িতে উঠলেই কখনো শুনতাম চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি, কখনো আবার আসবো, আবার আসবো, কখনো নদীতে অনেক পানি, নদীতে অনেক পানি, কখনো ইস্কুল বন্ধ, ইস্কুল বন্ধ, কখনো লাল ঘুড়ি, লাল ঘুড়ি। আমার যা শুনতে ইচ্ছে করতো, তাই শুনতে থাকতাম। এবার আমি ভেঙে পড়বো না, ভেঙে পড়বো না শুনতে থাকি, শুনতে শুনতে বিমানের শব্দ আকাশে মিলিয়ে যায়; তারপরও শুনতে থাকি ভেঙে পড়বো না, ভেঙে পড়বো না, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হয় আমি যেনো শুনছি ভেঙে পড়বো, ভেঙে পড়বো।

বয়স কতো হলো আমার? চুয়ান্নো? আমার বয়স কত হলো, প্রশ্ন করে জানতে হয় না; আমার বয়স কতো বছর-মাস-দিন, প্রত্যেক ভোরেই মনে পড়ে; কখনো আমি হেসে উঠি কখনো ভয় পাই। হেসে ওঠার ব্যাপারটি বেশি পুরোনো নয়, এক দশকের মতো; ভয় পাওয়ার ব্যাপারটিই পুরোনো,–আমি ভয় পেয়েই জন্ম নিয়েছিলাম এবং জন্ম নিয়েই ভয় পেয়েছিলাম। মৃত্যু? মনে পড়লে হেসে উঠি এখন, এবং যেহেতু মাঝেমাঝেই মনে পড়ে, ভুলে থাকতে পারি না, তাই মাঝেমাঝেই হেসে উঠি। ডলির সামনেই হেসে উঠেছিলাম একদিন, যা আমার ঠিক হয় নি; ডলি এটাকে কোনো গূঢ় রহস্যময় সত্যের সূত্র মনে করে সত্য উদ্ধারের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলো। ঘরে আর বারান্দায় হেঁটে হেঁটেই আমি শেভ করি; সেদিন শেভ করতে করতে, হয়তো হাতে কালোর সাথে গুঁড়োগঁড়ো শুভ্রতার মিশ্রণ দেখে, আমার মৃত্যুর কথা মনে পড়েছিলো; আমি হেসে উঠেছিলাম।

ডলি বলেছিলো, হাসলে যে।

আমি বলেছিলাম, হাসি পেলো।

ডলি বলেছিলো, খামোখা মানুষের হাসি পায় না কি?

আমি বলেছিলাম, অনেকটা খামোখাই।

ডলি বলেছিলো, আমার বিশ্বাস হয় না; নিশ্চয়ই তোমার কোনো গোপন কথা মনে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, খুবই গোপন কথা।

ডলি বলেছিলো, তোমার গোপন কথাটি কী জানতে পারি?

আমি বলেছিলাম, তোমাকে বলতে পারবো না।

ডলি বলেছিলো, আমাকে বলবে কেনো, সেক্রেটারির বউকে গিয়ে বলো।

আমি আরেকবার হেসে উঠেছিলাম। ডলিকে বলতে পারি নি শেভ করতে করতে। আমার জরুরি ফাইল নয়, গোপন ফাইল নয়, রাষ্ট্রের অবধারিত উন্নতি নয়-মৃত্যুর কথা মনে পড়ছিলো; মনে হচ্ছিলো এই যে আমি ঘরে আর বারান্দায় পায়চারি করে শেভ। করছি, একদিন আমি শেভ করবো না, শেভারের ঝিঁঝি থেমে যাবে। আমার মনে দুঃখ জাগে নি,

আমি ভয় পাই নি, আমার হাসি পেয়েছিলো। অনেক দিন ধরেই মৃত্যুর কথা মনে পড়লে আমার হাসি পায়; আর এমন এক সময় ছিলো যখন ভয়ে বুক কাঁপতো। কিন্তু আমি হেসে উঠি কেনো? মৃত্যু তো হাস্যকর ব্যাপার নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়? পার্কে আর লেকের পারে বন্ধুদের আর সহকর্মীদের আর অচেনা জীবনমুখিদের যখন দ্রুত হাঁটতে দেখি, আমার হাসি পায়; মনে হয় তারা মৃত্যুর আগে আগে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তারা দেখতে পাচ্ছে মৃত্যু তাদের থেকে মাত্র এক পদক্ষেপ পেছনে, তাই তারা এক পা আগে আগে দ্রুত হাঁটছে। কতো দিন পারবে? খুব দণ্ডিত মনে হয় তাদের। বেঁচে থাকার জন্যে কী আপ্রাণ ইতর লোলুপতা। কেনো বেঁচে থাকতে হবে? এক সময় কেনো থেমে যেতে হবে না, মরে যেতে হবে না, মিশে যেতে হবে না, নামপরিচয়হীন হয়ে যেতে হবে না? কী পার্থক্য। পঁচিশ আর পঁচাশির মধ্যে পাঁচ লক্ষ বছর বাঁচতে না পারলে পঁচাশি বছর বেঁচে থেকে কী লাভ? বাল্যকালে আমার পাঁচ হাজার বছর পাঁচ লক্ষ বছর পাঁচ কোটি বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছে হতো। মানুষ মরে যায়, এটা কত বছর বয়সে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মনে নেই; মনে পড়ে বোঝার পর আমি ঘুমাতে গিয়েই মাকে জড়িয়ে ধরতাম; নিঃশব্দে চিৎকার করতাম-আমি মরবো না, মা মরবে না; আর সবাই মরে যাবে, আমি মরবো না, মা মরবে না। আমার জগৎ মৃত্যুতে ভরে গিয়েছিলো, মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়াই ছিলো আমার প্রতিমুহূর্তের সাধনা; মৃত্যুই ছিলো আমার প্রত্যেক মুহূর্তের দেবতা। তখনো জানতাম না যে মানুষ সব কিছু হিশেব করতে পারে; আমিও হিশেব করতে শিখতে থাকি, এবং আমি অনেকটা মেনে নিই যে আমিও মরবো, মাও মরবে। কিন্তু আমি সময় বাড়াতে থাকি, মৃত্যুর সাথে সংখ্যার খেলায় মেতে উঠি, যেনো আমি সংখ্যা দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবো।

বিছানায় শোয়ার পরই কে যেনো আমাকে জিজ্ঞেস করতো, কতো বছর বাঁচতে চাও তুমি?

আমি বলতাম, পাঁচ শো বছর।

হাজার শেখার পর আমি সংখ্যাটিকে একটু বদলে দিই।

বিছানায় শোয়ার পর যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো, কত বছর বাঁচতে চাও তুমি?

আমি বলতাম, পাঁচ হাজার বছর।

লাখ শেখার পর আমি সংখ্যাটিকে আরেকটুকু বদলে দিই।

বিছানায় শোয়ার পর যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো, কত বছর বাঁচতে চাও তুমি?

আমি বলতাম, পাঁচ লাখ বছর।

কোটি শেখার পর আমি সংখ্যাটিকে আরেকটুকু বদলে দিই।

বিছানায় শোয়ার পর যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো, কতো বছর বাঁচতে চাও তুমি?

আমি বলতাম, পাঁচ কোটি বছর।

পাঁচ কোটি বছর বলতে বলতে আমার ক্লান্তি ধরে যায়, ঘেন্না লাগে, এবং এক সময় আমি মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। মৃত্যুকে আমার অবাস্তব মনে হয়; যদিও আমি চারদিকে মৃত্যু দেখি, মাঝেমাঝে মৃত্যুর ব্যাপক প্রচণ্ডতা দেখি, তবু আমার সঙ্গে মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। বাবা যে-দিন মারা যান আমি ঢাকায় ছিলাম না, কয়েক শো মাইল দূরে ছিলাম; টেলিফোনে যখন সংবাদটি পাই তখন আমি একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেখার জন্যে বেরোচ্ছিলাম। টেলিফোন ধরেছিলেন সেখানকার প্রধান কর্মকর্তা; তিনি ধরার পরই বেলার কান্না শুনে নিজেই হাহাকার করে ওঠেন। বেলা সংবাদ দেয়ার থেকে কেঁদেছিলো বেশি, আমাকে ডাকার থেকে বাবার মৃত্যুর কথাই তাকে শুনিয়েছিলো বিস্তৃতভাবে, এবং শেষে আমাকে ডেকেছিলো। তিনি ঘোষণাই করে দেন যে স্যারের পিতা পরলোকগমন করেছেন–তিনি জান্নাতবাসীই বলছিলেন, একবার আমার দিকে তাকিয়ে পরলোকগমন বলতে শুরু করেন, তাই তিনি প্রকল্প পরিদর্শনে যাবেন না; কিন্তু আমি যখন প্রকল্প দেখতে বেরিয়ে পড়ি সবাই আহত বোধ করে। মৃত্যুকে আমি তার প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছি না দেখে, এবং তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যুর শোক বিশদভাবে উপভোগ করতে না পেরে হতাশ হয়। বাবার লাশ আমার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিলো, এবং পরদিন আমি ফিরে দেখতে পাই সবাই বাস্তবে ফিরে এসেছে, কেউ আর শোকে ভেঙে পড়ছে না। বাবা তখন লাশমাত্র, বাবা নয়; শোকের থেকে তখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাকে বনানীতে কবর দেয়া।

আমি বলেছিলাম, আজিমপুরেই তো কবর দেয়া যেতো।

যেনো আমি একটি পবিত্র গৃহকে অপবিত্র করে ফেললাম, আমার কথাটি সবার মনে এমনভাবেই আঘাত করে; বেলা চিৎকার করে ওঠে, অন্যরাও নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে।

ডলির আব্বা বলেন, তোমার আব্বাকে আজিমপুরে কবর দেয়া যায় না, বনানীতেই দিতে হয়; নইলে সম্মান থাকে না, তোমার সম্মান থাকে না।

মৃত্যুর সাথেও সম্মানের ব্যাপার জড়িয়ে আছে, আমি চুপ করে থাকি; এবং বাবার জন্যে বনানীর ব্যবস্থা করে দিই। বাবার একগুচ্ছ পাসপোর্ট আকারের ছবিও তৈরি করা হয়ে গেছে; আমার কাজ ওগুলোকে পত্রিকায় পৌঁছে দেয়া;–আমাকে যেতে হবে না, ছবি ও সংবাদ নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব নেই, আমার কাজ পত্রিকায় ফোন করা, যাতে ছবি আর ইন্নালিল্লাহেসহ মৃত্যু আর কুলখানির সংবাদ ছাপা হয়। বাবা যে আজীবন সমাজসেবক আর শিক্ষানুরাগী ছিলেন, পাড়াকমিটির সহসভাপতি ছিলেন, তা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে; তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আমার নামটি সব পরিচয়সহ সবার আগেই লেখা হয়েছে।

আমি বলি, বাবার মৃত্যুর সংবাদ পত্রিকায় বেরোনোর কোনো দরকার নেই।

সবাই বজ্রাহত বোধ করে।

ডলির আব্বা বলেন, তোমার আব্বার মৃত্যুর খবর পত্রিকায় বেরোবে না তা কি হয়?

আমি বলি, জীবনে বাবার নাম কখনো পত্রিকায় ছাপা হয় নি।

তিনি বলেন, এখন বেরোনো দরকার, নইলে তার ও তোমার সম্মান থাকে না।

আমি বলি, বাবা বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না; পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখলে আমার ঘেন্না লাগবে, তাকে আমার বাবা মনে হবে না।

সবাই হাহাকার করে ওঠে।

মানবতাবাদী জনদশেক বন্ধু

বছরখানেক ধরে আমার মানবতাবাদী জনদশেক বন্ধু বেশ বিব্রতভাবে একটি মানবতাবাদী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে আসছেন আমার কাছে;–বেশি জনকে তারা এ-মুহূর্তে বলতে পারছেন না, খুব চুপচাপ কাজটি তাদের করতে হচ্ছে, আমাকে তারা বলার মতো বলে মনে করছেন, তাঁদের সাথে আমি সর্বাংশে একমত, কিন্তু তবু তাঁদের প্রস্তাবে আমার ভেতরে আমি হাসতে থাকি। তারা বুঝতে পারছেন বা মনে করছেন তাদের আর বেশি দিন নেই,-আমার থেকে তারা পনেরো বছরের মতো এগিয়ে, তাঁরা মৃত্যুকে উদারভাবে গ্রহণ করেছেন, তবে দেহগুলো কীভাবে রেখে যাবেন, তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। দেহ মানুষের চিরকালের উদ্বেগের সম্পদ। তারা চান না তাদের দেহগুলো নিয়ে আনুষ্ঠানিকতায় মেতে উঠুক তাদের সন্তানেরা, দেহগুলো সামনে রেখে আবৃত্তি করা হোক বিভিন্ন অবান্তর শ্লোক, ওই শ্লোকে তারা বিশ্বাস করেন না, যেমন আমিও করি না; তারা বিশ্বাস করেন মানুষের কল্যাণে। কল্যাণ নিয়েই তাদের সাথে মিল হচ্ছে না আমার। তারা শ্লোকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কল্যাণে বিশ্বাস করেন; আর আমি শ্লোক আর কল্যাণ কোনোটিতেই বিশ্বাস করি না। তারা চান তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মানুষের কল্যাণে দান করে যেতে-অক্ষি, অস্থি, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড সর্বাঙ্গ; শুধু তারা হয়তো দান করতে পারবেন না তাঁদের সেই সংরক্ত প্রত্যঙ্গগুলো যা তাদের পাগল করে রাখতে। ওগুলো হয়তো এখনো কারো দরকার পড়ছে না। কিন্তু দেশে এমন বিধান নেই, দেহ দান করা যায় না–যদিও ‘দেহদান’ করা যায়; তারা তাই একটি ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করতে চান, যার কাজ হবে মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের দেহগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়া, যাতে শল্যরা ঠিক সময়ে খুলে নিতে পারেন তাঁদের প্রত্যঙ্গগুলো। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দেয়ার জন্যে তাঁরা চাপ দিচ্ছেন না, তারা আমাকে চাচ্ছেন ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য হিশেবে, যাতে আমি–আশা করা যাচ্ছে আমার প্রত্যঙ্গগুলো

তাদেরগুলোর থেকে পনেরো বছর বেশি টিকবো, আমারগুলো পনেরো বছর পর কাজ শুরু করেছে–তাঁদের দেহগুলো ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি। এখানেই তাদের সাথে আমার মিলছে না; ঠিক জায়গা কোনটি তা ঠিক করে উঠতে পারছি না আমরা। তারা বলছেন ঠিক জায়গা হচ্ছে সে-প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা তাদের চোখ, অস্থি, বৃক্ক খুলে নেবে; তারপর মানুষের কল্যাণে লাগাবে; আর আমি বলছি ওগুলো ঠিক জায়গা নয়, আমার কাছে ওগুলো ঠিক জায়গা মনে হয় না।

আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আমার মৃত্যুর পর মানুষের কল্যাণে লাগবে-শুনে আমার দীর্ঘ নিঃশব্দ হাসি পায়। কল্যাণ, কল্যাণ; ঘেন্না ধরে গেছে আমার কল্যাণের নির্ঘুম সংরক্ত রুগ্ন উন্মাদনায়। আমার প্রত্যঙ্গগুলোর জন্যে আমার মায়া হয়; ওগুলোকে আরো খাটতে হবে; গিয়ে লাগতে হবে কারো চোখের কোটরে, বৃক্কের শূন্যস্থানে; উপস্থিত থাকতে হবে শ্রেণীকক্ষে; মানুষের অনন্ত কল্যাণের জন্যে সক্রিয় হয়ে থাকতে হবে ওগুলোকে। কেনো? কী অপরাধ করেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো? আমার প্রত্যঙ্গগুলো কোনো অবান্তর ঐশ্বরিক শ্লোকের জন্যে হাহাকার করছে না, কোনো শ্লোকই ওগুলোর দরকার নেই; আমার মনে হয় ওগুলো নিষ্ক্রিয়তা। চায়, নামপরিচয়হীন হয়ে যেতে চায়। আমার প্রত্যঙ্গগুলো কোনো খালের বা নদীর ঘোলাটে জলে পড়ে আছে, ওগুলোর কোনো কাজ নেই, ওগুলোর দিকে কারো দৃষ্টি নেই, বা ওগুলো পড়ে আছে পতূপ আবর্জনার নিচে, মলের স্রোতের নিচে, ওগুলো। কোনো কাজ করছে না, কোনো কল্যাণ করছে না, এমন ভাবতে আমার ভালো লাগে। কাজকাম করে ক্লান্ত হয়ে গেছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো, ওগুলো ভুলে যেতে চায় জীবন আর কল্যাণ, জীবন আর কল্যাণও ওগুলোকে ভুলে যাক। যার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, যার মণিতে কোনো আলো ঢোকে না, সে শিখুক না একটু

অন্ধত্বকে মেনে নিতে। যার বৃক্ক নষ্ট, সে একটু ভালোবাসুক না তার নষ্ট বৃক্ককে। কেনো শুধু বেঁচে থাকতে হবে? বেঁচে থাকাকে পেশা করে তুলতে হবে?

আমার চোখ দুটি যদি অন্ধকার হয়ে যায়, পচে যায় যদি আমার বৃক্ক? নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে চায় যদি আমার হৃৎপিণ্ড? আমি অন্য কারো চোখ ধার করবো? ডলির বৃক্ক নিয়ে বেঁচে থাকবো? ডলি কি আমাকে দেবে তার বৃক্ক? আমার কোনো ইচ্ছে নেই, আমি ওভাবে বেঁচে থাকতে চাই না। আমাকে কোনো খালে ফেলে দেয়া হোক, বা কোনো নদীতে ফেলে দেয়া হোক কোনো জঙ্গলে, যেখানে জলে আর বৃষ্টিতে পচবো আমি; ওগুলো পড়ে থাকুক আবর্জনা আর মলস্রোতের নিচে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক; আমি চাই না। আজ থেকে দশ হাজার বছর পর কেউ খুঁজে পাক আমার অস্থি। আমি সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে চাই, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাই। মিশে যাওয়া, গলে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। আমার ভালো লাগে। ছোটোবেলায় একটি ঝামাপাথর কোথায় যেনো পেয়েছিলাম; সেটি দিয়ে আমি আমার পায়ের গোড়ালি ঘষতাম। কে যেন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো ঝামাপাথর দিয়ে গোড়ালি ঘষলে গোড়ালি সুন্দর দেখায়, পেছন দিক থেকে দেখতে ধবধবে চাঁদের মতো লাগে; আমি গোশলের সময় পায়ের গোড়ালি ঘষতাম। পাথরটি দিয়ে; এবং একদিন দেখি যে ওই শক্ত পাথরটি অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে; মসৃণ হাড়ের মতো লাগছে ওটিকে। যেদিন পাথরটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায়, সেদিন ওটিকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। ধীরেধীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়া আমি অনেক দেখেছি, যা কিছু ক্ষয় হয়েছে সে-সবকেই আমি গোপনে ভালোবেসে ফেলেছি। ক্ষয় হয়ে যাওয়া আমার প্রতিটি পেন্সিলকে আমি আজো ভালোবাসি, ইরেজারকে আজো ভালোবাসি, মোমকে ভালোবাসি; এবং চোখ বুজেই দেখতে পাই। যা কিছু ক্ষয় হয় না, তার জন্যে আমার কোনো মায়া হয় নি; সেগুলোকে মাঝেমাঝেই আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, এবং ভুলে গেছি। আমার একটি সুন্দর পেপারওয়েট ছিলো, সেটি কখনো ক্ষয় হয় নি; আমি মনে মনে চাইতাম পেপারওয়েটটি ক্ষয় হয়ে যাক, কিন্তু সেটির

ক্ষয় হয়ে যাওয়ার শক্তি ছিলো না; আমি একদিন সেটিকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমিও ক্ষয় হয়ে যেতে চাই; অবিনশ্বর হতে চাই না।

দুপুরে বাসায় ফিরে বারান্দায় হেমন্তের রোদ দেখে আমার ঘুম পায়; আমি চাদর বিছিয়ে বারান্দায়, রোদে, শুয়ে পড়ি, এবং ঘুমিয়ে পড়ি। আগে আমি রোদে আর মেঝের ওপর এমনভাবে ঘুমোই নি, এতো সুখও পাই নি। ঘুম ভেঙে আমি কাজের লোকটিকে ডাকি–তার নাম আমি মনে রাখতে পারি না, একেকবার একেক নামে ডাকি, সব। নামেই সে সাড়া দেয়, এটা আমার সুখের মতো লাগে; সে প্রথমেই জানায় তিনজন অধস্তন আমার জন্যে দু-ঘণ্টা ধরে বসে আছে। আমি তাদের বারান্দায় নিয়ে আসতে বলি; তারা এমনভাবে আসে যেনো শোকে ভেঙে পড়েছে, আর কষ্টে কাতর হয়ে আছে; তাদের নিজেদের কষ্টে নয়, আমার জন্যে কষ্টে-পরের জন্যে কষ্ট বোধ করতে হচ্ছে। বলেই তাদের বেশি কষ্ট হচ্ছে। আমি মেঝের ওপর তাদের বসতে বলি; তারা খুব বিস্মিত হয়; এবং আমি যে মেঝের ওপর হেমন্তের রোদে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাদের কাছে এটা আপত্তিকর মনে হয়, তাদের চোখমুখ দেখে আমি তা বুঝতে পারি। হয়তো তারা ঘুমন্ত অবস্থায় একবার উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে গেছে; মেঝে শুয়ে থাকা আমাদের পেশাসম্মত হচ্ছে না বলে তাদের মনে আপত্তি জেগেছে, তাদের বুক কষ্টে ভরে গেছে। তারা আমার সামনে মেঝের ওপর শোকগ্রস্ত মানুষের মতো বসে।

আমি বলি, আপনাদের কোনো আত্মীয়স্বজন কি মারা গেছেন?

তারা একসাথে বলে, না, স্যার, না, স্যার।

আমি বলি, আপনাদের তাহলে এমন শোকগ্রস্ত মনে হচ্ছে কেনো?

তারা বলে, স্যার, আপনাকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখে আমাদের খুব কষ্ট লেগেছে।

আমি জানতে চাই, কেনো?

তারা বলে, স্যার, আপনি মেঝের ওপর ঘুমোবেন, আমরা কখনো ভাবতে পারি নি।

একজন বলে, স্যার, আমাদের মনে হচ্ছে আপনি ভালো নেই।

আরেকজন বলে, ভাবীর অভাবে আপনি হয়তো ভালো নেই।

আমি বলি, আমি খুব ভালো আছি, ভালো আছি বলেই মেঝেতে ঘুমিয়েছি।

একজন বলে, আপনার মতো মানুষ মেঝের ওপর ঘুমোচ্ছ, আমরা ভাবতে পারি না; আপনার মতো মানুষ ভালো থাকলে কখনো মেঝের ওপর ঘুমোয় না।

আমি বলি, মানুষকে কেনো সব সময় ভালো থাকতে হবে?

তারা বিব্রত হয়, এবং বলে, মানুষকে ভালো রাখার জন্যেই তো রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা; আমরা তারই জন্যে কাজ করছি।

আমি বলি, আসলে আপনারা ভালো নেই।

তারা বলে, কেনো স্যার?

আমি বলি, আপনারা ভালো নেই বলে মেঝেতে ঘুমোনোর সুখ বুঝতে পারছেন না।

তারা খুব অবাক হয়।

আমি বলি, আপনাদের আমি একটি অনুরোধ করতে চাই।

তারা বলে, অনুরোধ কেনো স্যার, আদেশ করুন, স্যার।

আমি বলি, আমি ভালো আছি, নিঃসঙ্গতার সুখের মধ্যে আছি, আপনারা এসে আমাকে বিরক্ত না করলে আমি খুশি হবো।

তারা ভয় পায়, বলে, জি, স্যার, জি, স্যার।

আমি একলা থাকার সুখের মধ্যে আছি-অবশ্য ধ্যানট্যান করছি না, কোনো বটগাছের নিচে বা গুহার ভেতরে কোনো সত্য লাভের কোনো বাসনাই আমার নেই, আমি শুধু একলা থাকার সুখে আছি; অফিসে গিয়েই আমার ইচ্ছে করে বাসায় ফিরে যেতে, একলা থাকার মধ্যে ফিরে যেতে। আমার বাসা কখনো খুব কোলাহলমুখর ছিলো না, এখন সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয়ে গেছে; বাসায় দুটি লোক থাকলেও দু-ধরনের শব্দ হয়; ভলি শব্দ একটু বেশিই করতো

বলে আমার মনে হতো। ডলির বিচিত্র রকম স্যান্ডলের শব্দ উচ্চই ছিলো, টেলিফোনেও সে উচ্চস্বরেই কথা বলতো;–এখন ওগুলো নেই, আমি বাড়িটিতে সম্পূর্ণ নিঃশব্দতা অনুভব করতে পারছি। আমার কাজের লোকটি, কী যেনো ওর নাম, দেয়ালের পাশে একটি ছোটো ঘরে থাকে; ওকে দরকার হলে আমি একটি কলিংবেল বাজাই; ও বুঝে গেছে আমি নিঃশব্দতা চাই, তাই নিঃশব্দেই আসে, আর নিঃশব্দেই কথা বলে। ওকে আমার চড়ুইটির থেকেও ভালো লাগে; চড়ুইটিও মাঝেমাঝে চিৎকার করে আমাকে রাগিয়ে দেয়। আমি কি ওই লোকটি হতে পারতাম না, আর ওই লোকটি কি আমি হতে পারতো না? কারো আদেশ শুনে খুব বিনীত হয়ে কাজ করতে কেমন লাগে? আমি যখন কলিংবেল বাজাই, তখন তার কি নিজের কোনো কাজ থাকে না? থাকলে তা ফেলে সে এতো তাড়াতাড়ি কী করে আসে? ওই লোকটিকে দেখে কি কখনো কেউ ভয় পায়? কেউ কি তার আদেশ শুনে পালনের জন্যে ভীত হয়ে ওঠে? ওই লোকটির কি নিজের কাজ করানোর জন্যে অন্য কাউকে আদেশ দিতে ইচ্ছে করে না? মিসেস হামিদউল্লাহ প্রত্যেক দিন ফোন করছেন; মোহাম্মদ হামিদউল্লাহ শহীদ হওয়ার পর দেবরকে বিয়ে করেছিলেন বা দেবরই তাকে বিয়ে করেছিলো;–স্বামীভাগ্যটা তার ভালো নয়, দেবরটিও দুর্ঘটনায় চলে গেছে। তাকে দেখে মনেই হয় না তিনি দুটি স্বামী দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন আমি একলা একলা থেকে থেকে তিনি একলা মানুষের দুঃখগুলো বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করছেন। তাঁর ফোন পেতে আমার খারাপ লাগছে না–তাঁর কণ্ঠস্বরটি কোমল শান্ত বলেই হয়তো, আর তিনি জানিয়েছেন ঘুমোনোর আগেই আমাকে ফোন করতে তাঁর ভালো লাগে। আমারও অনেকটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে তার ফোন পেয়ে ঘুমোনোর; কিন্তু আমি তাকে নিয়ে কোনো কিছু ভাবছি না। তার কণ্ঠস্বরটি এমন যে তা আমাকে কিছু ভাবাচ্ছে না, ঘুম পাড়াচ্ছে।

আমি কেনো শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছি? এই-আমাকে নয়, ছোটো আমাকে। বারবার কেনো মনে হচ্ছে ছোটো আমিই আমি, এই-আমি আমি নই? আমি ছোটো আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, এতে আমার কষ্ট লাগছে; হঠাৎ সে ঝিলিক দিয়ে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে; আমি তাকে পরিপূর্ণ দেখতে চাচ্ছি, কিন্তু তার একপাশ দেখছি, তার এক মুহূর্ত দেখছি; সে মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার কষ্ট লাগছে। দেখছি সে শাওয়ারের নিচে নগ্ন দাঁড়িয়ে আছে, ঝরনা খুলে দিয়েছে, শাওয়ারের নিচে সে লাফাচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে পানি ছিটিয়ে দেয়াল ভিজিয়ে ফেলছে, সব কিছু ভিজিয়ে ফেলতে তার সুখ লাগছে। সাবান মাখতে গিয়ে তার হাত থেকে সাবান পিছলে পড়ছে; সাবান ক্ষয় হচ্ছে দেখে তার সুখ লাগছে। তার মাথায় শাওয়ার থেকে বৃষ্টি পড়ছে, সে চোখ বুজে লাফাচ্ছে। হঠাৎ দরোজা ঠেলে স্নানাগারে মা ঢুকছে, আর সে দু-হাত দিয়ে তার সোনা ঢেকে বসে পড়ছে; ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেছে, মাকেও সে তার লজ্জা দেখতে দেবে না। মা তাকে দেখে খিলখিল করে হাসছে। শাওয়ারের নিচে লজ্জা পেয়ে নগ্ন বসে পড়া আমিটিকেই আমি বেশি দেখি। আমি কি ওই আমিটি হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম? এখন যদি আমি ওই আমিটি হয়ে যাই, আমি কি সহ্য করতে পারবো? আমি তার সব কিছু দেখতে চাচ্ছি, সব কিছু মনে করতে চাচ্ছি; কিন্তু পারছি না। হঠাৎ একটুকু রক্ত চোখে পড়ছে। ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটছে সে, মা তাকে বারবার নিষেধ করেছে, তবুও সে কাটছে; হঠাৎ আঙুলে ব্লেড লেগে গেছে; সে আঙুল চেপে ধরে রক্ত থামাতে পারছে না, চুষতে শুরু করেছে। তার জিভে রক্তের স্বাদ বিচ্ছিরি লাগছে, রক্তের সাথে সে লড়াই করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। তাকে দেখতে আমার সুখ লাগছে;–এখন যদি আমি তাজমহল বা হিমালয় বা নায়াগ্রা বা কোনো নীল লেগুন দেখতাম, বা ঈশ্বর আমার সামনে দেখা। দিতো, তাহলেও এতোটা সুখ লাগতো না। কিন্তু আমি তাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না, যদিও সম্পূর্ণ দেখতে চাচ্ছি; আমি তার প্রত্যেকটি দিন আর প্রত্যেকটি মুহূর্তকে দেখতে চাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না; সব কিছু অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আমার স্মৃতি

কেনো এতো কম? সে কি কখনো জোনাকি দেখেছিলো? কখনো দেখেছিলো দিগন্তের এপার থেকে ওপার ছড়ানো সরষে ফুলের প্রচণ্ড হলুদ পেয়েছিলো তার সুগন্ধ? না, চোখ বুজে আমি কোনো জোনাকি দেখি না, হলুদ দেখি না; কোনো সুগন্ধ পাই না।

ডলি ফোন করেছে। আমি ভয়ে ছিলাম ডলি ফোন করবে, কিন্তু যাওয়ার এক মাসের মধ্যে ফোন করে নি বলে আমার ভয় কিছুটা কেটে গিয়েছিলো; সে ফোন করে আমাকে ভীত করে তুলেছে। আমি ভয়ই পাচ্ছি; তার ফোন পেতে আমার ভয় লাগছে। ডলি দেখতে কেমন? আমি মনে করতে পারছি না। ডলি আমার স্ত্রী ছিলো? তার আগে দেলোয়ারের স্ত্রী ছিলো? ডলি চমৎকার মেয়ে ছিলো? কিন্তু তার ফোন পেতে আমার ভয় লাগছিলো। সে ফোন না করলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম, আমাকে ভুলে গেলেই আমার ভালো লাগতো।

ডলি বলছে, ভেবেছিলাম তুমি ফোন করবে, এক মাসেও তুমি আমাকে ফোন করতে পারলে না?

আমি বলি, ফোন করতে আমার ইচ্ছে করে নি।

ডলি বলছে, আমাকে ফোন করতে তোমার ইচ্ছে করবে কেনো, আমি তো তোমার শত্রু।

আমি বলি, শত্রু বলে নয়, কাউকেই আমার ফোন করতে ইচ্ছে করে না।

ডলি বলছে, তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে।

আমি বলি, আমাকে ক্ষমা কোরো।

ডলি বলছে, তোমার এইসব মহত্ত্ব রাখো, তোমাকে আমি কখনোই ক্ষমা করবো না।

আমি বলি, তুমি নিশ্চয়ই এখন ভালো আছো।

ডলি বলছে, তা তোমার জানার দরকার নেই, জেনে রাখো তোমাকে আমি রেহাই দেবো না।

ডলি ফোন রেখে দেয়। এই ভোরবেলা ডলির আক্রমণে আমার খারাপ লাগে না; আমি বারান্দায় হেঁটে হেঁটে গালে শেভার চালাতে থাকি। ডলি নিশ্চয়ই ভাবছে তার কথা শুনে

আমি বিষে ভরে গেছি, আমার রক্তে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে; যদি জানতে পারে আমার খারাপ লাগে নি, ডলি খুব রেগে উঠবে। এখন ডলির ওখানে গভীর রাত, ডলি ঘুমোয় নি কেন? ডলি কি ঘুমোত পারছে না? কোনো উৎসব থেকে ফিরে তার ইচ্ছে হয়েছে আক্রমণের; এবং আক্রমণ করে সুখে ঘুমোতে যাবে? শেভারের শব্দ আমার ভালো লাগছে, এক ধরনের নিঃশব্দতার শব্দ ওঠে শেভারটি থেকে, আমার ভালো লাগছে। দূরে আমগাছের পাতায় রোদ ঝিকঝিক করছে, আমার মুঠোতে শেভার থেকে কিছুটা কালোর সাথে মেশানো শাদা ঝরে পড়লো, দেখে আমার ভালো লাগলো। কোনো কিছুই আমার আজকাল খারাপ লাগছে না? কিছুই কি আমাকে উত্তেজিত করতে পারছে না? একটি বালক-মন্ত্রী আমার ওপর চেপে আছে, আমার রক্তে জ্বালা ধরার কথা ছিলো, কিন্তু আমার জ্বালা ধরছে না। একটি পাতা ঝরে পড়লো দেখে আমার ভালো লাগলো।

সবাই, আমার কাজের লোকটি পর্যন্ত, ভাবছে আমি কষ্টে আছি, গোপনে একটু করুণাও করছে; আমি কষ্টে নেই;–এবং আমি যে কষ্টে নেই এটা যে কাউকে আমার জানাতে ইচ্ছে করছে না, এতেও আমার সুখ লাগছে। অনেক দিন ধরেই সিগারেট ছেড়ে দেবো ভাবছিলাম, এখন ছেড়ে দেয়ার কথা মনে হচ্ছে না; সিগারেট হাতে নিয়ে খেলতে ইচ্ছে করছে, আগুন না ধরিয়ে তামাকের গন্ধ নিতে, নাকের সামনে ধরে রাখতে, আশ্চর্য সুখ পাচ্ছি। গরম পানিতে হুইস্কি খেতে ভালো লাগছে। আমি কখনো রান্নাঘরে আগে যাই নি, চুলো কখনো ধরাই নি; আজকাল গরম পানির দরকার হলে আমিই চুলো ধরাই, ধরাতে আমার ভালো লাগে। চুলো ধরাতে ধরাতে মনে হয় আমি কখনো কাদামাটিতে লাঙ্গল চালাই নি; লাঙ্গল চালাতেও আমার ভালো লাগবে। পানি গরম করে আমি গ্লাশে ঢালি, গ্লাশটি গোপনে ঝিলিক দিয়ে গরম হয়ে ওঠে, গরম আমার আঙুলের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে; আমি গ্লাশের শূন্যতাটুকু হুইস্কি দিয়ে পূরণ করি, এবং চুমুক দিতে থাকি। আমার সুখ লাগে। আমার মনে পড়ে আমি গ্রামে কখনো ঘুমোই নি, কখনো টিনের ঘরে ঘুমোই

নি; পুকুরে কখনো সাঁতার কাটি নি, আমি সাঁতার কাটতেই জানি না; একবার শিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, তখন আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, সে-সাঁতার আমি মনে রাখতে পারি নি। আমি যে-বালকটিকে শাওয়ারের নিচে ন্যাংটো দেখতে পাই, সে কি ন্যাংটো সঁতার কাটতে পারতো না। কোনো পুকুরে? যখন জোয়ার আসতো, যখন পানিতে টান ধরতো? লাফিয়ে পড়তে পারতো না পুকুরের পাড় থেকে টলটলে জলে? সাঁতার কাটতে কাটতে শাপলা তুলতে পারতো না কোনো বিলে? আচ্ছা, শাপলা দেখতে ঠিক কেমন? আমার শাপলা দেখতে ইচ্ছে করছে।

অনেক দিন ধরে আমি কোনো নারীশরীরের সঙ্গে মিলিত হই নি। হুইস্কি খেতে খেতে নারীশরীরের কথাও মনে পড়ছে; আমি উত্তেজিত বোধ করছি না, অভাব বোধ করছি না, কাম বোধ করছি না। কামকে আমি ঘেন্না করি না, কখনোই করবো না; কামকে আমার মানুষের শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতা মনে হয়, আমি সেই শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্টকে বোধ করছি না। ডলিকে আমার মনে পড়ছে না, মিসেস হামিদউল্লাহকে মনে পড়ছে না, সুজাতাকে মনে পড়ছে না, রেহনুমাকে মনে পড়ছে না, দিলশাদকে মনে পড়ছে না; আমার মনে পড়ছে অঘ্রানের নদীপারের কাশগুচ্ছকে। এ-কাশগুচ্ছ যদি আমি ছেলেবেলায় দেখতাম, হয়তো আমার জীবনটিই বদলে যেতো, আমি অন্য কেউ হয়ে উঠতাম; সেই আমাকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগতো। এক অঘ্রানে আমাকে এক নদীপারে যেতে হয়েছিলো, নদীটি দেখার আগে আমি নদীপারের শাদা, নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক কাশের মেঘ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। সব ধরনের ফুলের মধ্যেই রয়েছে আসক্তি, কামনা, ইন্দ্রিয়ভারাতুরতা- গোলাপ দগদগ করে কামনায়, শিউলি ঝরে পড়ে ক্লান্তিতে; একমাত্র কাশফুলই নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, নিরিন্দ্রিয়, নিষ্কাম। ওই মেঘ দেখামাত্রই আমার ইচ্ছে হয়েছিলো হেঁটে হেঁটে দূর থেকে আরো দূরে চলে যেতে। সে-কাশগুচ্ছকে আমার মনে পড়ছে; ডলিকে মনে পড়ছে না, মিসেস হামিদউল্লাহকে মনে পড়ছে না, সুজাতাকে মনে পড়ছে না, রেহনুমাকে মনে

পড়ছে না, দিলশাদকে মনে পড়ছে না। এই যে আমি এখন গরম পানিতে হুইস্কি খাচ্ছি, এখন যদি ডলি পাশে থাকতো, আমি কি সুখী হতাম? না। যদি মিসেস হামিদউল্লাহ থাকতেন? না। সুজাতা, দিলশাদ, রেহনুমা থাকতো? না। কাশফুল দেখতে পাচ্ছি বলে আমি সুখ পাচ্ছি।

একটি অশ্লীল বই পড়তে ইচ্ছে করছে আমার, কাশের গুচ্ছের সঙ্গে মিশিয়ে একটি অশ্লীল বই পড়তে আর অজস্র অশ্লীল ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে, মানুষ দেখতে ইচ্ছে করছে না। অশ্লীল? কাকে বলে অশ্লীল? ধর্মসচিবের যা ভালো লাগে না? অশ্লীল? মাদ্রাসার গালভগ্নদের যা ভালো লাগে না? রবীন্দ্রনাথের কোনো অশ্লীল বই আছে? নেই? কবিতা? রবীন্দ্রনাথ কেনো কোনো ভয়ঙ্কর অশ্লীল বই লেখেন নি? ভয় করেছিলো? তার মহাপুরুষ হওয়ার সাধ ছিলো? বইগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর অশ্লীল সুন্দর সেই বইটি খুঁজছি আমি, পাচ্ছি না; মেয়েটি গিয়ে শুচ্ছে তার চাকরের ঘরে, পাচ্ছি না। প্রত্যেক বড়ো লেখকের অন্তত একটি করে অশ্লীল বই লেখা উচিত, আমার মনে হচ্ছে, শ্লীলতায় বড়ো বেশি নোংরা হয়ে যাচ্ছে গ্রহ। আমি পুরোনো প্লেবয়গুলো খুঁজছি, খুলতেই একটি মেয়ের রৌদ্রভরা স্তনজোড়া দেখে আমার ভেতর ভোরের রৌদ্র ঢুকে গেলো, আমার ভালো লাগলো। আচ্ছা, আমাকেই যদি ধর্মমন্ত্রণালয়ে বদলি করে দেয়া হয়? তখন ওই বইটি আর এ-ছবিগুলো অশ্লীল হয়ে উঠবে আমার কাছে? বেশ চমৎকার সময় আসবে জীবনে, আমি দিনরাত নামাজরোজা করতে পারবো। ক-বার হজে যেতে হবে বছরে? পুণ্যে দশদিক ভরে উঠবে আমার। আমি এখনই ধর্মমন্ত্রণালয়ে বদলি হচ্ছি না; এখন আমি সেই উপন্যাসটি খুঁজতে পারি, সেই পাতাগুলো পড়তে পারি; এবং প্লেবয়ের পাতার রৌদ্রভরা স্তনজোড়া দেখতে পারি। ওই কাশের গুচ্ছ আর এই রৌদ্রভরা স্তনযুগল আর সেই অশ্লীল বইটি আমাকে সমানভাবে টানছে, কোনোটিকেই আমার পবিত্র-অপবিত্র মনে হচ্ছে না, কোনোটিকেই শ্লীল-অশ্লীল মনে হচ্ছে না; প্রত্যেকটিই আমাকে মুগ্ধ করছে, আমার ভেতরটাকে ভ'রে তুলছে। নদীপারে কাশফুল

দেখে হেঁটে হেঁটে আমার খুব দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করেছিলো, কিন্তু আমি দূরে যাই নি; আর এই রোদভরা স্তনজোড়া দেখেও মাথা ঘুরছে না; আমার ভেতরটা সুখী হচ্ছে।

ডলি টেলিফোন করেছে; সে প্রথমেই বলে, তোমাকে না কি বরখাস্ত করা হচ্ছে?

আমি বলি, তুমি কোথায় শুনলে?

ডলি বলে, দূরে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার সব খবরই আমি রাখি।

আমি বলি, আমাকে বরখাস্ত করা হচ্ছে এমন গুজব তো আমি শুনি নি।

ডলি বলে, মন্ত্রীর সাথে তোমার হাতাহাতি হয়েছে, শুনলাম।

আমি বলি, আমি কি হাতাহাতি করার মতো লোক?

ডলি বলে, তুমি হাতাহাতি না করতে পারো, তবে তোমার যা স্বভাব তাতে অন্যরা তোমার সাথে হাতাহাতি করতে পারে।

আমি বলি, অর্থাৎ দোষটা আমারই?

ডলি বলে, হ্যাঁ।

আমি বলি, তবে আমার সাথে কারো হাতাহাতি হয় নি, মন্ত্রীটির সাথে একটু তর্কাতর্কি হয়েছে।

ডলি বলে, নিজে তো মন্ত্রী হতে পারবে না, তাই মন্ত্রীদের সাথে তো তর্কাতর্কি করবেই; চাকর হয়ে মনিবের সাথে তর্কাতর্কি করা ঠিক না। এই যে এখন বরখাস্ত হতে যাচ্ছো।

আমি বলি, বরখাস্ত হতে আমার আপত্তি নেই।

ডলি বলে, তোমার তো কিছুতেই আপত্তি নেই, এই যে আমি ছ-মাস ধরে বিদেশে পড়ে আছি, তাতেও তো তোমার আপত্তি নেই।

আমি বলি, না, আমার কোনো আপত্তি নেই।

ডলি বলে, তুমি আমাকে নিজের বউ বলেই কোনোদিন মনে করো নি, আজকাল আমি বুঝতে পারছি।

আমি বলি, তুমি কি ফিরতে চাও?

ডলি বলে, তোমার কথা মনে হলে আমার আর ফিরতে ইচ্ছে করে না।

আমি বলি, তাহলে ওখানেই থাকো।

ডলি বলে, আমি কোথায় থাকবো, তা তোমাকে বলে দিতে হবে না।

আমি বলি, কেনো টেলিফোন করো?

ডলি বলে, আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব, তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করেছে।

আমি বলি, জীবন নিয়ে তুমি বড়ো বেশি ভাবো।

ডলি বলে, ভাববো না? তোমার জন্যেই আমি একা। আমার কোনো সংসার হলো না। একটা ছেলে বা মেয়ে থাকলেও আমার এমন কষ্ট হতো না।

আমি বলি, ছেলেমেয়ের জন্যে আমার তো কষ্ট হয় না।

ডলি বলে, তুমি তো অমানুষ।

আমি কি সত্যিই বরখাস্ত হতে যাচ্ছি? ডলির কাছে এ-সংবাদ পৌঁছে গেছে, অথচ আমি কিছু জানি না,-তার নিশ্চয়ই কোনো একান্ত সংবাদদাতা রয়েছে। বালক-মন্ত্রীটিকে আমি স্যারই বলে আসছিলাম, যদিও নিজের নামের বানানটিও সে সব সময় ঠিকমতো লিখতে পারে না; আমি আমার পেশার রীতি অনুসারে তাকে যথারীতি মান্যগণ্যই করে আসছিলাম; কিন্তু তাকে আমি একবারে একশো কোটি টাকা কী করে বানাতে দিই? আমি কী করে ওই আদেশে সই করি? আমি তাকে পাঁচ কোটি বানাতে বলেছিলাম; জানিয়েছিলাম সুযোগ সব সময়ই আসবে, তখন আরো বানাতে পারবেন, কিন্তু তার এখনই একশো কোটি দরকার, আমি তাতে রাজি হই নি। আমিও দশ কোটি পেতাম, আমার অতো দরকার নেই। আমি যে কিছু বানাই নি, বানাই না, তা নয়; মাঝেমাঝে বানাতে আমার ভালো লাগে, বানানোর জন্যেই বানাতে আমার ভালো লাগে। বেলার নামে আমি ওই হিশেবগুলো খুলেছি, বেলাকে এখনো বলি নি। বালক-মন্ত্রীটি লাল টেলিফোনে কয়েকবারই আমাকে আদেশ

দিয়েছিলো, আমি রাজি হই নি বলে তার বাহিনী নিয়ে আমার ঘরে হামলাই করতে এসেছিলো; শালার আমলা, তোকে দেখিয়ে দেবো বলে চিৎকারও করছিলো, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমার দিকে তাকিয়ে সে ভয়ও পাচ্ছিলো; আমি শুধু তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম একজন মন্ত্রীর জন্যে ওই আচরণ শোভন নয়। আমাকে সে বরখাস্ত করাতে পারবে? করানোর চেষ্টা করছে? আমার অবশ্য আপত্তি নেই; আমার নিজেরই বছরখানেক ধরে মনে হচ্ছে চাকুরিটা ছেড়ে দিই। তবে এখন আমি ছাড়বো না, এবং আমি দেখবো– একশো কেনো পাঁচ কোটিও সে কীভাবে বানায়।

প্রভুর একাদশতমা উপপত্নীটিকে আমার মনে পড়ে। আমারই উপপত্নী সে হতে পারতো, যদি আমি চাইতাম, যদি একটি উপপত্নীর আমার দরকার পড়তো; সে শক্তিমান কারো উপপত্নী হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলো, আমিই তাকে, জেনারেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এখন সে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বিদেশি ব্যাংকে কয়েক মিলিয়ন ডলারও জমিয়েছে, আমি সে-সংবাদ রাখি; সে-ই আমাকে মাঝেমাঝে জানিয়ে রাখে। তাকে আমার ভালো লাগে, কেননা সে উপপত্নীত্বকে একটি খেলা হিশেবে নিয়েছে, পেশা হিশেবে নেয় নি। তাকে আমার দরকার, তাকে আমি টেলিফোন করি।

আমি বলি, ম্যাডাম, আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই, যদি আপনার সময় হয়।

একাদশতমা বলে, আনিস? অনেক দিন আমার খবর নাও নি, এখন নিলে তাতে সুখ পাচ্ছি।

একাদশতমা আমার থেকে অন্তত বিশ বছরের ছোটো। যে-দিন প্রথম দেখা করতে এসেছিলো, তার পা কাঁপছিলো, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না; ‘স্যার, স্যার’ করে নিচে পড়ে যাচ্ছিলো, এখন সে আমাকে অবলীলায় নাম ধরে ডাকে, আমার খারাপ লাগে না; আমি কোনো অবস্থানকেই ধ্রুব মনে করি না। আমার সাথে তার সম্পর্কটিকে মধুর বলেই আমার মনে হয়; আমি তাকে পছন্দই করি, সেও আমাকে।

একাদশতমা আরো বলে, তোমার কথা মাঝেমাঝে আমার মনে পড়ে।

আমি বলি, ম্যাডাম, কেনো আমার কথা মনে পড়ে জানালে ধন্য হতাম।

একাদশতমা বলে, তোমাকে আমি পছন্দ করি।

আমি বলি, তা আমার পরম সৌভাগ্য।

একাদশতমা বলে, আমি তোমারই হতে পারতাম।

আমি বলি, তাহলে ওই মিলিয়নগুলো জমতো না, ম্যাডাম।

একাদশতমা হাসে, হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু পেটে একটি দুটো বাচ্চা তো জমতো!

আমি বলি, পেটে বাচ্চা জমায় কী সুখ?

একাদশতমা বলে, তা আমি জানি না, তবে চারপাশে শুনি বাচ্চা জমায় মারাত্মক সুখ, তাই আমিও ওই কথা ভাবি।

আমি বলি, আপনার মা বলেন?

একাদশতমা বলে, মা কেনো, জেনারেলও দিনরাত বলে।

আমি বলি, প্রভু খুব পীড়নে আছেন।

একাদশতমা বলে, সে তো সঙ্গম করে না, একটা কিছু জন্ম দেয়ার জন্যে যুদ্ধ করে, তুমি যদি দেখতে!

আমি বলি, শুনেছি আপনিই এখন তার প্রথমা?

একাদশতমা বলে, বলো, আনিস, তোমার কি চাই?

আমি বলি, একটু মুক্তি পেতে চাই।

একাদশতমা বলে, কার কবল থেকে?

আমি বলি, আমার মাথার ওপরের বালকটির থেকে।

একাদশতমা বলে, হারামজাদা তোমাকেও জ্বালাচ্ছে? আমি ওর মন্ত্রীগিরি দেখাচ্ছি।

আমি বলি, একটু তাড়াতাড়ি দেখতে চাই।

একাদশতমা বলে, শুক্রবার আসার আগেই।

বুধবার বালক-মন্ত্রীটি তার গ্রামে ফিরে যায়, যাওয়ার আগে 'শালার আমলা, তোরে দেইখ্যা লমু' বলে সে আমার সাথে একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করে। আমি একাদশতমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বলি, আপনার পদতল চুম্বন করে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একাদশতমা বলে, পদতল কেনো তুমি ওই চুম্বন করতে পারতে, আনিস।

আমি বলি, যেখানে প্রভু স্পর্শ করেন, সেখানে দাসের স্পর্শের স্পর্ধা কখনো হবে না।

একাদশতমা বলে, আনিস, তুমি উত্তম আমলা।

আমি বলি, আপনার কৃপা যেনো চিরকাল পাই।

দেখতে পাই আমার মর্যাদা বেশ বেড়ে গেছে; আমার অধীন আর পরিচিতরা আমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেনো তারা কোনো শক্তিমানকে দেখছে; হঠাৎ তাদের চোখে আমি শক্তিমান হয়ে উঠেছি। বালকটি যে গ্রামে ফিরে গেছে, এর পেছনে যে আমার শক্ত হাত রয়েছে, এ-সম্পর্কে তারা নিশ্চিত; এবং আমিও অত্যন্ত বিনীতভাবে তাদের শক্তিপুজো উপভোগ করি। যে-কেরানিদের ঘরে আমি কখনো যাই নি, একবার আমি তাদের ঘরে ঢুকে পড়ি; তারা আমাকে তাদের ঘরে দেখে পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আমি কেরানিদের সামনের একটি ভাঙা চেয়ারে বসি, তারা মূর্ছিত হয়ে পড়ার উপক্রম করে। আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তারা বাসায় ফিরে ছেলে, মেয়ে, পাড়াপড়শিকে ডেকে আমার কথা বলছে; বাজারে গিয়ে আমার কথা বলছে; শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আমার কথা বলছে; আর স্ত্রীসহবাসের সময় অন্যমনস্ক হয়ে আমার কথা বলছে।

ডলি, কয়েক দিনের মধ্যেই, টেলিফোন করে প্রথমেই বলে, তোমরা আমলারা যে কী না পারো!

আমি বলি, তুমি কেমন আছো?

ডলি বলে, আমি কেমন আছি তোমার জানার দরকার নেই; আমি বলছিলাম তোমরা আমলারা যে কী না পারো! ওইটাকে তুমি শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করিয়ে ছাড়লে।

আমি বলি, আমি এক সামান্য চাকর, আমার কি মনিবকে বরখাস্ত করানোর শক্তি আছে?

ডলি বলে, লন্ডনের সব বাঙালিই জানে তুমিই ওটাকে বরখাস্ত করিয়েছে।

আমি বলি, আমার ওপর বাঙালিদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে না?

ডলি বলে, তাই তো মনে হয়।

আমি বলি, বাঙালিরা সব সময়ই শক্তিমান আর কল্পিত শক্তিমানদের পুজো করতে পছন্দ করে।

ডলি বলে, আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করছি, বরখাস্ত হলে তোমাকে ঘেন্না করতাম।

আমি বলি, খুশিও হতে।

ডলি বলে, হতাম, তবে তোমাকে এখন শ্রদ্ধা করছি; লন্ডনের বাঙালিরা আমাকেও শ্রদ্ধা করছে, কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে আজই আমি বাঙলাদেশি কাঁথা উৎসব উদ্বোধন করেছি।

আমি বলি, আরো অনেক কিছু তুমি এখন উদ্বোধন করতে পারবে।

ডলি বলে, ওই মেলিটারি আর তাদের দালালগুলিরে এখন কেউ দেখতে পারে না। হাই কমিশনার প্রত্যেক দিন আমার খবর নেয়।

আমি বলি, আমলাদের বেশি বিশ্বাস কোরো না।

ডলি বলে, তা আমার মনে আছে, একটাকে বিশ্বাস করেই আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বলি, জীবন নিয়ে যারা বেশি ভাবে তাদের এমনই মনে হয়, নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ডলি বলে, তাহলে কি মনে করবো যে আমার জীবন সোনায় রুপোয় ফলেফুলে ভরে আছে?

আমি বলি, দেলোয়ার হয়তো তোমাকে ভরে তুলতে পারতো।

ডলি বলে, দেলোয়ারের কথা তুমি কখনো বলবে না। তার কথা মনে করেই তুমি কখনো আমাকে নিজের স্ত্রী মনে করতে পারলে না। তুমি আজো আমাকে দেলোয়ারের স্ত্রী মনে করো।

ডলি ফোন রেখে দেয়; কিন্তু আমার আজ ডলির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো, আমি একবার তার নম্বরে রিং করি; সে রিসিভার তুলতেই আমি ফোন রেখে দিই, কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

এক দুপুরে অফিসে ফোন

বেলা এক দুপুরে অফিসে ফোন করে; সে খুব রেগে আছে, বলে, দাদা, মা আর আমি যে বেঁচে আছি, ঢাকায়ই আছি, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই।

আমি বলি, খুব মনে আছে।

বেলা বলে, এক বছরেরও বেশি হলে তুমি আমাদের দেখতে আসো নি, হয়তো এখন আমাদের চিনতেও পারবে না।

আমি বলি, একশো বছর পরে দেখলেও তোমাদের দুজনকে চিনতে পারবো।

বেলা বলে, চিনতে পারবে, তবে আমরা তোমার কী হই, তা মনে করতে পারবে না।

আমি বলি, তাও পারবো।

বেলা বলে, আমি তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, আজই, খুব দরকার।

আমি বলি, তারচেয়ে এখনই দরকারটা কী বলে ফেল।

বেলা বলে, দাদা, আমি তোমার ছোটো বোন, একমাত্র বোন, আমার দরকারের কথাটা কি আমি তোমার বাসায় এসে বলতে পারি না?

এমন সময় লাইনটা কেটে যায়, একের পর এক জরুরি ফোন আসতে থাকে; বেলা নিশ্চয়ই ফোন করে চলছে, আমি জরুরি ফোনে কথা বলতে বলতে বেলার কথা ভাবি, বেলা নিশ্চয়ই রেগে উঠছে, কিন্তু একের পর এক ফোন আসতে থাকে।

বেলা আধঘণ্টা পর আবার লাইন পায়, পেয়েই রেগে ওঠে, দাদা, লাইনটা কেটে গেলো, তুমিই তো আমাকে একটু ফোন করতে পারতে; তোমার লাইন পাওয়া যা কষ্ট, আর হাজারটা পরিচয় দিতে হয়।

আমি বলি, তোকে তো এজন্যেই বলেছিলাম আমলা হ, না হয়ে তুই বউ হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেলি।

বেলা বলে, বুঝেছি তুমি আমাকে বাসায় যেতে বলবে না, তাই ফোনেই বলছি; কাশেমকে চট্টগ্রামে বদলি করে দিয়েছে, ওকে ঢাকায় রাখার একটু ব্যবস্থা করতে হবে। বেলা আরো যোগ করে, কাশেমকে তোমার মনে আছে কি না জানি না, কাশেম তোমার ছোটো বোনের স্বামী।

আমি বলি, ওর ঢাকায় থাকার কী দরকার?

বেলা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, এ তুমি কী বলছো, দাদা? কাশেম চট্টগ্রামে গেলে আমাকেও যেতে হবে, খোকাকে সেখানে ভর্তি করাতে হবে; আমি ঢাকা ছেড়ে যেতে পারবো না।

আমি বলি, চট্টগ্রামে তো মানুষেরাই থাকে।

বেলা বলে, আমি চট্টগ্রাম যেতে পারবো না, দাদা; তুমি একটু বলে দিলেই ওকে আর বদলি করবে না।

আমি বলি, আগে ক-বার বলেছি।

বেলা বলে, মাত্র দুবার, দাদা।

আমি বলি, আর বলতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না রে বেলা।

বেলা চিৎকার করে কাঁদে, দাদা, তুমি আমাদের ভালোবাসো না।

কাশেমকে বদলি করে দেয়া হয়েছে, ফেরাতে হবে; কিন্তু আমিই তো চাই আমাকে কোথাও বদলি করে দেয়া হোক, শহর ছেড়ে চলে যাই। আমাকে বদলি করে ঢাকার বাইরে পাঠানোর জায়গা নেই, পাঠালে দেশের বাইরে পাঠাতে হবে; আমি তা চাই না। ঢাকার বাইরে, বিলের ধারে বা নদীর পারে, হিজল বট নারকেল বনের ভেতরে কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক করে আমাকে বদলি করে দিলে কেমন হয়? আমাকে কি ওই পদে বদলি করা সম্ভব? সংস্থাপনের জালালউদ্দিন মিয়ার সাথে একবার আলাপ করে দেখবো? জালালউদ্দিন চাইলেই তো হতে পারে। জালালউদ্দিন কি আমার জন্যে এটা চাইতে পারে না? আমি কি দরখাস্ত লিখবো যে হুজুরের নিকট আমার এই আবেদন যে

আমাকে বিলের ধারে বা নদীর পারে কোন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক করিয়া বদলি করার আজ্ঞা হোক? বগুড়ায় সেই প্রধান শিক্ষককে আমি দেখেছিলাম, যার চুলের মসৃণতা দেখে আমার মনে হয়েছিলো তাঁর মতো সুখী যদি আমি হতে পারতাম, আমার আজো ইচ্ছে হয় তাঁর মতে, অবিকল তাঁর মতে, প্রধান শিক্ষক হতে। প্রধান শিক্ষকেরা কি সব সময় ইংরেজি আর্টিক্যল আর প্রিপজিশনের কথা ভাবেন? আমাদের প্রধান শিক্ষকও সব সময় ইংরেজি আর্টিক্যল আর প্রিপজিশনের কথা বলতেন, বগুড়ার প্রধান শিক্ষকও বারবার ইংরেজি আর্টিক্যল আর প্রিপজিশনের কথা বলছিলেন, আমার তাই হ'তে ইচ্ছে করছে; কিন্তু জালালউদ্দিন কি আমাকে বদলি করবে?

আমার বদলি হ'তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জালালউদ্দিন মিয়াকে আমি বলতে পারি না আমাকে বিলের ধারে বা নদীর পারে কোনো বিদ্যালয়ে বদলি করে দাও, জালালউদ্দিন মিয়া তা পারবে না, আমার পক্ষেও তাকে একথা বলা সম্ভব নয়; তবে দশ দিনের জন্যে আমাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হচ্ছে, যদিও যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার ইচ্ছে করছে বিলের ধারে নদীর পারে যেতে; সেখানে কেউ আমাকে যেতে বলবে না, সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। আমার ভয় হয় বিমান পশ্চিমের দিকে উড়লেই হয়তো ডলির কথা মনে পড়বে, ডলিকে আট দশ ঘণ্টা ধরে ভাবতে হবে, ভাবতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার কি একটা দায়িত্ব পড়ে যাবে না হিথ্রোতে নেমে ডলিকে ফোন করা? তারপর ডলির ওখানে গিয়ে অন্তত একদিন থাকা? ফেরার পথে তার ওখানে গিয়ে ওঠা? এমন কি তাকে নিয়ে ঢাকায় ফেরা? হিথ্রো থেকে ফোন করার অর্থই কি হবে না যে আমি ডলিকে আনতে গেছি? এসবের কোনোটিই আমার ইচ্ছে করছে না। বিমানে উঠে আমি একটি বই পড়তে শুরু করি, বইটি পড়া যখন শেষ করি তখন বিমান হিথ্রোতে নামছে; নামার সময় আমি একটু ভয় পাই, আর তখন ডলিকে আমার মনে পড়ে। হিথ্রোতে নেমে আমি ডলিকে টেলিফোন

করি না, এক ঘণ্টার মধ্যেই আরেকটি বিমানে নিউ ইয়র্কের দিকে উড়তে থাকি; এবং ফেরার সময়ও আমি হিথ্রোতে নেমে ডলিকে ফোন করি না, তার কথা আমার মনেই পড়ে না; শুধু বিমানটি যখন ভূমধ্য না আড্রিয়াটিকের এক কোণে এসে একবার লাফিয়ে ওঠে, তখন ডলিকে আমার মনে পড়ে। আবার বিমান মসৃণভাবে চলতে শুরু করলে ডলিকে আমি ভুলে যাই। আমার মনে পড়তে থাকে কোথাও আমার বদলি হওয়া দরকার, ঢাকা আর নিউ ইয়র্ক কোনোটিতেই আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না, নারকেলগাছের নিচে টিনের ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে। অমন বাড়িতে আমি কখনো থাকি নি; নারকেলগাছের ছায়ায় আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। ঢাকায় নেমে আমি কি আরো একটি প্লেন ধরবো? প্লেন আমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে? টিনের ঘরের দরোজায়? না, বিমানে করে টিনের ঘরের দরোজায় যাওয়া যায় না; হেঁটে যেতে হয়। আমি কি ঢাকায় নেমে হাঁটতে শুরু করবো? হেঁটে হেঁটে কোথায় যাবো? এর চেয়ে ভালো হয় বিমানটি কোথাও না নামলে; বিমানটি কি বছরের পর বছর আকাশে উড়তে পারে না? না, পারে না; বিমানটিকে নামতেই হবে; আর বিমানটি যা পারে, তা হচ্ছে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে। আমি বিমানের সাথে চুরমার হয়ে যেতে চাই না; আমি নামতে চাই, কিন্তু নেমে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

বেঁচে থাকতে আমার কেমন লাগছে? নিরর্থক? অর্থপূর্ণ? বিবর্ণ? চাঞ্চল্যকর? সফল? ব্যর্থ? সুখকর দুঃখভারাক্রান্ত? মধুময়? বিষাক্ত? কোনোটিই না। বেঁচে থাকতে আমার খারাপ লাগছে না; এমন মনে হচ্ছে না যে পৃথিবীটাকে বিদায় জানাই, কোনো নাইটিংগেলের লোকোত্তর গান শুনেও মনে হবে না মৃত্যুই এখন, যে-কোনো সময়ের থেকে, বেশি বরণীয়; আবার মরে যাওয়ার ভয়ে ভেতরটা হাহাকারও করছে না। ভেতরে আমি কোনো কান্না শুনি না। নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে মনে কি হচ্ছে জীবনকে আমি আর বইতে পারছি না? না; এমন মনে হচ্ছে না। জীবনকে কি খুব চাঞ্চল্যকর মনে হচ্ছে? তাও নয়। আমার

কি জীবনটাকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে ইচ্ছে করছে, মনে কি হচ্ছে যে সুযোগ পেলে ভুলগুলোকে সুন্দরভাবে সংশোধন করে নিতাম? তাও মনে হচ্ছে না। কোনো ভুলকেই সুন্দর করতে আমার ইচ্ছে করছে না, ভুলগুলোকে আমি ভুলই রেখে যেতে চাই। নারী থেকে দূরে থেকে কেমন আছি? কারো সাথেই জড়িয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে করছে না। কোনো নারী দিনরাত আমার সাথে আছে, আমার ঘরে আছে, আমার সাথে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছ, বাইরে যাচ্ছে, আমি ভাবতে পারছি না; কিন্তু কোনো নারীর সাথে যদি একবেলা, গভীরভাবে নিবিড়ভাবে কোমলভাবে প্রচণ্ডভাবে, কাটাতে পারতাম, খারাপ লাগতো না হয়তো। কিন্তু তাও আমি পারছি না। মিসেস হামিদউল্লাহর মুখটি আমার ভালো লাগে, আমি ডাকলে তিনি রাজি হবেন বলেই মনে হয়, এবং এক সন্ধ্যায় তাঁকে আমি ডাকি-খেতে ডাকি। খাওয়ার পর আমরা শোয়ার ঘরে গিয়ে বসি। আমি একটু পান করার প্রস্তাব দিলে তিনি আনন্দিত হন, তাঁর আনন্দটা দেখে আমি সুখ পাই। আমরা দুটি সুন্দর আসনে পাশাপাশি বসে, পান করতে থাকি; তার মুখটি আমার আরো ভালো লাগতে থাকে, তিনি একবার আমার হাতের ওপর হাত রাখেন, আমি তার হাত ধরে অনেকক্ষণ দেখি, আদর করি, আমার একটু কর্কশই লাগে; কিন্তু আমি আমার অনুভূতিটা প্রকাশ করি না; পান করতে করতে আমি তার মুখটি বাঁ-হাত দিয়ে ছুঁই, বারবার ছুঁই, তিনি তার মুখটি আমার কাঁধের ওপর রাখেন। আমি তার চুলে একবার মুখ রেখে ঘ্রাণ নিই; তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তার ব্লাউজ আর অন্তর্বাস খুলি, এবং খোলা হলেই দুটি লম্বা তরল ঢোলা স্তন নাভি পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। দেখে আমি ভয় পাই, আমার ঘেন্না লাগে, আমি হাত সরিয়ে আনি। তাকে আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না; মনে হতে থাকে ছুঁলে আমার শরীর ভ'রে ঘা দগদগ ক'রে উঠবে, এখনই আমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবো।

আমি বলি, আমি খুব দুঃখিত, এখনই আমার একটি মিটিং আছে।

আমি উঠে দাঁড়াই; মিসেস হামিদউল্লাহ খুব অসহায় বিব্রত বোধ করেন; স্তন দুটি গুটানোর চেষ্টা করে বারবার বিফল হতে থাকেন; আমার দিকে খুব করুণভাবে তাকান। আমি তাঁর স্তন দুটি ধরে গুটোতে সাহায্য করি; তিনি ও-দুটিকে বেঁধে ফেলে মাথা নিচু করে বসে থাকেন। আমি ড্রাইভারকে ডাকি। মিসেস হামিদউল্লাহ আমার দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যান।

আমি আবার বলি, আমি খুব দুঃখিত।

মিসেস হামিদউল্লাহ কোনো কথা বলেন না। আমি বাথরুমে গিয়ে বারবার হাত ধুই। আমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়ে উঠি; যেনো আমি কখনো কামবোধ করি নি, ভবিষ্যতে কখনো করবো না।

মিসেস হামিদউল্লাহর কাছে আমি মনে মনে ক্ষমা চাইতে থাকি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকি;–তিনি অপমান করতে পারতেন আমাকে, গালে একটা শক্ত চড় কষিয়ে দিতে পারতেন, মুখে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিতে পারতেন; বলতে পারতেন–আমার দু-দুটি স্বামী ছিলো, তারা আমার ভেতরে পাঁচটা ছেলেমেয়ে পয়দা করেছে, আমি কিশোরী নই যে তুমি একটা বুড়ো হাবড়া মুঠোর ভেতর দুটি কমলালেবু পাবে। কমলালেবুর কাল আমাদের সেই কবেই কেটে গেছে। আমি ক্ষমা চাইতে থাকি, এবং আবার বাথরুমে ঢুকি, ঝরনা খুলে দিই, দেয়ালে পানি ছিটোতে থাকি; মনে হয় মা, দরোজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকে পড়বে, দু-হাত দিয়ে শিশ্ন ঢেকে আমি একবার বসে পড়ি। বসতে আমার কষ্ট হয়, বুঝতে পারি আমার উদর সেই আগের মতো নেই, ইচ্ছে করলেই আমি আর আগের মতো বসতে পারি

না, উঠতেও পারি না। অনেক দিন ধরে আমি আমার শরীরটিকে ভালো করে দেখি নি; আয়নায় তাকিয়ে দেখি আমার গলকম্বল দেখা দিয়েছে, মাড়িতে হাত দিতেই তিন দাঁতের ডেনচারটি আঙুলের সাথে উঠে আসতে চায়। ঝুলে পড়া উদরটি আমাকে বেশ বিব্রত করে, পেশি টেনে সেটিকে আমি ঠিক করতে চাই, সেটি অনেকটা ভেতরে প্রবেশ করে, কিন্তু পেশির টান ছাড়তেই আবার ঝুলে পড়ে। মিসেস হামিদউল্লাহ যদি দেখতেন? তিনি খিলখিল করে হেসে উঠতেন না? লোমগুলো এমন শাদা হয়ে গেছে? মিসেস হামিদউল্লাহ যদি দেখতেন? আমি আমার দিকে তাকাতে সাহস করি না, হো হো করে হেসে উঠতে থাকি। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, দাঁড়াতে পারি না। আমি অনেক বছর সোজা দাঁড়াই না? আমার মেরুদণ্ড নিচের দিকে এমনভাবে বেঁকে গেছে? কখন বাঁকলো? কীভাবে বাঁকলো? কেনো আমি টের পাই নি? আমি নগ্ন বাথরুম থেকে বেরোই, বেরিয়েই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। এ-আয়নাটিতে পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা গলকম্বল? আমি গলার নিচের চামড়া নাড়তে থাকি, টেনে টানটান করি, ছেড়ে দিলেই চামড়া শিথিল হয়ে পড়ে। আমি দৌড়ে পাশের ঘরে যাই, আয়নার সামনে দাঁড়াই। এ-আয়নাটিতে আমাকে আরো বিকট লাগে, ধুলো জমে আছে ভেবে আমি আয়নাটি মুছতে থাকি, আমার গলার চামড়া ঝুলছে দেখে আমি ভয় পাই; আবার দৌড়ে পাশের ঘরে যাই। এ-ঘরের আয়নাটিতে আমার উদরটিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একটি পাথরের মতো দেখায়। আমি দুহাত দিয়ে উদর চেপে ধরে আমার ঘরে ফিরে আসি। আমি নগ্ন বসে পান করতে থাকি, এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

ডলি বলে, শুনলাম তুমি লন্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক গেছো আর ফিরেছো, অথচ আমার কোনো খবর নাও নি?

আমি বলি, আপনি কে বলছেন?

ডলি বলে, তুমি কি মাতাল হয়ে আছো যে আমার গলা চিনতে পারছো না?

আমি বলি, হ্যাঁ, আমি একটু পান করছি, আপনি কে বলছেন?

ডলি বলে, আমি তোমার স্ত্রী, যদি তুমি তা মনে করো।

আমি বলি, না, জেনারেলের কাছে আমি আর কাউকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিতে পারবো না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক ভালো নেই।

ডলি বলে, আমি জানি তুমি জেনারেলের পিম্প, কিন্তু আমি তা চাই না; আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

আমি বলি, বলুন।

ডলি বলে, প্রথমে চিনে নাও যে আমি ডলি বলছি, আমি তোমার স্ত্রী।

আমি বলি, ওহ, ডলি, আমি চিনতে পারি নি।

ডলি বলে, তোমার কী হয়েছে? তোমাকে তো এমন কখনো দেখি নি।

আমি বলি, মিসেস হামিদউল্লাহকে একটু খেতে ডেকেছিলাম।

ডলি বলে, তোমার ডাকে বুড়ীরা ছাড়া আর কে আসবে, কিন্তু এতো মাতলামি করছো কেনো?

আমি বলি, না তো, আমি স্বাভাবিক আছি, খুবই স্বাভাবিক।

ডলি বলে, শুনলাম তুমি নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলে, কিন্তু আমি যে লন্ডনে পড়ে আছি, তা কি তোমার মনে নেই?

আমি বলি, হ্যাঁ, মনে ছিলো, কিন্তু ফোন করতে ইচ্ছে করে নি।

ডলি বলে, শুধু ফোন? আমার সাথে তোমার দেখা করা উচিৎ ছিলো না? আমি বলি, দেখা করতে ইচ্ছে করে নি।

ডলি বলে, কিন্তু মনে রেখো তোমাকে আমি ছাড়ছি না, তোমাকে আমি ছাড়বো।

আমি বলি, ছাড়াছাড়ির কথা আমি কিছুই ভাবছি না, কিন্তু সত্যিই তোমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করে নি।

ডলি বলে, তোমার সাথে দেখা করতে আমারও ইচ্ছে করে না, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

আমি বলি, তোমাকে আমি ছাড়তে বলি নি।

ডলি বলে, মিসেস হামিদউল্লাহকে নিয়েই তুমি থাকো, আগামীকাল আমি হাসান জায়গিরদারের সঙ্গে সিসিলি যাচ্ছি।

আমি বলি, একটু সাবধানে থেকো, মাফিয়ার সাথে ওর সম্পর্ক আছে বলে শুনেছি, তোমাকে ভূমধ্যসাগরে ফেলেও আসতে পারে।

ডলি বলে, তোমার থেকে মাফিয়া আর ভূমধ্যসাগরও আমার কাছে ভালো।

আমি বলি, তাহলে আমাকে আর কেনো কষ্ট করে টেলিফোন করলে?

ডলি বলে, জানিয়ে রাখলাম, যাতে তুমি জ্বলো।

আমি বলি, অনেক দিন ধরে আমি জ্বলি না, যদি একটু জ্বালাতে পারো কৃতজ্ঞ থাকবো।

ডলি বলে, তুমি জায়গিরদারের থেকেও পাষণ্ড।

আমি বলি, জায়গিরদারের সাথে তোমার সম্পর্ক কি খুবই ঘনিষ্ঠ?

ডলি বলে, ঘনিষ্ঠতার তুমি কী বোঝো, আর তোমাকে আমার ব্যক্তিগত কথা কেননা বলতে যাবো?

আমি বলি, আমার ভুল হয়ে গেছে, তোমার ব্যক্তিগত কথা জানতে চাওয়া আমার ঠিক হয় নি।

ডলি বলে, যদি বলি এখন আমি জায়গিরদারের সাথে শুয়ে আছি, তাহলে কি। তোমার জ্বালা লাগবে? আমি জানি তোমার সেই শক্তিও নেই।

আমি বলি, পান করার সময় আমি কোনো জ্বালা বোধ করি না; তখন কাউকে আমার খারাপ লাগে না, সবাইকে ভালো লাগে, সব দৃশ্য সুন্দর মনে হয়।

ডলি বলে, জায়গিরদারের সঙ্গে আমি শুয়ে আছি এটাও কি তোমার সুন্দর লাগবে? তুমি পাষণ্ড, তাই এ-দৃশ্যও তোমার সুন্দর লাগতে পারে।

ডলি ফোন রেখে দেয়।

আমি কোনো শূন্যতা বোধ করি না; জায়গিরদারের সাথে ডলি শুয়ে আছে, এ-দৃশ্যও দেখি না; ডলি নামের কেউ আছে, ছিলো, থাকবে, এ-নামের কেউ এইমাত্র ফোন। করেছিলো, তাও আমার মনে থাকে না। একের পর এক টেলিফোন বাজতে থাকে; টেলিফোনের শব্দ আমার মধুর মনে হয়, ওগুলো ধরে যে সাড়া দিতে হয়, তা আমার মনে হয় না; ওগুলো যে আমারই ঘরে বেজে চলছে, তাও মনে হয় না; হয়তো কোনো নক্ষত্রে, কোনো অরণ্যে

পত্রপল্লবের ভেতরে বাজছে; কোনো নদীর ভেতরে, মেঘ বা পাখির বাসায় বাজছে, এমন মনে হয়। আমার কাজের লোকটি, কী যেনো তার নাম, এক সময় আসে; আমি তাকে ভেতরে ঢুকতে বলি; সে ভেতরে ঢুকে আমাকে দেখে বিব্রত হয়; ঢুকবে কি ঢুকবে না করতে থাকে, আমি তাকে ঢুকতে বলি, সে ভেতরে ঢুকলে তাকে পাশের চেয়ারে বসতে বলি। সে দাঁড়িয়েই থাকে, তাতে আমি খুব বিস্মিত হই; আবার তাকে আমি বসতে বলি, কিন্তু সে বসে না।

আমি বলি, আপনি বসুন।

লোকটি বলি, না, স্যার; না, স্যার, বসতে অইব না।

আমি বলি, আমার পাশে বসতে কি আপনার ঘেন্না লাগছে? আপনি কি আর্য ব্রাহ্মণ? আমি কি শূদ্র?

লোকটি আমার কথা বুঝতে পারে না।

সে বলে, স্যার, একটা লুঙ্গি আইন্যা দেই?

আমি বলি, আপনার কী নাম?

লোকটি বলে, আমার নাম দীন মুহাম্মদ, স্যার।

আমি বলি, আপনি কী চান?

লোকটি বলে, আমি কিছু চাই না, স্যার, থালবাসনগুলি নিতে আইছি।

আমি বলি, আপনি বসুন।

লোকটি দাঁড়িয়ে থাকে। আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার খারাপ লাগে।

লোকটি বলে, একটা লুঙ্গি আইন্যা দেই, স্যার?

আমি বলি, লুঙ্গির কী দরকার, এই তো আমি বেশ আছি।

লোকটি বলে, আপনে ভাল নাই, স্যার।

আমি বলি, আপনি আমাকে স্যার বলবেন না; শুনতে শুনতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। স্যার শুনলে মনে হয় কেউ আমাকে শালা বলে ডাকছে; আমি কারো স্যার নই, আমি কারো শালা নই।

লোকটির সঙ্গে আমার সারারাত কথা বলতে ইচ্ছে করে। লোকটি কি বলবে? লোকটির মুখের দিকে আমি আগে কখনো তাকাই নি; সুন্দর দাড়ি রেখেছে লোকটি,-আগে কি লোকটির দাড়ি ছিলো? মনে পড়ে না, তবে বেশ দাড়ি রেখেছে, দাড়ির বেশি ঝোঁপ নেই, বেশ হাল্কা পাতলা; মাথায় একটি টুপিও আছে, মুখটি ছোটো, গালে একটি ছোটো কাটা

দাগ আছে বলে আমার মনে হয় তার লুঙ্গিটা গোড়ালির অনেক ওপরে ওঠানো। দক্ষিণের মসজিদটায় হয়তো নিয়মিত যায়, লোকটিকে বেশ লাগছে আমার।

আমি বলি, আপনি কি বিয়ে করেছেন?

লোকটি বলে, জি, স্যার; পরথম স্ত্রীর মিরতুর পর তিন বছর আগে আবার বিবাহ করছি।

আমি বলি, আপনার স্ত্রী কার সাথে ঘুমায়?

লোকটি বলে, নাউজুবিল্লা, আমার ইস্তিরি আর কার লগে ঘুমাইব, আমার লগেই ঘুমায়।

আমি বলি, কিন্তু আপনি তো এখানেই থাকেন, আপনার স্ত্রী কোথায় থাকে?

লোকটি বলে, দিনাজপুরের বীরগঞ্জের রহমতপুরে।

আমি বলি, সেখানে সে কার সঙ্গে ঘুমোয় আপনি জানেন?

লোকটি বলে, আল্লা জানে, স্যার।

আমি বলি, আল্লা জানলেই চলবে, আপনার জানতে হবে না?

লোকটি বলে, হের আরও চাইরখানা বিয়া অইছিল, স্যার, হের লগে আর কে ঘুমাইতে চাইব?

আমি হাসতে থাকি।

লোকটি বলে, আমি একটা কথা কইতে চাইছিলাম, স্যার, সাহস অয় নাই।

আমি বলি, বলুন।

লোকটি বলে, আমার আগের ঘরে একটা মাইয়া আছিল, স্যার, টেনে পড়ে।

আমি বলি, ঠিক আছে, বইপত্র লাগলে আমি কিনে দেবো।

লোকটি বলে, আমার মাইয়াটা খুব ভাল, স্যার, ফাস্ট অইছে ক্যালাশে, কিন্তু মাইয়াটার একটা অসুখ হইছে।

আমি বলি, দীন মুহাম্মদ সাহেব, কারো অসুখের কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করে না, কোনো সুখের কথা থাকলে বলুন।

লোকটি বলে, গরিবগো কোন সুখের কথা নাই, স্যার।

আমি বলি, তাহলে আপনি যান, গরিবদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

লোকটি ভয় পেয়ে বেরিয়ে যায়। লোকটি তো ভয় নাও পেতে পারতো, কিছু কথা শুনিয়ে দিতে পারতো আমাকে, সিনেমায় যেমন গরিবরা কথা শুনিয়ে দেয়; আমি ওর এমন কী করতে পারতাম? ওকে বরখাস্ত করতে পারতাম না। লোকটি হয়তো ভাবে ওকে আমি বরখাস্ত করতে পারি, কিন্তু আসলে আমি পারি না। তবে লোকটি যে ভয় পেয়েছে দেখতে আমার ভালো লাগে। মানুষ ভয় পেয়ে কীভাবে বেরোয় আমি তা দেখতে থাকি, ভয় পেয়ে বেরোনোর দৃশ্য দেখতে আমার ভালো লাগে; আমার ইচ্ছে করে লোকটির মতো ভয় পেয়ে প্রত্যেক ঘর থেকে বেরোতে। দেখতে পাই আমি আমার কেরানিদের ঘরে গেছি, তারা আমার দিকে তাকাচ্ছে না, আমি স্যার, স্যার করে তাদের ডাকছি, কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না, শেষে একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, পরে আইসেন, এখন সময় নাই; তার কথা শুনে আমি ভয় পাই, ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, বেরোনোর সময় আমি ভুল জায়গায় পা ফেলি, পা থেকে আমার স্যান্ডল খুলে পড়ে যায়। এখন আমি যদি নিচে দীন মুহাম্মদের ঘরে যাই, ঘরে গিয়ে বলি, আমি ভালো নেই, আর দীন মুহাম্মদ বলে কারো ভালো না থাকার কথা শুনতে তার ভালো লাগে না, সে যদি আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলে, তাহলে কি আমি ভয় পাবো, ভয়ে ভয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবো? আমার ভয় পেতে ইচ্ছে করে, আমার ভয় পাওয়ার সুখ পেতে ইচ্ছে করে; আমার দীন মুহাম্মদ হ'তে ইচ্ছে করে।

আমি কি একটু বেশি পান করেছি? আগে কখনো এতোটা পান করি নি পান করলেই ভেতর থেকে এভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসতে হবে? ভেতরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে, মনে হচ্ছে ভেতরের সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসছে; কিন্তু আমি বেরোতে দেবো না বলে ঠিক করি, তবে চাপ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। প্রচণ্ডভাবে বমি আসছে ভেতর থেকে; আমি

কি বাথরুমে গিয়ে সিং ধরে বমি করতে শুরু করবো? কতো বছর আমাকে সিংক ধরে গো গো গলগল করে বমি করতে হবে? আজ রাতে যদি বমি শেষ না হয়? যদি আগামীকাল, পরশু, আর পরের রাত ও দিনগুলো, দুপুর ও মধ্যরাতগুলো, মাসগুলো, বছরগুলো ধরে আমার ভেতর থেকে বমি উৎসারিত হতে থাকে? আমি বাথরুমে যাই না; টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে শুই, অমনি ভেতর থেকে বমির ধারা বেরিয়ে আসতে থাকে। গলগল করে বেরোনো বমিতে বালিশ ঢেকে যায়, বিছানা প্লাবিত হয়ে যায়; আমি দেখতে থাকি আমার বমিতে শহরের সমস্ত পথ প্রাবিত হয়ে যাচ্ছে, সব যানবাহন ভাঙা বাস আর পতাকাশোভিত মার্সিডিজ, রিকশা আর ঠেলাগাড়ি-ডুবে যাচ্ছে; সচিবালয় আর শহর ডুবে যাচ্ছে, ছোট্ট একটি দেশ ডুবে যাচ্ছে, পাখির ডাক আর বাঁশির সুর আর ঘাসফুল আর কবিতার পংক্তিগুলো ডুবে যাচ্ছে, একটির পর একটি মহাদেশ ডুবে যাচ্ছে। আমি বমির নিচে হারিয়ে যেতে থাকি।

কাজির, স্বরাষ্ট্রের হাজি কাজি আহমদ সালেকিনের, সাথে দেখা হলেই ধর্মের পুণ্যকথা শুনতে হচ্ছে আজকাল, পুণ্যকথায় ও সব কিছু প্লাবিত করে দেবে মনে হচ্ছে; ওর না কি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, আগে জানলে অর্থনীতি পড়তো না, সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তানে যোগ দিতো না, ইসলামিয়াত পড়তো, আর কোন একটি বাদশার কথা যেনো ও বলে, সেটির নাম আমি মনে রাখতে পারি না, যেমন দীন মুহাম্মদের নাম মনে রাখতে পারি না, যদিও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় অজস্র বাজে বিদ্যার সাথে ওই নামটিও মুখস্থ করেছিলাম, ও তার মতো আলকুরআন নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতো (বইটির নাম আমি প্রথম বুঝতে পারি নি, এর উচ্চারণ আর বানান যে বদলে গেছে আমার জানা ছিলো না, বাঙলা ভাষা আর আমার স্বরতন্ত্রির কষ্ট হয় বলে আমি ছেলেবেলায় যা বলতাম সেই কোরান বলেই শান্তি পাই), তাতেই ও শান্তি পেতো। আলকুরআন নকল করে জীবিকা

নির্বাহ করা কাজি আজো শুরু করে নি, শিগগির শুরু করবে, অবসর নেয়ার পর কোনো অসরকারি সংস্থা খুলে শুধু আলকুরআন নকল করবে হয়তো, এখন বছর বছর হাজি হচ্ছে, ডান দিক থেকে পেঁচিয়ে আসা অক্ষরগুলো শিখছে, অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে বেহেশত আর হুরি দেখছে, টুপি নিয়ে খুব দৌড়োচ্ছ, টুপিদৌড়ে কাজি ফার্স্ট হচ্ছে, আর মাজারটাজার দেখলেই নেমে দোয়া পড়ছে। দোয়াটোয়া পড়তে আমি জানি না, আমাকে দোয়ার বই কয়েকটি ও দিয়েছে, আমি খুলে দেখি নি, না কি খুলে দেখে ভয় পেয়েছি, না কি খুলে দেখে হেসে উঠেছি। একটি মাজারে কাজি বছরে চারবার করে যাচ্ছে, কাজির বুক সুখে ভরে উঠছে; আমি তাকে তার আইনশৃঙ্খলারক্ষীদের একটু ধর্মটর্ম শেখাতে বলি, তাদের ধর্ষণ করতে একটু নিষেধ করতে বলি (অবশ্য মনে মনে আমি তাদের ঈর্ষা করি, তারা যখন তখন শক্ত হয় কীভাবে? তাদের কি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?); কাজি সেদিকে কান দেয় না; যেনো তার আইনশৃঙ্খলারক্ষীরা ধার্মিক হয়ে উঠলে, ধর্ষণ কমিয়ে দিলে, তার পুণ্য কমে যাবে, বেহেশত মানুষে গিজগিজ করবে, কাজি তা পছন্দ করে না; সে একাই বেহেশতে থাকতে চায়। কাজির শেষ বউ মাঝেমাঝেই আমাকে টেলিফোন করছেন, কাজি তার ওপর যে ধর্মাত্যাচার করছে, তা কমানোর জন্যে চাপ দিতে অনুরোধ করছেন। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কী অত্যাচার করতে পারে কাজি, যাকে ধর্মত্যাচার বলা যায়? কাজির সাথে কয়েকদিন আগে ওর বাসায় যেতে হয় আমাকে, গিয়েই ব্যাপারটি বোঝা সহজ হয়ে ওঠে আমার পক্ষে। কাজির বউ বোরখা পরেই ড্রয়িংরুমে আসেন, এসে আমাকে খাঁটি একটি আসোলামুআলাইকুম দেন, আমি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যাই।

মিসেস কাজি বলেন, আনিছ ভাই, যখন ড্রাইবারের বউ আছিলাম, তখনও এমন জ্বালা সইহ্য করতে হইতো না।

কাজি বলে, হালিমা বেগম, পরপুরুষের সামনে আপনার আসা ঠিক হয় নি।

মিসেস কাজি বলেন, আমার মন চায় আমি আবার রহিম ড্রাইবারের বউ হইয়া যাই, সেকরেটারির ইস্তিরি থাকতে আমার আর ইচ্ছা করে না।

আমি জিজ্ঞেস করি, ভাবী, আপনার অসুবিধা কী?

হালিমা চিৎকার করে ওঠেন, দ্যাখছেন না, বাইরতেও আমার এই বোরকা পইর্‌্যা থাকতে অয়, আর ভিতরে পরতে অয় হিরোইনগো ড্রেস।

হালিমা বেগমকে আগে আমি দেখি নি, এখনো দেখতে পাচ্ছি না; তিনি বোরখার ভেতরেই আছেন, কিন্তু ওই ঝলমলে কালো বস্ত্রটির ভেতর যে-ঢেউ খেলছে, ঢেউ যেভাবে উঠছে আর ভাঙছে, তাতে তাকে আমার দেখা হয়ে যায়। আমি অনেকটা উত্তেজিতই বোধ করি- অনেকদিন পর বোধ করি এই আবেগটি, মনে হয় আমি হয়তো কাজির আইনশৃঙ্খলার একজন হয়ে উঠবো। নিজেকে আমি দমন করি, দমন ক'রে, শান্তি পাই না। আমি ভয় পেতে থাকি হালিমা বেগম কোনো নাটকীয় কাণ্ড করে বসবেন, আমি তাতে করতালি দিয়ে উঠবো। হালিমা বেগম অনেকটা তাই করেন; তিনি বোরখাঁটি খুলে ছুঁড়ে মারেন, কালো বাদুড়ের মতো উড়ে গিয়ে সেটি কাজির মুখ ঢেকে ফেলে; কাজি বেরাখা চেপে ধরে বসে থাকে, আমি চোখের সামনে দেখতে পাই ঝলমলে টলটলে জ্বলজ্বলে হালিমা বেগমকে। হালিমা বেগমের শরীরটি তাজা ও তন্বী, বোরখার ভেতর থেকে বেরিয়ে শ্যামল জমাট বিদ্যুতের মতো সেটি ঝলসে ওঠে আমার চোখের সামনে, আমি চারপাশে শুধু তার দেহ দেখতে পাই। হালিমা বেগম খুবই হ্রস্ব ব্লাউজ পরেছেন, বক্ষবন্ধনির থেকেও হ্রস্ব, শাড়ি

পরেছেন নাভির অনেক নিচে; তার শরীরটিকে স্তব্ধ বিদ্যুৎপুঞ্জ মনে হয়। আমার ইচ্ছে করে আবার একবার উত্তেজিত বোধ করতে, আমি নিজেকে সংযত করি। হালিমা বেগম একবার আমার দিকে হেঁটে আসতে থাকেন, আবার আমার দিক থেকে বিপরীত দিকে যেতে থাকেন; আবার আরেক দিকে হাঁটতে থাকেন; আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। হালিমা বেগমের এমন কোনো অঙ্গ নেই, যা দোলে না, দোলায় না।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, আপনে আমার শরীলটা দ্যাকতে পাইতেছেন ত?

আমি বলি, দেখতে পাচ্ছি, ভাবী।

হালিমা বেগম বলেন, দেইক্যা কি আপনার মনে হয় এই শরীল দিনরাইত কালা বোরকায় ঢাইক্যা রাখনের মতন?

আমি বলি, না, ভাবী।

হালিমা বেগম বলেন, আমি কি বুড়ী পেত্নী যে বোরকায় নিজেরে ঢাইক্যা রাখুম?

আমি বলি, আপনাকে পরী বলাই ভালো।

হালিমা বেগম বলেন, দ্যাকেন, রহিম ড্রাইবর সেকরেটারির গাড়ি চালাইতো, আমি তারে ছাইরা আইছি, অহন সেকরেটারি আমারে কয় সব সোম বোরকা পরবা আর ভিতরে

হিরোইনের ড্রেস পরবা; বিছনায় কিছু পারে না, আমারে খালি দোয়াকলমা শিকায়, নিজে জায়নমজেই পইর‍্যা থাকে, আমার লিগাও ভেলভেটের জায়নমজ কিনছে।

আমি বলি, জায়নামাজ খুব ভালো জায়গা, ভাবী।

হালিমা বেগম বলেন, জায়নমজে পইর‍্যা থাকনের বয়স আমার হয় নাই, সেকরেটারি যুদি জায়নমজে পইরা থাকতে চায় তাইলে আল্লারে পাইব, আমারে পাইব না, আমি কইয়া দিলাম।

আমি বলি, আপনিও কাজির সাথে বেহেশতে যেতে পারবেন, ভাবী।

হালিমা বেগম বলেন, ভেস্তে যাইয়া আমার কাম নাই, আমি খাড়ের ওপরই ভেস্ত পাইতে চাই, রহিম ড্রাইবার আমারে ভাঙা চকির উপরই ভেস্ত দিতো, আর সেকরেটারি আমারে দোয়া শিকায়।

আমি বলি, দোয়াকলমা শেখানোই এখন আমাদের কাজ, ভাবী, সবাইকে আমরা বেহেশত দিতে চাই, এটা আমাদের সরকারি দায়িত্ব। আমরা সবাইকে ভাত দিতে পারবো না আমরা জানি, কিন্তু বেহেশত দিতে পারবো, ইনশাল্লা। তাই আমরা ট্রাক ভরে জনগণের কাছে দোয়াদরুদ পৌঁছে দিচ্ছি আজকাল।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, আপনের সামনে সেকরেটারিরে কইয়া দিলাম এমুন করলে আমি সেকরেটারির মাইঝ্যা পোলার লগে ভাইগ্যা যামু, সেকরেটারি আফিসে গ্যালেই

মাইঝ্যা পোলা আমার লগে দ্যাকা করতে আহে, আম্মাগো বইল্যা জরাইয়া ধরে, আর ছারতে চায় না।

কাজি চিৎকার করে ওঠে, আমার ছেলের কথা আপনি বলবেন না হালিমা বেগম, আপনার পায়ে পড়ি। আমার ছেলেকে আমি আমেরিকা পাঠিয়ে দেবো।

হালিমা বেগম বলেন, পোলাটা আমারে আধাঘণ্টা জরাইয়া ধইর‍্যা রাকে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে পইরা যায়, পোলাটা আমারে যতুক্ষুন ধইর‍্যা রাকে ততুক্ষুনই আমি শান্তি পাই। আমি চাইলে হেই আমারে আমেরিকা লইয়া যাইব।

কাজি বলে, হালিমা বেগম, আপনার ওপর শয়তান আছর করেছে, আপনাকে আমার পীরের মাজারে নিয়ে যেতে হবে, আপনি শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

হালিমা বেগম বলেন, শয়তানেরে আমি হাজার দোয়া করি, শয়তানের আছর য্যান আমার উপর সব সোম থাকে, কিন্তু তোমার মত সেকরেটারির লগে আমি থাকতে পারুম না।

কাজি দোয়া পড়তে থাকে, আর কাঁদতে থাকে; কাজি কাঁদতে থাকে, আর দোয়া পড়তে থাকে।

হালিমা বেগম বলেন, এই বোরকা আমি ফেইল্যা দিলাম, আইজ থিকা তুমি নিজে ফিন্দো, নাইলে তোমার মারে ফিন্দাইও।

কাজি বলে, আপনি এমন কথা কীভাবে বলেন, হালিমা বেগম, আপনার কি দোজখের ভয় নেই?

হালিমা বেগম বলেন, তোমার লগে থাকনের থিকা দোজগে থাকতেও বেশি শান্তি পামু আমি। রহিম ড্রাইবরের লগে আমি ভেস্তে আছিলাম, সেই ভেস্তরে পায় ঠেইল্লা আমি দোজগ বাইচ্ছা নিছি, হায় আল্লা।

কাজি বেশি সময় নেয় না, তার দক্ষতা অসীম, দুটি মন্ত্রণালয় দেখছে সে;–সাত দিনের মধ্যে কাজি তার পীরের শহরে আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি প্রায়-আন্তর্জাতিক সেমিনার, একটি অ্যাকাডেমির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও একটি কুচকাওয়াজের আয়োজন করে ফেলে। কাজির দক্ষতা দেখে আমি বিস্মিত হই না, সে যে দক্ষ সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তা আমার মনে পড়ে। কাজি ঠিক করে ফেলেছে আমাকেও যেতে হবে, আমার পক্ষে না করাও সম্ভব নয়, আর আমি না করতেও চাই না। বেশ উৎসব আর আনন্দ হবে; আইনশৃঙ্খলা জানা যাবে, ভিত্তিপ্রস্তর, কুচকায়াজ, আর মাজার দেখা যাবে; কোনো অলৌকিক উপকারও হয়ে যেতে পারে।

কাজি আমাকে ফোন করে, তোমাকে যেতে হবে, পীরবাবার মাজারটা জিয়ারত করে আসতে পারবে, আর হালিমা বেগম তোমার কথা শুনবেন মনে হয়, তাকে তুমি যাওয়ার জন্যে একটু রাজি করাবে।

আমি বলি, ভাবীকে দিয়ে একটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালে কেমন হয়?

কাজি বলে, তা করতে পারতাম যদি হালিমা বেগম ঠিকমতো বাঙলা বা ইংরেজি বলতে পারতেন।

আমি বলি, এখন তা কে-ইবা পারে, তুমি ভাবীকে দিয়ে একটা পাথরটাথর বসানোর ব্যবস্থা করো, আমি তাকে রাজি করাবো।

কাজি বলে, জেনারেল হালিমা বেগমকে দেখুক আমি চাই না, আমার ভয় হয়, হালিমা বেগম সেক্রেটারির থেকে জেনারেল বেশি পছন্দ করে।

পীরবাবার পুণ্যনগরে গিয়েই কাজি মাজার জিয়ারতের ব্যবস্থা করে, সেটাই প্রথম কাজ, চারদিকে সাড়া পড়ে যায়; জেনারেল মাজারটাজার পেলেই পাগল হয়ে ওঠে, না পেলে রাতারাতি একটা তৈরি করে ফেলতে চায়; তাকে বোঝাতে কোনো কষ্ট হয় না কাজির, বরং সে-ই কাজিকে বোঝাতে থাকে; আমিও অর্ধেক রাজি হই, আমলা হওয়ার পর কোনো বিশ্বাস রাখা বা কিছু অবিশ্বাস করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়; বিশ্বাস আমার কাছে যা, অবিশ্বাসও আমার কাছে তা-ই; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে হালিমা বেগম সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান নন, মনে হয় তিনি কিছু কিছু বিশ্বাস করেন আর অবিশ্বাসও করেন অনেক কিছু; সে-অধিকার তাঁর আছে; তাকে আমাদের সাথে যেতে রাজি করাতে আমার বেশ কষ্ট হয়, রাজি করাতে পেরে আমি কাজিকে একই সাথে স্বস্তি আর অস্বস্তিতে ফেলে দিই, নিজে একটু সুখ বোধ করি; কিন্তু হালিমা বেগমকে মাজার জিয়ারত করতে রাজি করাতে পারি না।

হালিমা বেগম বলেন, উই গুলিন পুরুষপোলাগো কাম, মাজারে আমার কাম নাই; ড্রাইবর একবার আমারে লইয়া আইছিল, আমারে উপরে উটতেও দেয় নাই, আমি আর উইগুলিনে নাই।

হালিমা বেগম হাসতে থাকেন, বলেন, ড্রাইবর ত আমারে মাজারে লইয়া আইছিল, তার কী লাব হইল? পীর আমারে ত তার লিগা ধইর‍্যা রাকতে পারল না? সেকরেটারি ত আমারে ভাগাইয়া নিজের বিছনায় উঠাইল।

আমি বলি, ভাবী, তবে আপনি মাজারের নিচে না গেলে কাজির একটু বিপদ হতে পারে, জেনারেল অসন্তুষ্ট হতে পারে, জেনারেল সেকরেটারিদের স্ত্রীদের দেখতে পছন্দ করেন।

হালিমা বেগম বলেন, জেনারেল যুদি আবার আমারে পছন্দ কইর‍্যা ফ্যালে।

আমি কোনো কথা বলি না; আমি জানি জেনারেল হালিমা বেগমকে পছন্দ করবে।

হালিমা বেগম হাসেন, মনে হয় বছরখানেক ধরে হাসেন, এবং বলেন, আনিছ ভাই, আপনেরা হইলেন পুরুষপোলা, বড় বড় চাকরি করেন আপনেরা, এই দ্যাশটা চালান। আপনেরা, আপনাগো ডরে দ্যাশটা কাঁপতে থাকে, কিন্তু আমি ভাইব্যা পাই না আপনেরা যে ক্যান পীর আর মাজার লইয়া পাগল হন। পীর আর মাজারে আমার কাম নাই।

আমি তাঁকে রাজি করাতে পারি না; আমরা যখন মাজার নিয়ে মেতে উঠি তিনি তখন রেস্টহাউজে বসে ভিসিআর দেখতে থাকেন; আমি যখন মাজারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমি হালিমা বেগমকে দেখতে থাকি; তার হাসি শুনতে থাকি।

অ্যাকাডেমির মর্মরভিত্তিপ্রস্তর যখন স্থাপন করছিলো জেনারেল হালিমা বেগমের পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। আমার সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলোর একগুচ্ছ আমি তখন যাপন করি।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, কন ত এই পাথর বসাইয়া কী লাভ?

আমি বলি, এখানে একটি বড় দালান উঠবে, অ্যাকাডেমি হবে।

হালিমা বেগম বলেন, তাইলে দালানটা বানাইয়া ফ্যালাইলেই ত পারত, পাথর বসানের কী দরকার?

আমি বলি, দালান বানাতে সময় লাগে, পাথর বসাতে সময় লাগে না; আর দালান নাও উঠতে পারে।

হালিমা বেগম বলেন, আপনেরা তাইলে সব জায়গায়ই ফাঁকি দ্যান, আনিছ ভাই? বিছনায়ও ফাঁকি দ্যান, পাত্থর বসাইয়াও ফাঁকি দ্যান?

অ্যাকাডেমির মঙ্গল কামনা করে মঙ্গলময়ের কাছে মোনাজাত হচ্ছে, এটা আমরা নিষ্ঠার সাথে করে আসছি, মোনাজাত ছাড়া কিছু আমরা করি না, কিন্তু তিনি শুনছেন না বলেই সন্দেহ হচ্ছে, চারদিকে তার শোনার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; আমি (এবং আরো অনেকে) ঠিক মোনাজাত করতেও জানি না, অনেক আগে শিখেছিলাম, দরকার নেই দেখে ভুলে গেছি; তবে সিনেমাহল, হোটেল, পানশালা, প্রমোদশালা, সেতু, কারখানা, মাদ্রাসা উদ্বোধন করতে গিয়ে কয়েক শো বার আমি দু-হাত উঠিয়ে ঠোঁট নেড়েছি; আজো আমি হাত উঠোই, হাত দুটি অভ্যাসবশত ওপরের দিকে বাঁকা হয়ে উঠে যায়, ঠোঁটও নড়ে অভ্যাসবশত; কিন্তু হালিমা বেগম হাত তুলছেন না, ঠোঁট দুটি নাড়ছেন না। তিনি কি এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ছাড়া ওই দুটি ব্যবহার করেন না? হালিমা বেগম হাত তুলছেন না দেখে আমি ভয় পাই; ভিক্ষা করতে কেউ অস্বীকার করতে পারে এ-দৃশ্য আমাকে ভীত করে তোলে; যদি কোনো বজ্র আকাশ ফেড়ে এখনই তাঁর মাথায় নেমে আসে, নেমে আসারই কথা, অবশ্যই নেমে আসবে, তা আমার মাথায়ও পড়বে, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি; আমার ইচ্ছে করে দৌড়ে কোনো পাহাড়ের দিকে ছুটে যাই, আমি যেতে পারি না। বজ্রটা কোন দিক থেকে আসতে পারে? আকাশের দিকে একবার অন্যমনস্কভাবে তাকাই; আমি সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান, আমাকে সাবধান থাকতেই হবে, আমার মাথায় কোনো বজ্রপাত হতে দেয়া হবে না। অন্যদের মাথায় হতে পারে, সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তানের মাথায় নয়। বজ্রপাত হচ্ছে না দেখে আমি কম্পন বোধ করি, কাঁপতে থাকি, হতাশ বোধ করি। আমি একটি বজ্র চাই, ভীষণ বজ্রপাত চাই, যাতে আমি নিজেও ছাই হয়ে যেতে পারি; কোনো বজ্রপাত হয় না দেখে আমি কাঁপতে থাকি। হালিমা বেগম কেনো হাত তুলবেন না? তিনি কি বজ্রপাতের ভয় করেন না? তিনি কি বজ্রপাতের সংবাদ রাখেন না? বজ্রের কাল কি শেষ হয়ে গেছে? মনে হয় আমারই ভুল হয়েছে; তিনি এখনই আমাদের

শাস্তি দেবেন না; একদিন দেবেন। সেদিন বুঝতে পারবেন হালিমা বেগম। তার পাশে দাঁড়িয়ে কি আমারও বুঝতে হবে?

মোনাজাতের পর আমি হালিমা বেগমের খিলখিল হাসি শুনতে পাই। হাসিটার রঙ আমি দেখতে পাই–টকটকে লাল হাসি; হাসিটা তিনি আমাকেই শোনাতে আর দেখাতে চাচ্ছেন; কাজি অনেক দূরে আছে, তার কানে আর চোখে হাসিটা পৌঁছোবে না; হালিমা বেগম তা চান না।

খিলখিল করতে করতে হালিমা বেগম জিজ্ঞেস করেন, আনিছ ভাই, হাত উড়াইয়া ঠোঁট লড়াইয়া আপনারা কি কইলেন আল্লারে?

আমি বলি, আল্লাকে কিছু বলতে হয় না, তিনি এভাবেই সব কিছু জানেন।

হালিমা বেগম বলেন, দ্যাশের পুলিশগুলিন যেইভাবে মাইয়ালোক পাইলেই নিজেগো বিবি ভাইব্যা যা-তা করতাছে, আল্লারে সেই কথা কন নাই?

আমি বলি, কাজি হয়তো বলেছে।

হালিমা বেগম বলেন, কাজির কথা আমিই শুনি না, আল্লা কি শুনবো?

আমি বলি, আল্লা পরম করুণাময়, তিনি সবার কথা শোনেন।

জেনারেল হেলিকপ্টারে উড়ে চলে যায়। আমি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করছি, হঠাৎ কাজির গাড়ি এসে আমার গাড়ির পাশে থামে। কাজি সমস্যায় পড়েছে, সে আবার পীরের মাজার জিয়ারত করতে চায়, কিন্তু হালিমা বেগম মাজারে যেতে চাচ্ছেন না; তাঁর আর পীরের পুণ্যনগরে থাকতে ইচ্ছে করছে না; তাঁর ভয় হচ্ছে কাজি তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে মাজার জিয়ারত করতে করতে রাত করে ফেলবে। হালিমা বেগম চাচ্ছেন তাড়াতাড়ি ঢাকা ফিরে যেতে, কাজির মেজো ছেলেটির জন্যে হয়তো তাঁর সৎমাতৃহৃদয় কাঁদছে; তিনি চাচ্ছেন আমার সাথে ঢাকা ফিরতে, তাঁর সওয়াবের দরকার নেই। কাজিও আমাকে অনুরোধ করে হালিমা বেগমকে আমার সাথে নিয়ে যেতে, যাতে কাজি প্রাণভরে জিয়ারত করতে পারে। আমরা ঢাকা চলে আসি, মাজারের পাশ দিয়ে আসার সময় হালিমা বেগম খিলখিল হাসতে থাকেন; তার হাসিতে আমি কোমল স্নিগ্ধ উত্তেজনা বোধ করি, আমার ভালো লাগে, আমি সেটাকে বাড়তে দিই না, গোপন করে রাখি, নিজের শরীরে স্তব্ধ করে রাখি, এবং মনে করতে থাকি যা গোপন তা-ই নিষ্পাপ। হালিমা বেগমকে আমি নিষ্পাপভাবে কাজির বাসায় পৌঁছে দিই।

রাত বারোটার দিকে টেলিফোন বেজে ওঠে; পুণ্যনগরের ডিসি কথা বলছে।

ডিসি বলে, স্যার, আমি আবদুর রহমান মিয়া বলছি, স্যার।

আমি বলি, বলুন।

সে বলে, একটা দুঃসংবাদ আছে স্যার, কাজি স্যারের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, স্যার।

আমি জানতে চাই, কোথায়?

সে বলে, পীরের মাজার থেকে মাইলখানেক দূরে, স্যার, একটা ট্রাকের সাথে মুখোমুখি কলিশন হয়, স্যার।

আমি জানতে চাই, কাজি এখন কেমন আছে?

সে বলে, কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন, স্যার।

আমার বলতে ইচ্ছে করে, ইন্তেকালের অর্থ কী আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন, কিন্তু আমি বলি, আচ্ছা।

সে বলে, কাজি স্যারের স্ত্রী আপনার সাথে গেছেন, স্যার।

বলতেই লাইনটা কেটে যায়। আবদুর রহমান মিয়া কি ইচ্ছে করেই লাইনটি কেটে দিলো? সে কি মনে করছে কাজির স্ত্রী এখন আমার সাথেই আছে?

আবার ফোন বাজে, আবদুর রহমান মিয়া বলে, আমি খুব দুঃখিত, স্যার, লাইনটা কেটে গিয়েছিলো, স্যার, কাজি স্যারের স্ত্রীকে সংবাদটা জানাতে আমি ভয় পাচ্ছি, স্যার, তিনি হয়তো ভেঙে পড়বেন, স্যার।

আমি বলি, আচ্ছা, আমি জানাবো।

এ-মধ্যরাতে কাজির অ্যাক্সিডেন্ট আর ইন্তেকালের সংবাদ পেলে কি খুশি হবেন হালিমা বেগম? তার ঘুমের থেকে এই সংবাদ কি বেশি মূল্যবান? তিনি কি মধ্যরাতে টেলিফোন ধরেন? আমি টেলিফোন করবো তাকে? কীভাবে আমি তাকে সংবাদটি দেবো? এর আগে কখনো আমি কাউকে মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছি? কারো মৃত্যুর সংবাদ শুনলে কোন দোয়াটি যেনো পড়তে হয়? আমি কি সেটা পড়েছি? কোনটা পড়তে হয়, কোনটা? এমন সময় আবার টেলিফোন বেজে ওঠে। ডিসি কি আবার ফোন করলো? এবার কি সে বলবে কাজি বেঁচে উঠেছে? আমলাতান্ত্রিক ভুলবশতই সে আগের সংবাদটি দিয়েছিলো? এখন সে ক্ষমা চাচ্ছে।

টেলিফোন ধরতেই শুনতে পাই, আমি ডলি বলছি।

আমি বলি, অনেক দিন পর ফোন করলে?

ডলি বলে, আজকাল কি নিজের বাসায় ঘুমোও না? মিস্ট্রেসের বাসায়ই ঘুমোচ্ছা, না কি?

আমি বলি, মিস্ট্রেস থাকলে তার বাসায়ই ঘুমোতাম, কিন্তু আমি অতো ভাগ্যবান নই, আজো কোনো মিস্ট্রেস পাই নি।

ডলি বলে, তাহলে পাওয়ার চেষ্টা করছো?

আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আর আমার জন্যে দুঃখ পাই, ডলি।

ডলি বলে, কেনো দুঃখ পাও?

আমি বলি, তোমাকে আমি একটি ক্ষ্যাপা নারীতে পরিণত করেছি বলে। শক্তি থাকলে তোমাকে আমি সেই ছোট্ট বালিকাটি করে দিতাম, যে মধুর ছিলো, মিষ্টি ছিলো।

ডলি বলে, তোমার এসব বাজে কথা শোনার সাধ নেই আমার। আমি জানতে চাই দু-রাত ধরে কোন মিস্ট্রেসের বাড়ি ঘুমোচ্ছা?

আমি বলি, আমি যেখানেই ঘুমোই তোমার কিছু আসে যায় না, যেমন তুমি যেখানেই ঘুমোও আমার কিছু আসে যায় না।

ডলি বলে, এই ক-মাস তুমি কারো সাথে ঘুমোও নি, দেবতাটি হয়ে আছো, এটা কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

আমি বলি, তোমাকে আমি কিছুই বিশ্বাস করতে বলি না।

ডলি বলে, তোমার গলার আওয়াজ শুনেই আমি বুঝতে পারছি আজ সন্ধ্যায়ই তুমি কোনো মেয়েলোকের সাথে শুয়েছে।

আমি বলি, ডলি, তুমি ভালো নেই।

ডলি বলে, তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করেছে, তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

ডলি ফোন রেখে দেয়।

আমার একটি চমৎকার অভ্যাস হয়েছে, চমৎকার বলেই আমার মনে হচ্ছে; বালিশের নিচে আমি একটি হুইস্কি বা ব্র্যান্ডির বোতল রেখে দিই, যখন ইচ্ছে করে ছিপি খুলে এক চুমুক খাই, খেতে খেতে ছিপিটা বন্ধ করি, বন্ধ করতে করতে আরেক চুমুক খেতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে ছিপি খুলি, আরেক চুমুক খাই। জিভের নিচে কখনো একটু মিষ্টি স্বাদ লেগে থাকে, কখনো টক স্বাদ, অনেকক্ষণ ধরে জিভ এদিক সেদিক নেড়ে ওই স্বাদটা আমি চুষে নিই। গ্লাশে ঢেলে খেতে আমার ইচ্ছে করে না। গ্লাশে ঢাললে স্থির হয়ে বসে দায়িত্ব পালনের মতো খেতে হয়, মনে হয় কোনো ফাইল নিয়ে বসেছি, এখনি দরোজা ঠেলে বা ফোন বাজিয়ে কোনো তদবির ঢুকবে; এবং মনে হয় আমি মাতাল, একটু পরেই রাস্তায় নেমে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে থাকবো, যাকে পাবো তার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইবো, ঝরঝর করে কাঁদবো। ছিপি খুলে চুমুক দেয়ার অভ্যাস যে আমার চিরকাল থাকবে, তা মনে হয় না; কেনোইবা আমি একটি অভ্যাস সব সময়ের জন্যে বয়ে চলবো? ওই অভ্যাসের সঙ্গে আমার কোনো চুক্তি হয় নি; আমি কোনো চুক্তিতে বাঁধা পড়তে চাই না। আজ অফিস থেকে ফিরে, খাওয়ার আগে, কয়েকবারই বোতলের ছিপি খুলেছি; এটার স্বাদ একটু মিষ্টি, আমার বারবার ছিপি খুলতে ইচ্ছে করছে। লোকটির কী যেনো নাম?–দীন মুহাম্মদ?–সে এসে দরোজায় শব্দ করছে, আমি তাকে ঢুকতে বলি। সরাসরি বোতল উল্টে খাচ্ছি দেখে সে অবাক হয়, একটি গ্লাশ এনে আমার সামনে রাখে।

আমি বলি, তোমার কী যেনো নাম?

লোকটি বলে, আমার নাম দীন মুহাম্মদ, স্যার।

আমি বলি, তোমাকে গ্লাশ আনতে কে বলেছে?

লোকটি ভয় পায়, তার ভয় পাওয়া দেখে আমার খারাপ লাগে।

আমি বলি, আমার বিশেষ সেবা করা আমি পছন্দ করি না। আমি যা করতে বলি না আমার জন্যে তা করবে না।

লোকটি গ্লাশ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমি খাবার দিতে বলি। আমি খেতে বসি, দীন মুহাম্মদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি ডাকি, দীন মুহাম্মদ।

লোকটি কাছে এসে বলে, জি, স্যার।

আমি বলি, এই ভাত মাছ মাংস ডাল শব্জি কে বেঁধেছে?

লোকটি বলে, আমিই রানছি, স্যার।

আমি বলি, রান্নার সময় তুমি এগুলোতে থুতু ছিটিয়ে দাও নি তো?

লোকটি ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে; বলে, নাউজুবিল্লা, কী যে কন স্যার, আমি গরিব মানুষ, আমি ইবলিশ না।

আমি বলি, আমাকে মেরে ফেলতে তোমার ইচ্ছে করে না?

লোকটি আবার নাউজুবিল্লা বলে চিৎকার করে ওঠে।

আমি খেতে থাকি, খেতে আমার ভালো লাগে;–এ-বয়সে কি আমার খেতে ভালো লাগা উচিত? দীন মুহাম্মদ যদি খাবারে থুতুও ছিটিয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হবে তার থুতু সুস্বাদু। লোকটি কি আমার খাবারে থুতু ছিটিয়ে দিতে পারে না? থুতু ছিটোনোর সাহস হবে লোকটির? লোকটি কি আমাকে ঘেন্না করতে পারে না? আমাকে ঘেন্না করার সাহস হবে লোকটির? দুপুরে ঘুমিয়ে থাকার সময় লোকটি আমাকে দু-ভাগ করে ফেলতে পারে না? ঘুমোনোর সময় সাবধান হতে হবে, দরোজা বন্ধ করে ঘুমোতে হবে। খেতে আমার ভালো লাগছে। আবার প্রশ্নটি আমার মনে জাগছে;–এ-বয়সে কি খেতে আমার ভালো লাগা উচিত? সব কিছু মেনে খাওয়া উচিত নয়? খাসির মাংসের টুকরোটায় চর্বিটুকু জ্বলজ্বল করছে। আমার কি চর্বিটুকু খাওয়া উচিত? আমি চর্বির টুকরোটিকে মুখে তুলে দিই, ঝনাৎ করে তীব্র একটা স্বাদ আমার রক্তে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি আরেকটি চর্বির টুকরো খুঁজতে থাকি, চামচ দিয়ে নাড়তেই একটি টুকরো জ্বলজ্বল করে ওঠে। চামচ দিয়ে টুকরোটি আমি নাড়তে থাকি, অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি, নাড়তে আমার ভালো লাগে; আমার আর টুকরোটি খেতে ইচ্ছে করে না।

আমি বলি, দীন মুহাম্মদ, তোমার আগের ঘরের মেয়ের অবস্থা কী?

দীন মুহাম্মদ চমকে ওঠে, আমার মাইয়ার কতা আপনের মনে আছে, স্যার?

আমি বলি, হ্যাঁ, মনে আছে।

দীন মুহাম্মদ বলে, আমার মাইয়াডার ডাইন চোখে একটা পর্দা পড়ছে, স্যার।

আমি বলি, তুমি তো গরিব মানুষ?

দীন মুহাম্মদ বলে, জি, স্যার, অইত্যান্ত গরিব।

আমি বলি, গরিব মানুষের মেয়ের একটি চোখে চলে না?

দীন মুহাম্মদ বলে, স্যার, আমার মাইয়াটা বড় ভাল, ফাস্ট হইছে, স্যার।

আমি বলি, এখন কী করবে?

দীন মুহাম্মদ বলে, হাসপাতালে খবর নিছি, স্যার, দশ হাজার টাকা লাগবো; আমার অতো ট্যাকা নাই।

আমি বলি, আজ কী বার?

দীন মুহাম্মদ বলে, শুক্রবার, স্যার।

আমি বলি, আজই যাও, সোমবার সরাসরি মেয়েটিকে নিয়ে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে। আমার কথা বললেই চলবে।

আমি ক্রিসেন্ট হাসপাতালের গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান, অথচ আজো কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করাই নি।

হালিমা বেগম টেলিফোন করেছেন

হালিমা বেগম টেলিফোন করেছেন, আনিছ ভাই, আপনে অ্যাকবারো আমারে দেকতে আইলেন না।

আমি বলি, মনে মনে আমি আপনাকে প্রতিদিনই দেখছি।

হালিমা বেগম বলেন, কিন্তু সামনে আইসা কি অ্যাকবারো আমারে দেকতে ইচ্ছা হয় না আপনের? আমি কি এমুনই পেত্নী?

আমি বলি, আপনাকে তো আমার পরীই মনে হয়।

হালিমা বেগম বলেন, আপনের পায়ে ধইর‍্যা আমার চুমা খাইতে ইচ্ছা হয়, আপনের লগে না আইলে আমিঅতো কাজির লগে চইল্যা যাইতাম।

আমি বলি, তখন হয়তো অন্য রকম হতো।

হালিমা বেগম বলেন, অত বড় কামেল পীরে কাজিরে বাঁচাইতে পারল না, আমারে কে বাঁচাইত?

আমি বলি, রাব্বুল আল আমিন।

হালিমা বেগম বলেন, কার কতা কইলেন বুজতে পারলাম না। এমুন কঠিন কতা কইয়েন না, আনিছ ভাই, আমি ত আসলে আছিলাম রহিম ড্রাইবরের বউ।

আমি বলি, আপনি আমার কাছে মিসেস কাজি আহমদ সালেকিন।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, আপনেরে এখনই একটু আসতে হইব, একটা গোপন কথা আছে আপনের লগে। আর কারে কইতে পারতেছি না।

বিকেলে আমি মিসেস কাজির সাথে দেখা করতে যাই; দেখে আমার ভালো লাগে; আমি আবার একটু উত্তেজনা বোধ করি, এবং উত্তেজনাটুকু গোপন করে আমি পরিপূর্ণ নিষ্পাপ বোধ করি।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, আপনে নিচ্চই বুজতে পারছেন কাজির মরনে আমি কষ্ট পাই নাই।

আমি বলি, তবে একথা অন্য কাউকে বলবেন না।

হালিমা বেগম বলেন, আনিছ ভাই, আছিলাম রহিম ড্রাইবরের বউ হইলাম সেকরেটারির বউ, কতাটা যে সকলকে বলন ঠিক না তা আমি বুজি; তয় সকলকে মিছা কতা কইতে কইতে আমার ঘিন্না ধইর‍্যা গ্যাছে, আপনেরে সইত্য কতাটা কইলাম। এখন আমার ইকটু শান্তি লাগতেছে।

আমি বলি, কী একটা গোপন কথা বলবেন বলছিলেন?

হালিমা বেগম বলেন, আপনের কাছে আর শরম কইর‍্যা কী হইব, আনিছ ভাই; কতাটা কইয়াই ফালাই। কাজির মাইজ্যা পোলা আমারে বিয়া করতে চায়।

আমি একবার চমকে উঠি।

হালিমা বেগম বলেন, কিন্তু কতাটা হইল সরকার আমারে একটা বাড়ি দিবো ঘোষণা করছে, কিন্তু বিয়া বইলে কি বাড়িটা আমি পামু?

আমি বলি, বোধ হয় পাবেন না।

হালিমা বেগম বলেন, আরেকটা কতা হইল আমার দুই মাসের প্যাট চলতাছে।

আমি বলি, তাহলে তো বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

হালিমা বেগম বলেন, তয় আমার প্যাটের জিনিশটা কাজির না, কাজির মাইজ্যা পোলারই।

বাসায় ফিরে বোতল থেকে চুমুক দিয়ে একটু পান করার সময় মনে পড়ে দীন মুহাম্মদের মেয়ের চোখের অপারেশনটা কি হয়ে গেছে? ক-তারিখে হবে বলে যেনো দীন মুহাম্মদ বলেছিলো? সে কি আমাকে বলেছিলো? নিশ্চয়ই বলেছিলো; হয়তো একবারের বেশি বলতে সাহস করে নি, তাই আমার মনে নেই। মেয়েটি ক্লাশে ফার্স্ট হয়? ফার্স্ট হয়ে কী হবে?

কতো মেয়েই ফার্স্ট হয়, আরো কতো মেয়েই তো ফার্স্ট হতে পারতো। কতো নম্বর কেবিনে আছে মেয়েটি? আমি বলে দিয়েছি, কেবিনেই রাখবে মেয়েটিকে, কিন্তু কত নম্বর কেবিন? দীন মুহাম্মদ কি আমাকে কেবিনের নম্বর বলেছিলো? নিশ্চয়ই বলেছিলো; দীন মুহাম্মদকে কয়েক দিন ধরে উদ্বিগ্ন দেখছি না, খুশিখুশি দেখছি, মেয়েটি কেবিনেই আছে। কিন্তু কতো নম্বর? আমার কি মেয়েটিকে দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে না, দীন মুহাম্মদের মেয়ে কোন কেবিনে পড়ে আছে, তা নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। পরপর চারটি ফোন এলো; আমার এ-সন্ধ্যায় দু-জায়গায় নিমন্ত্রণ রয়েছে; আমি বারবার বলছি, না, না, অত্যন্ত দুঃখিত, কোনো নিমন্ত্রণেই আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। বাসায় বসে থাকতেও কি আমার ইচ্ছে করছে? আমি হাসপাতালে ফোন করি। অভ্যর্থনায় করি না, সেখানকার মেয়েগুলো আমাকে চিনবে না; আমি বড়ো ডাক্তারটিকেই করি; ফোন পেয়ে সে পাগল হয়ে ওঠে; জানায় যে রোকেয়ার অপারেশন হয়ে গেছে, খুব ভালো অপারেশন হয়েছে, কোনো চিন্তার কারণ নেই, তিনি নিজেই করেছেন, তার দেখাশোনার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না, একটি নার্স সব সময় তার পাশে থাকছে; সে পনেরো নম্বর কেবিনে আছে, ভিআইপি কেবিন। আমার হাসি পাচ্ছে। মেয়েটির তো দু-চোখে পর্দা পড়ে চোখ দুটি বুজে যাওয়ার কথা। দীন মুহাম্মদের মেয়ের বড়ো জোর বারান্দায় পড়ে থাকার অধিকার আছে। তার বেশি অধিকার তাকে আমরা দিই নি; দেবো না। কিন্তু সে এখন কেবিনে? এই কেবিনে থাকা কি তার সারাটি জীবনকে নষ্ট করে দেবে না? সে কি মনে করবে না দেশ তার জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা করে রেখেছে? আমার হাসি পাচ্ছে। কয়েক বছর পর যদি আমার দরকার হয়, আমি কি ভিআইপি পাবো? একটা নার্স সব সময় আমার দেখা শোনা করবে? দীন মুহাম্মদ এসে দরোজায় শব্দ করছে, খাবো কি না জানতে চাচ্ছে; আমি কিছু বলছি না। আমি বেরোচ্ছি। দীন মুহাম্মদকে বলি যে আমি একটু বাইরে বেরোচ্ছি; সে জানায় যে ড্রাইভার নেই; না থাকায় আমি স্বস্তি পাই। আমি একটি রিকশায় উঠি, লোকটি কোথায় যাবো

জানতে চাইলে আমার কোনো জায়গার নাম মনে পড়ে না, এবং হাসপাতালটির নাম মনে পড়ে; আমি হাসপাতালটির নাম বলি। পনেরো নম্বর কেবিনে ঢুকে দেখি মেয়েটি শুয়ে আছে, তার ডান চোখটি বাঁধা।

তুমি কি দীন মুহাম্মদের মেয়ে? বলতে গিয়ে আমি থেমে যাই; মেয়েটির খোলা একটি চোখ আর চুলের দিকে তাকিয়ে, শুয়ে থাকার ভঙ্গি এবং একটি হাতের আঙুলগুলো দেখে দীন মুহাম্মদকে আমি দীন মুহম্মদ বলতে পারি না; আমি বলি, তুমি কি দীন মুহাম্মদ সাহেবের মেয়ে?

মেয়েটি উঠে বসতে চায়, নার্স তাকে বসতে দেয় না।

মেয়েটি বলে, জি।

আমি বলি, তোমার নাম কি রোকেয়া?

মেয়েটি আবার উঠে বসতে চায়, নার্স তাকে বসতে দেয় না।

মেয়েটি বলে, জি।

আমি বলি, তুমি ভালো আছো?

মেয়েটি বলে, জি।

আমি বলি, আচ্ছা, এখন চলি।

মেয়েটি বলে, আপনি কে; আব্বাকে কী বলবো?

আমি বলি, কিছু বলতে হবে না, তুমি ঘুমাও।

দু-দিন পর বারান্দা থেকে দেখতে পাই দীন মুহাম্মদ মেয়েকে নিয়ে দেয়ালের পাশে তার ঘরটিতে ঢুকছে। দীন মুহাম্মদের ঘরটি কেমন আমি কখনো দেখি নি। কিছুক্ষণ পর দীন মুহাম্মদ আসে।

দীন মুহাম্মদ বলে, স্যার, মাইয়ার চোখ ভাল অইয়া গেছে, হাসপাতাল থেইক্যা, লইয়া আইলাম, তয় আরো একমাস থাকতে অইব।

আমি বলি, তোমার মেয়ে কোথায় থাকবে।

দীন মুহাম্মদ বলে, আমার ঘরেই থাকব, স্যার।

আমি বলি, তোমার মেয়ে কি তোমার ঘরে থাকতে পারবে? কেবিনের পর কি ওই ঘর ভালো লাগবে?

দীন মুহাম্মদ বলে, অর ত কেফিনে থাকনের কতা আছিল না, স্যার, আপনের দয়ায় সেইটা অইছে।

আমি বলি, তোমার মেয়েকে একবার ডাকতে পারবে?

দীন মুহাম্মদ বেশ দ্রুত বেরিয়ে যায়, এতোটা সে আশা করে নি; এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে। দীন মুহাম্মদের পেছনে তার মেয়ে, রোকেয়া, শালোয়ার কামিজপরা; আমাকে দেখেই সে চমকে ওঠে; আমি তার চমকানোটা উপভোগ করি। দীন মুহাম্মদ বারবার মেয়েটিকে সালাম করতে বলে, রোকেয়া আমাকে সালাম করার জন্যে মাথা নিচু করে, আমি তাকে ধরে রাখি, সে সালাম করতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আনি; মনে হচ্ছিলো দীর্ঘ সময় ধরে তাকে আমি ধরে আছি। এই মেয়ে দীন মুহাম্মদের? কোনো সেকরেটারির নয়? চারপাশের সেকরেটারিদের মেয়েগুলোকে দেখে আপনা থেকেই আমার চোখ বুজে আসে, তাই এ-বয়সেও সাধারণত তাদের দিকে তাকাই না; কিন্তু আমি দীন মুহাম্মদের মেয়েকে দেখি।

আমি বলি, রোকেয়া, তুমি এখন ভালো আছো?

রোকেয়া বলে, জি, ভালো আছি।

আমি বলি, তুমি কি তোমার বাবার ঘরে থাকতে পারবে?

রোকেয়া বলে, জি, পারবো।

আমি বলি, পশ্চিম দিকের ঘরটি তো খালি পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে তুমি থাকতে পারো।

দীন মুহাম্মদ খুশি হয়ে ওঠে; রোকেয়ার মুখেও ঝিলিক দেখা দেয়।

দু-তিন দিন বা তার বেশি হবে আমি মেয়েটিকে দেখি নি; একটি মেয়ে যে পাশেই একটি ঘরে আছে, তাও টের পাই নি। সেদিন বিকেলে বাসায় গাড়ি ঢুকতেই দেখি রোকেয়া ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে, হয়তো চোখটিকে পরীক্ষা করছে; ঘাস আর ফুলের বাগানে ওকে বেশ মানিয়েছে; আমি নামতেই সালাম দেয়। এই প্রথম ওকে আমি হাসতে দেখি। ওর হাসিটি আমার ভালো লাগে, অনেক দিন কোনো হাসি এতোটা ভালো লাগে নি; আরো দেখতে ইচ্ছে করে; কিন্তু আমি কি ওকে আমার সাথে ওপরে উঠতে বলতে পারি? ও কি রাজি হবে? আমার সাথে ওপরে উঠতে কি ওর ভালো লাগবে? দীন মুহাম্মদকে আমি যে-কোনো আদেশ দিতে পারি, ওকে পারি না; ও দীন মুহাম্মদ নয়। আমার ইচ্ছে করে আমার সাথে ও ওপরে আসুক। আমি ওকে আমার সাথে আসতে বলি, বলার আগে একটু দ্বিধা হচ্ছিলো, কিন্তু বলার সময় আমার কোনো দ্বিধা থাকে না। ভেবেছিলাম ও আসবে না; লজ্জা পাবে, বা ভয়, কিন্তু ও আমার সাথে হাঁটতে থাকে, এমনভাবে হাঁটে যেনো খুব সুখ পেয়েছে, এমন সুখ ও চেয়েছিলো মনে মনে, না পেলে খুব দুঃখ পেতো। ও সিঁড়ি দিয়ে আমার সাথে দোতলায় ওঠে, আমার সাথে ঘরে ঢোকে। আমি সোফায় বসি, ওকে বসতে বলি না; শুধু জিজ্ঞেস করি ও কেমন আছে। ও জানায় ভালো আছে, কিন্তু একলা লাগছে; আসার সময় একটিও বই আনে নি, মনে হয়েছিলো পড়তে পারবে না; কিন্তু এখন কয়েকটি বই পেলে ওর সময় সুন্দরভাবে কাটতো। আমি ওকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে যাই, বইয়ের আলমারিগুলো খুলে দিই। এতো বই ও

কখনো দেখে নি, দেখে ওর চোখ থেকে আলো বেরোতে থাকে। আমি শেলফ থেকে একটির পর একটি বই নামিয়ে দিতে থাকি, বইগুলোর নাম দেখে দেখে ও দু-হাতে বুকে চেপে ধরতে থাকে; বুক ভরে যাওয়ার পর বইগুলো নামিয়ে রেখে আমার হাত থেকে আরো বই নিতে থাকে। আমি আলমারি খালি করে ফেলতে থাকি; ও যে এতো বই পড়তে পারবে না, আমার মনে থাকে না; বই নামাতে আমার ভালো লাগে।

মেয়েটি বলে ওঠে, খালু, আপনার এতো বই!

আমি বলি, তুমি আমাকে খালু বলবে না।

মেয়েটি চমকে ওঠে, দীন মুহাম্মদের মতো ভয় পায় না।

সে জানতে চায়, কেনো?

আমি বলি, আব্বা, বাবা, কাকা, খালু এসব ডাক আমি পছন্দ করি না।

মেয়েটি বলে, কেনো পছন্দ করেন না?

আমি বলি, আমি কারো আব্বা, চাচা, খালু হতে চাই না।

মেয়েটি বলে, তাহলে আপনাকে কী ডাকবো?

আমি বলি, দীন মুহাম্মদ যা ডাকে তুমি তাই ডাকতে পারো।

মেয়েটি একটু বিষণ্ণ হয়, জিজ্ঞেস করে, স্যার?

আমি কথা বলি না, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আবার কয়েক দিন দেখি নি মেয়েটিকে। সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর একটু শুয়ে আছি, শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না, একটু পরেই বেরিয়ে পড়তে হবে; শুনতে পাই মেয়েটি দরোজায় টোকা দিয়ে বলছে, স্যার, আমি কি ভেতরে আসবো?

আমি বলি, এসো।

ভেতরে ঢুকে ও সালাম দেয়, আস্তে আস্তে আমার দিকে এগোয়, মুখে ওর নিজস্ব হাসিটি, এবং হাতে কয়েকটি বই।

মেয়েটি বলে, স্যার, বইগুলো পড়া হয়ে গেছে, তাই এলাম।

আমি বলি, বসো।

মেয়েটি বলে, আমি এভাবেই ভালো আছি, স্যার, দাঁড়িয়ে কথা বলতেই আমার ভালো লাগে।

আমি আবার বলি, বসো।

মেয়েটি বিব্রত হয়ে বলে, আপনার সামনে বসতে আমার সাহস হবে না।

কথাটি শুনতে আমার ভালো লাগে। ওর চলতি বাঙলাটিও ভালো লাগে, মাঝেমাঝেই ওর চলতি উচ্চারণের মধ্যে আঞ্চলিক ঢুকে ওর কথাগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে।

আমি বলি, তুমি বসো।

মেয়েটি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে যেনো ভয় পায়, বলে, আপনার সামনে আমি চেয়ারে বসতে পারবো না, স্যার।

আমি বলি, তাহলে বিছানায়ই বসো।

মেয়েটি বিছানায় আমার পায়ের দিকে বসে, বিব্রত হয়ে হাসে, ওর ঠোঁটের মাংস ফুলে ওঠে; আর অমনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

আমি বলি, হ্যালো।

ডলি বলে, তোমাকে আমি ভুলে যাই নি, তুমিও আমাকে ভুলে যাবে তা আমি হতে দেবো না, তুমি মনে রেখো।

আমি বলি, ডলি, এখন আমি একটি সুন্দর সময় কাটাচ্ছি, সত্যিই আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

ডলি বলে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ইচ্ছে করবে কেনো? তোমার ইচ্ছে করবে কোনো বুড়ীর সাথে কথা বলতে। হয়তো কোনো একটা বুড়ীকে শোয়ানোর ফন্দি করছে; এর চেয়ে সুন্দর সময় তুমি কোথায় পাবে?

আমি বলি, তুমি কি এর জন্যেই ফোন করেছো?

ডলি বলে, তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো ভাবছি।

আমি বলি, তোমার ভাবনার ওপর আমার কোনো হাত নেই।

ডলি বলে, কিন্তু আমার মনে হয় তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি সুখী হবে, তোমাকে আমি ওই সুখটা দিতে চাই না।

আমি বলি, আমি কখনো সুখী হতে চাই নি, সুখের মতো সামান্য জিনিশ আমি চাই না।

ডলি বলে, তোমার মুখে আমি থুতু দিই।

ডলি ফোন রেখে দেয়।

আমি মেয়েটিকে বলি, আমার স্ত্রী ফোন করেছিলো।

মেয়েটি বলে, তিনি কোথায় থাকেন?

আমি বলি, লন্ডনে।

আমার মনে হয় মেয়েটি আরো কথা বলতে চায়, আমাদের সম্পর্কে ওর মনে আরো অনেক কথা জমে গেছে, কিন্তু বলে না।

আমি বলি, তুমি কি আরো কিছু জানতে চাও?

মেয়েটি বলে, না, না; আমি আর কিছু জানতে চাই না।

আমি বিছানার নিচে থেকে বোতলটি বের করে একবার চুমুক দিই, ছিপি লাগিয়ে বোতলটি রাখি, মেয়েটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আমি বলি, তোমার কি আরো বই লাগবে?

মেয়েটি বলে, জি, স্যার।

আমি বলি, ওই ঘরে গিয়ে তুমি যেগুলো ইচ্ছে নিয়ে নাও।

মেয়েটি বলে, আরেকটু বসি, স্যার?

আমি বলি, কেনো বসতে চাও?

মেয়েটি বলে, বসতে ইচ্ছে করছে।

আমিই উঠি; শুয়ে থাকতে আমার ভালো লাগছে, শুয়ে থাকতে আমার খারাপ লাগছে। মেয়েটিকে আমি পড়ার ঘরে নিয়ে যাই, আলমারি থেকে বই নামিয়ে দিতে থাকি, মেয়েটি দু-হাতে বই জড়িয়ে ধরতে থাকে।

আমি বেরিয়ে যাই, বেশ রাত করেই ফিরি, অনেক কাজ ছিলো। ফেরার সাথে সাথে দীন মুহাম্মদ এসে জানতে চায় খেতে দেবে কি না। আমি তাকে খাবার দিতে বলি। খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি রোকেয়া টেবিল সাজাচ্ছে; ওর টেবিল সাজানো দেখে আমার ভালো লাগে।

মেয়েটি বলে, স্যার, আজ আমি বেঁধেছি, কেমন যে হয়েছে জানি না।

দীন মুহাম্মদ বলে, আমি অরে রানতে দিতে চাই নাই, স্যার, ওই জোর কইর‍্যা রানলো। ভাল না অইলে মাপ কইরা দিয়েন।

খাওয়ার ব্যাপারটি কখনোই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; খুব স্বাদ হলে আরো খাওয়ার জন্যে পাগল হই না, স্বাদ না হলে ছুঁড়ে ফেলি না; কেউ যত্ন করে খাওয়ালে তৃপ্তিতে ভরে

উঠি না; কেউ পাতে খাবার দিতে থাকলে উচ্ছ্বসিত হই না। আমার কাছে খাওয়া হচ্ছে খাওয়া, তার বেশি নয়। দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি ভয়ে আছে, হয়তো আমি বলবো রান্না ভালো হয় নি; আবার একটু প্রত্যাশায়ও রয়েছে, হয়তো আমি বলবো চমৎকার হয়েছে, কিন্তু আমি কিছুই বলি না। ভয় আর প্রত্যাশার মধ্যে থেকে থেকে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কিছু একটা আমার বলা উচিত; মেয়েটি বেশ ক্লান্তিতে রয়েছে।

আমি বলি, রোকেয়া, তুমি কতোটা রাত জেগে থাকো?

রোকেয়া বলে, একটা-দুটো হবে, স্যার।

আমি বুলি, এতো রাত জেগে কী করো?

রোকেয়া বলে, পড়ি, আর মাঝেমাঝে ভাবি, স্যার।

আমি বলি, কী ভাবো?

রোকেয়া বলে, মাধ্যমিক পাশ করার পর আমার কী হবে, সেকথা ভাবি, স্যার। আমার তো ভবিষ্যৎ নেই।

আমি চমকে উঠি।

রোকেয়া বলে, আপনি কখন ঘুমোন, স্যার।

আমি বলি, বারোটা-একটা হবে।

বেশ রাত হয়েছে, আমি ঘুমোই নি; দু-তিনটি বই একসাথে পড়ছি, একটি সিনেমা পত্রিকাও অনেকক্ষণ ধরে উল্টোচ্ছি, মাঝেমাঝে ছিপি খুলে বোতল থেকে একটু একটু পান করছি, ডলির টেলিফোনের কথা বারবার আমার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, আমার হাসি পাচ্ছে, খুব দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে, অ্যাসট্রেতে একটি সিগারেট রেখে আরেকটি সিগারেট একবার জ্বালিয়ে ফেলেছি, এমন সময় দরোজায় একটু শব্দ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, কে?

মেয়েটি বলে, আমি, স্যার।

আপনি জেগে আছেন?

আমি বলি, ভেতরে আসবে?

মেয়েটি বলে, জি, স্যার।

রোকেয়া ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে, আমি ওকে বসতে বলি না; ও যেনো আগে থেকেই জানে কোথায় ওর বসার স্থান, কোথায় ও বসবে। ও বিছানায় আমার পায়ের

কাছে এসে বসে। ওর বসার ভঙ্গিটি ভাস্কর্যের মতো; আমার ভালো লাগে। এখন কতো রাত? দুটো? তিনটে? মেয়েটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে; আমি ওর দিকে সরাসরি তাকাই, আমি দেখি।

আমি বলি, তোমার ঘুম আসছে না?

মেয়েটি বলে, ইচ্ছে করেই ঘুমোচ্ছি না, স্যার। জেগে থাকতে ইচ্ছে করছে।

আমি বলি, এখানে কেনো এলে?

মেয়েটি বলে, ইচ্ছে করলো, আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করলো।

আমি বলি, কেনো ইচ্ছে করলো?

মেয়েটি বলে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি কথা বলার সময় হাসে, হাসতে হাসতে কথা বলে, এই ওর অভ্যাস; ওর প্রতিটি কথায় হাসির একটা ঝংকার লেগে থাকে। আমার ভালো লাগে।

আমি বলি, আমার সাথে সারারাত জেগে থাকতে পারবে?

ও ঝলমলিয়ে ওঠে, পারবো, স্যার। এক রাত কেনো, দু-তিন রাতও জেগে থাকতে পারবো।

আমি বলি, একরাত পারবে তো?

মেয়েটি বলে, আপনি কি সত্যিই সারারাত জেগে থাকবেন?

আমরা সারারাত জেগে থাকি। এর আগে আমি কখনো সারারাত জেগেছি? জেগে থাকতে ইচ্ছে করেছে? আমার মনে পড়ে না। ডলিকে নিয়ে কখনো সারারাত জেগেছি? আমার মনে পড়ে না। এ-মেয়েটি যদি ডলি হতো, সারারাত জেগে থাকতে পারতাম? জেগে থাকতে ইচ্ছে করতো? না, ইচ্ছে করতো না। রোকেয়াকে আমি একটি বই পড়তে বলি, ও পড়তে থাকে; অনেকখানি পড়া হয়ে গেলে আরেকটি বই পড়তে বলি, ও পড়তে থাকে, আমি শুনতে থাকি, এবং আমি ওকে দেখি। দেখতে আমার ভালো লাগে। আমি যে ওকে দেখছি, ও বুঝতে পারছে; ওর ভালো লাগছে। ওর ঠোঁট দুটি বেশ মাংসল, ওর পড়ার সময় মাংসের আশ্চর্য সঞ্চালন চোখে পড়ে। ওর মুখটিও পরিপূর্ণ, কোথাও শুষ্কতা নেই, সবটাই সজল। আমি ওকে দেখি। আমার কি ওকে দেখা ঠিক হচ্ছে? একবার পড়া বন্ধ করে ও আমার কাছে গল্প শুনতে চায়। ওকে আমি কোন গল্পটি শোনাতে পারি? আমি ঠিক করতে পারি না। শেষে একটি গল্প বলি, এক পুত্র খুন করে পিতাকে; সে খুন করতে চায় নি, তবু খুন করে, আর বিয়ে করে মাকে, রাজা হয়, এগিয়ে যায় নিজের নিয়তির দিকে, এক দিন উপড়ে ফেলে নিজের চোখ। শুনে ও শিউরে ওঠে, আমি দেখতে পাই ও বয়স্ক হয়ে উঠছে। আমি রাতের শব্দ শুনতে পাই; আমার বারান্দায় যেতে ইচ্ছে করে, আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে চারপাশের বাড়িগুলো, গাছগুলো কখনো দেখি নি; এ-রাতে দেখতে পেয়ে আমি সুখ পাই। রোকেয়ার কাঁধের ওপর হাত

রেখে আমার অন্ধকার দেখতে ইচ্ছে করে, আমি রোকেয়ার কাঁধে হাত রাখি; রোকেয়া আমার দিকে তাকিয়ে একবার মুখ নিচু করে, আবার আমার দিকে তাকায়।

আমি বলি, আমাকে ধরতে তোমার ইচ্ছে করে না?

রোকেয়া বলে, করে।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরি, ও আমাকে ধরে; কিন্তু এখনো ধরতে শেখে নি, ওর হাত দুটি আমার শরীরে ঝুলে থাকে। আমার চুমো খেতে ইচ্ছে করে, আমি ওকে চুমো খাই; ওর মাংসল ঠোঁট দুটি ঠোঁটের ভেতরে পুরে রাখি, ও ঝুলে পড়ে যেতে চায়, আমার দু-হাতে ঝুলতে থাকে; অন্ধকার আর অস্পষ্ট আলো দিকে দিকে কাঁপতে থাকে।

আমি বলি, তুমি কি সব কিছু গোপন রাখতে পারো?

রোকেয়া বলে, পারি।

বাইরে, আকাশে, গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়িতে, ঘাসের শিখায়, শিশিরে, পাখির পালকে ভোর হয়।

আমি কি অপরাধ করেছি? আমি কি সুখী বোধ করি নি? সুখী বোধ করা অপরাধ? এ-বয়সে সুখী বোধ করা ঠিক নয়, এটা পীড়িত হওয়ার সময়, এখন যতোই পীড়িত বোধ করবো ততোই নিজেকে সৎ মনে করবো; কিন্তু আমি পীড়িত বোধ করছি না, অপরাধ

বোধ করছি না। সুখে ভেসে যাচ্ছি বা আনন্দে কাঁপছি বা আবেগে অধীর হয়ে উঠছি, তাও নয়; অদ্ভুত ভারী শান্ত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার। অফিসে গিয়ে সারা অফিসটার দিকে তাকিয়ে আমার নিঃশব্দে হাসি পায়, কী হাস্যকর চারপাশ। অফিসটায় আমার থাকতে ইচ্ছে করে না, কোনো অফিসেই নয়। অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় রোকেয়াকে দেখি, ওর মুখেও কোনো অপরাধ দেখতে পাই না; ওকে নির্মল দেখাচ্ছে, প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। হয়তো ওকে আগেও এমনই দেখাতো, আমি খেয়াল করি নি, তাই আজ ওকে আমার এমন নির্মল আর প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। দোতলায় ওঠার সময় দেখি ও সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে খাবার দিতে বলি।

দীন মুহম্মদ দাঁড়িয়ে আছে, রোকেয়া খাবার দিচ্ছে, আমি খাচ্ছি।

রোকেয়া বলে, স্যার, আজ আমি চশমা নিতে যাবো।

দীন মুহাম্মদ বলে, অনেকগুলিন ট্যাকা লাইগ্যা যাইব, স্যার।

আমি বলি, টাকাটা তুমি আমার থেকে নিয়ে যেয়ো।

দীন মুহাম্মদ বলে, আপনে না হইলে অর চোকটা নষ্ট অইয়া যাইত, স্যার।

আমি বলি, ওর জন্যে কিছু জামাকাপড়ও কেনো, আমার থেকে টাকাটা নিয়ো।

আগামীকাল ভোরে, মেয়েটি, রোকেয়া, চলে যাবে। আমি কি ওর অভাব বোধ করবো? না। আমি কারো অভাব বোধ করি না; ডলির অভাব বোধ করি না, ওর অভাবও বোধ করবো না। আমি কি চাই ও চলে যাক? হ্যাঁ, আমি চাই, ও চলে যাক। কিন্তু কেনো? আমি জানি না। আজ ভোর থেকেই ও আমার ঘরে আসছে, হাসছে, কথা বলছে, এমন কি আমি যেনো অফিসে না যাই এমন এক অনুরোধও করে আমাকে। বিস্মিত করে দিয়েছে; আমি অফিসে গেছি, প্রচণ্ড কাজ করেছি, পাঁচটি বৈঠক করেছি, ওর কথা আমার মনে পড়ে নি। মনে পড়ে নি? সত্যিই মনে পড়ে নি? না পড়াই ভালো। আমি কি আজ একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছি? হয়তো। কিন্তু তা ঘটেছে বৈঠকগুলোকে আমি বেশি সময় নষ্ট করতে দিই নি বলে; আর কয়েকবার কফি খেলে, পরস্পরকে আরেকটুকু বেশি প্রশংসা করলেই বাসায় ফিরতে বিকেল করে দিতে পারতাম। তা আমি করি নি। কেনো করি নি? এভাবেই, কোনো কারণ নেই; বিকেল করে দিতে আমার ইচ্ছে করে নি। আমি তাড়াতাড়ি ফেরায় মেয়েটি, রোকেয়া, কেনো এতো খুশি হলো? ও দৌড়ে নিচে নেমে এসেছে। ওর দৌড়ে নেমে আসাটা আমার ভালো লেগেছে, ভরাট হাসিটি আমার ভালো লেগেছে; আমি বাসায় ঢোকার সময় ও আমার একটু পেছনে পেছনে বাসায় ঢুকেছে, আমার ঘরে ঢুকেছে। আমি খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি, আমার আরো কয়েকটি বৈঠক আছে; বেরোনোর সময় ও খুব অবাক আর বিষণ্ণ হয়েছে। বৈঠক করে সন্ধ্যার বেশ পরে আমি বাসায় ফিরি।

দীন মুহাম্মদ আমাকে খেতে দেয়, আমি খাই। রোকেয়াকে দেখতে পাই না।

দীন মুহাম্মদ বলে, স্যার, কাউলকা সকালেই যামু, দুই দিনের মধ্যেই ফিরা আসুম।

আমি বলি, দেরি কোরো না, আমার অসুবিধা হবে।

দীন মুহাম্মদ বলে, না, স্যার, দেরি অইব না।

একটু পরেই বারোটা বাজবে, বোতল থেকে চুমুক দিয়ে আমি একটু একটু পান করি, আর একটি বই পড়ি, এবং পড়তে পারি না; এমন সময় দরোজা ঠেলে রোকেয়া ঢোকে। আজ ও বিছানায় আমার পায়ের কাছে বসে না, আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ও কি এতোক্ষণ ধরে কাঁদছিলো? এজন্যেই ওকে সুন্দর লাগছে?

রোকেয়া বলে, স্যার, আজ সারাদিন আপনি বাইরে রইলেন কেনো?

আমি বলি, খাবার সময় থেকে তো বাসায়ই আছি। তোমাকে দেখলাম না।

রোকেয়া বলে, ইচ্ছে করছিলো আপনাকে না দেখেই কালকে চলে যাবো; আপনাকে আর দেখবো না।

এমন সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

ডলি বলে, তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো ঠিক করেছি।

আমি বলি, তুমি ছেড়ে দিতে চাইলে আমি আর কী করতে পারি?

ডলি বলে, শিগগিরই তুমি কাগজপত্র পাবে।

আমি বলি, কাগজপত্রের কী দরকার?

আমি টেলিফোন রেখে দিই।

রোকেয়া বলে, আপনি একলা হয়ে যাবেন।

আমি বলি, না। আবার টেলিফোন বাজতে থাকে, আমি ধরি না।

রোকেয়ার একটি হাত কি আমি এততক্ষণ ধরে ছিলাম? আমি ওকে কাছে টানি, ও বিছানায় উঠে আসে। আমি ওকে খুলি; ও গভীর ঘুমের মতো জেগে থাকে, ওর মাংস কদম হতে থাকে, এবং একবার কেঁপে ডুকরে ওঠে।

ভোরে ঝলমল ক'রে ও আসে। ওর হাতে আমি একটি বড়ো প্যাকেট দিই।

ও জিজ্ঞেস করে, এটায় কী আছে, স্যার?

আমি বলি, এখন দেখবে না, গিয়েই ব্যাংকে জমা দেবে।

রোকেয়া প্যাকেটটি বুকে চেপে ধরে।

সময় হয়ে গেছে; সালাম করে দীন মুহাম্মদের সাথে ও বেরিয়ে যায়; গেইটের কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকায়; আমি ওকে দেখি, ও হয়তো কিছু দেখতে পায় না। একটু পর আমি অফিসে যাই। অফিসে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খাই, কফিটা খেতে আমার অনেক সময় লাগে, সময় লাগাতে আমার ভালো লাগে; কাউকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দিই, কোনো টেলিফোন ধরি না। আমি পদত্যাগ পত্র লিখি, মাত্র একটি বাক্য; সহকারীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বাইরে এসে রিকশা নিই; রিকশাঅলা জানতে চায় কোথায় যাবো, আমি শুধু বলি, চালাও। আমার ইচ্ছে করে শহর ছেড়ে যেতে, এখনই ছেড়ে যেতে, আর না ফিরতে। শহরকে আমার অচেনা মনে হয়, চিনতে ইচ্ছে করে না। রিকশাঅলাকে আমি শহরের বাইরে যেতে বলি; সে একটি খেতের পাশে এসে জানতে চায় আমি নামবো কি না। আমার ভালো লাগে, আমার নামতে ইচ্ছে করে; আমি নামি, হাঁটতে থাকি; হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে যেতে ইচ্ছে করে, অনেক দূরে; আমি হাঁটতে থাকি; আমি হাঁটি, আমি হাঁটতে থাকি, শহর ছেড়ে অনেক দূরে যেতে থাকি, আমি হাঁটতে থাকি।